গ্রামবাংলা

ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি

গ্রামবাংলা

ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি

সম্পাদনা
শিনকিচি তানিগুচি

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

GRAMBANGLA : ITIHAS, SAMAJ O ORTHONIT

Edited by

Sinikichi Taniguchi

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪০৬

প্রকাশক ঃ কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০১২

টাইপসেটিং ঃ প্রবাসী প্রকাশন
৬৪ এ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০১৭

মুদ্রক ঃ দি হলমার্ক
৬৮/১বি, সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৪

সূচিপত্র

সারণি তালিকা

অধ্যায় ১

অধ্যায় ৩

মানচিত্র তালিকা

চিত্র তালিকা

তথ্য তালিকা

নক্সা তালিকা

ভূমিকা

গ্রামীণ বাংলার সমাজজীবন সংক্রান্ত ছয়টি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে। এই প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরাজি অথবা জাপানি ভাষায়। প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'বাংলার সমাজ' বলতে দুই বাংলার কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই প্রবন্ধগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকে হলেন ঐতিহাসিক, অনেকে নৃতাত্ত্বিক অথবা অর্থনৈতিক ভূগোল বিজ্ঞানের গবেষক। এঁরা সকলেই বাংলাদেশে অথবা পশ্চিমবঙ্গে বহু বছর গবেষণা করেছেন। আরও দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই লেখাগুলির মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য দেখা যাবে। লেখকেরা কোনো তত্ত্বের তাৎপর্য প্রমাণ করতে গ্রামবাংলা নিয়ে গবেষণা করেননি। সকলের উদ্দেশ্য হল সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা এবং মূল অর্থ ব্যাখ্যা করা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার অসারতা প্রমাণ করতে অনেক লেখক চেষ্টা করেছেন।

প্রবন্ধগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তানিগুচি (১৯৭৮) তাঁর প্রবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাংলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সময়কালকে প্রাক্-ঔপনিবেশিক অধ্যায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কাওয়াই (১৯৮৬), উসুদা (১৯৮৯-৯১) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়কালে গ্রামবাংলার কথা বলেছেন। এই সময়কাল হল ঔপনিবেশিক আমলের বিশেষ পর্ব। তাকাদা (১৯৯১), তোগাওয়া (১৯৭৮) এবং মোরি (১৯৯৮) তাঁদের প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে গ্রামবাংলার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে গ্রামবাংলার গত তিনশো বছরের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

প্রথম চারটি প্রবন্ধে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি নিয়ে কিছু বলা দরকার। এইসব লেখায় গ্রামবাংলার কৃষি কাঠামোয় মূলত দুটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে—জমির অথবা মালিক এবং কৃষক, এবং তাঁদের সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ রয়েছে। জমিদারিপ্রথা প্রসঙ্গে আলোচনায় তানিগুচি এবং উসুদা গ্রামীণ সমাজে মধ্যবর্তী শ্রেণীর গুরুত্বের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের লেখায় রায়ত, ভদ্রলোক বিশেষ করে যাঁদের স্থান জমিদার এবং জমির মজুরদের মধ্যবর্তী অংশে, তাঁদের ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু কাওয়াই-এর মতে এইসব শ্রেণীর তাৎপর্য তেমন কিছু নয়। তিনি মনে করেন, বাংলার কৃষি সমাজে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জমিদারদের। জমিদারি পরিচালনায় মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। তানিগুচির মতে ঐতিহাসিক রত্নলেখা রায় জোতদার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা সঠিক। উসুদা রত্নলেখা রায়-এর লেখার উপর কোনো মন্তব্য করেননি। এ বিষয়ে সুগত বসু এবং রজত দত্তের মতামত দেখা যাক। বসু এবং দত্ত-র মতে বাংলার কৃষি সমাজে ছোট কৃষিজীবীদের

প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। তাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গে ধনী কৃষক অথবা জোতদারদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। তানিগুচি তাঁর নানান প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ধনী কৃষকদের প্রাধান্য পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমবাংলায় ছিল। সুতরাং কাওয়াই-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সুগত বসু এবং রজত দত্তর মিল রয়েছে।

বর্তমান বাংলার কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি রয়েছে সেগুলি প্রসঙ্গে আসা যাক। স্যাতো (তাঁর লেখা এই গ্রন্থে যোগ করা সম্ভব হলো না) এবং তোগাওয়া মনে করেন যে কৃষি উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি মোটামুটি সফল হয়েছে। তোগাওয়ারের লেখায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পর প্রয়োগ এবং সার্থকতা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। মোরির প্রবন্ধে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা নেই। তাঁর লেখায় 'সবুজ বিপ্লব'-এর আর্থিক ও সামাজিক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও দুজন বিশেষজ্ঞের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন প্রয়াত কোমোগুচি এবং ফুজিতা (এই গ্রন্থে তাঁদের লেখাও যুক্ত করা যায়নি)। মোরি যে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এইসব লেখকেরা সেই প্রসঙ্গে নানান কথা বলেছেন। তবে এই লেখাগুলি প্রসঙ্গে যে বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল গ্রামবাংলার সমাজ পরিবর্তনে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মধ্যে মিল রয়েছে, বিভিন্ন লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে।

এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসা যাক। তাকাদা তাঁর প্রবন্ধে গ্রামীণ বাংলাদেশে অকৃষিজাত আয়-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে গরীব কৃষকদের কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করা আর সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মোরির প্রবন্ধের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মোরিও মনে করেন অকৃষিজাত আয় কৃষিকাজে ব্যবহৃত হলে শুধু যে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাই নয়, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে অকৃষিজাত আয়-এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আরও একটা বিষয় উল্লেখনীয়, তাকাদার মতে খুব বড় জমির মালিক এখন বড় একটা দেখা যায় না। তবে কৃষকদের মধ্যে যে সামান্য আর্থিক অবস্থার তারতম্য দেখা যায় গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব অনেক, কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে নানান সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা। অমর্ত্য সেন আগেই এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেক জাপানি বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। অধ্যাপক কাইদার-এর নেতৃত্বে বেশ কিছু জাপানি গবেষক বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করছেন। এইসব লেখাও এখানে যোগ করা সম্ভব হল না। জাপানি নৃতত্ত্ববিদরা বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে বহুদিন গবেষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলায় মুসলমান পরিবারের উপর অধ্যাপক হারার লেখার কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তাঁর লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৬০-এর দশকে। হারার গবেষণার পরে তাকাদা, টোগাওয়া, নাকাতানি, নিশিকাওয়া এবং আরও অনেকে গ্রামবাংলা নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের লেখাও এখানে নেই। তাঁদের লেখায় নানান নতুন গবেষণার বিষয়বস্তু লক্ষ্যণীয় যেমন উদ্বাস্তু, ভিখারি, অকৃষিভিত্তিক খেটে খাওয়া মানুষ, মহিলাদের কাজ, অকৃষিভিত্তিক N.G.O.-দের ভূমিকা ইত্যাদি প্রাধান্য

পেয়েছে। সুতরাং আমাদের মনে রাখা দরকার যে মাত্র ছয়জন লেখকের প্রবন্ধ এই গ্রন্থে রয়েছে, তাছাড়াও অনেক গবেষক গ্রামীণ বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন। আশাকরি ভবিষ্যতে এইসব প্রবন্ধ অনুবাদ করে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

এখন প্রবন্ধগুলি আলাদাভাবে দেখা যাক এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। তানিগুচির প্রবন্ধে (১৯৭৮) বাংলায় জমিদারি প্রথার বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, মুঘলযুগ থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল অবধি। তানিগুচি দেখিয়েছেন কেমন করে ঔপনিবেশিক শাসকদের চাপে দিনাজপুরের পুরানো জমিদারি প্রথা ভেঙে যায়। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ধনী কৃষক, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং লেনদেন ব্যবসায়ে যুক্ত পুরান জমিদারি প্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে থাকে। দিনাজপুর জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির সাথে সাথে মাঝারি জমিদার শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এরা সকলেই অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নিলামে জমি কিনে নেন। নতুন জমিদারবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে কোনো ভূমিকা ছিল না, তারা ছিল ব্রিটিশদের অনুগত ভক্ত।

কাওয়াই-এর প্রবন্ধে (১৯৮৬) বর্ধমান রাজাদের কথা আলোচিত হয়েছে যারা জমিদারি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায বিশেষ সার্থক হয়েছিল। তাঁর মতে বাংলায় জমিদারদের ভূমিকা ছোট করে দেখা ঠিক নয়, অবস্থাপন্ন অথবা মাঝারি জমির মালিক তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারেনি। তাই কাওয়াই বলেন জোতদারদের প্রভাবে জমিদার শ্রেণী যে তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল তা ঠিক নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে বর্ধমানরাজ জমিদারি পরিচালনা করেন দক্ষতার সঙ্গে। এই কাজে তাদের সাহায্য করত দক্ষ পরিচালকবর্গ। এই দক্ষ জমিদারি পরিচালনা নগরজীবন গড়ে ওঠার আগেই শুরু হয়েছিল। সার্থকতার আর একটা কারণ হল বর্ধমান রাজের পত্তনি ব্যবস্থা চালু করা এবং জমিদারি পরিচালনায় বিচার ব্যবস্থাকেও কাজে লাগিয়ে নেওয়া।

উসুদা (১৯৮৯-৯১) দেখিয়েছেন কেমন করে বরিশাল জেলার একটি গ্রামে প্রভাবশালী একটি শ্রেণী তৈরী হয়। এই গ্রামটিতে প্রখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। গ্রামটিতে উসুদা বহুদিন গবেষণা করে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন, যেমন থাক্ সার্ভে রিপোর্ট, সার্ভে সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে রিপোর্ট এবং গ্রামের নানান ধরনের পুঁথিপত্র। এই গ্রামের দত্ত পরিবার, যাঁরা শতকরা ৭০ ভাগ জমির মালিক ছিলেন, অনেক তথ্য রেখে গেছেন। এইসব তথ্য থেকে পরিবারের অন্তবর্তী বিবাদের বিষয়েও অনেক কিছু জানা যায়। এইসব ঘটনার প্রভাব কৃষি ব্যবস্থাতেও পড়েছিল।

আগে উল্লেখ করেছি, তাকাদার মতে বাংলাদেশের গ্রামের অর্ধেক-এরও কম জনগণ জমির আয়ের উপর ভিত্তি করে জীবিকানির্বাহ করে। বেশিরভাগের আয়ের উৎস অকৃষিভিত্তিক। তাকাদা গ্রামে শ্রেণী ব্যবস্থায় চারটি স্তর-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তাহলো বাংলাদেশের গ্রামে ধনী, মাঝারি এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে জমির মালিকানার পার্থক্য কম। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য তাদের ব্যাপক আর্থিক ও সামাজিক পার্থক্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

তোগাওয়া তাঁর প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প এবং

তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তোগাওয়া ১৯৯৩ সালে বীরভূম জেলার একটি গ্রামে গবেষণা করেন। তাঁর মতে অনুসূচীত জাতি সম্প্রদায়ের জনগণ এখন নানান সুযোগ-সুবিধার অংশীদার, তাঁরা আর পশ্চাৎপদ জাতি নয়। দুটি গ্রামে তুলনামূলক আলোচনা করে তোগাওয়া দেখান যে সরকারি গ্রামীণ কর্ম প্রকল্পে ও টিউবওয়েল ব্যবহারের ফলে এই গ্রামগুলি বিশেষ উপকৃত হয়। এর ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কখনও কখনও মনমালিন্যও দেখা দেয়। কিন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সুযোগসুবিধা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বড় করে দেখানর একটা প্রবণতা রয়েছে। এর ফলে আসল সমস্যা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মোরি অত্যন্ত নিপুনতার সাথে ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং ক্ষেত মজুরদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন উচ্চ ফলনশীল ধান প্রবর্তনের সাথে সাথে জমির মালিকানায় পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু ধর্ম অথবা জাতি প্রথার সাথে এই ধরনের মালিকানার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। উচ্চ ফলনশীল বীজ বোরো চাষে যত ব্যবহৃত হয়েছে, ততই ভাগচাষ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে বোরো চাষ এখন প্রায় ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং ক্ষেত মজুররাই করে থাকেন। মোরির মতে অবস্থাপন্ন জমির মালিকরা বোরোচাষ ক্ষেতমজুরদের মাধ্যমেই করে থাকেন, তার কারণ বোরো চাষে শ্রমের প্রয়োজন খুব বেশী, কিন্তু ১৯৮০ সালে ক্ষেতমজুরী বৃদ্ধির ফলে জমির মালিকের লাভ গিয়েছে অনেক কমে। বোরো চাষ কৃষিকাজে শ্রেণী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে, এবং গরীব কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে মোরি নানান সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন বোরো চাষের জন্য জমি পাওয়া আজকাল ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি ডঃ ভেলাম ভান সেন্দেল প্রথম প্রবন্ধগুলির বাংলা অনুবাদের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তখন এই কাজ করা সম্ভব হয়নি। এরপর তরুণ গবেষক নাকাতানি, তোগাওয়া এবং মোরি এই অনুবাদের কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সাহায্য করেন ডঃ অভিজিৎ দাশগুপ্ত। আমরা যাঁরা অগ্রণী তাঁরা এই প্রকাশনার ব্যাপারে তরুণ গবেষকদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। সম্পাদনায় সহযোগিতার জন্য সুমন ভট্টাচার্য, টাইপ-এর জন্য গৌতম বসু মল্লিক এবং প্রভঞ্জন সামন্ত-র কাছে আমরা বিশেষ ঋণী।

১

বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দিনাজপুর জমিদারির অবসান

শিনকিচি তানিগুচি

ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে ১৭৯৩ সালের বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে একটি নতুন যুগেব সূচনা করেছে। তৎসত্ত্বেও, গুরুত্বের তুলনায়, সে সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের মান মোটেই সন্তোষজনক নয়, কারণ কৃষি সমাজের উপর এর প্রভাবের বিষয়ে গভীর আঞ্চলিক অধ্যয়নের বিশেষ অভাব রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি উত্তরবঙ্গের একটি নির্বাচিত জমিদারিকে কেন্দ্র করে এবং এর বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হল অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে সেই জমিদারির পতনের কারণগুলি এবং যেসব নতুন জমিদার প্রকাশ্য নিলামে ঐ জমিদারির অংশগুলি ক্রয় করেছিলেন তাদের সামাজিক উৎপত্তি ও জমিদারি পরিচালনার প্রণালী। সামগ্রিক বিচারে, ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বাংলার কৃষি সমাজের গঠনসংক্রান্ত পরিবর্তনের উপরে কিছুটা আলোকপাত করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

১. দিনাজপুর জমিদারির বিভাজনের কারণসমূহ

দিনাজপুর জমিদারির পতন হল কয়েকটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবের ফল। ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে এই সুদীর্ঘ পতন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা জমিদার-এর ভূসম্পত্তি পরিচালনা ও আর্থিক ব্যাপারে বিভ্রান্তি এনে দিয়েছিল এবং এই বিভ্রান্তিই আবার তার স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির পতন ডেকে আনল। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি (সরকারি রাজস্ব আদায়ের অধিকার) লাভ করল তখন তার সরকার, শাসনের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য, যথা, দেশ থেকে রাজস্বের পরিমাণ সর্বাধিক করা এবং বাংলায় ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য সরকারি ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করল এবং জমিদারের সৈন্যসামন্তের সংখ্যা হ্রাস করবারও চেষ্টা করল। ফলে উপরোক্ত বিভ্রান্তি ও পতন গভীরতর হল। জমে ওঠা অপরিশোধিত ঋণ যা পরিণামে দিনাজপুরের জমিদার-এর সর্বনাশ ঘটাল তা হল এইসব ঘটনারই শেষ পরিণতি।

এই সবকটি উপাদান সবিস্তারে আলোচনা করার হেতু এই প্রবন্ধের সীমার বাইরে সেহেতু আমরা কেবলমাত্র কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব।[১]

সর্বপ্রথম আমরা ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে জমিদারের স্থানীয় প্রভাব, যা ছিল দেশ ও জনসাধারণের উপরে তার নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি, সেই প্রতিপত্তির ক্রমান্বয়ে পতনের ইতিহাস অনুধাবন করব।

১৭৭০ সালে দিনাজপুর জেলার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক, জি. ভ্যানসিটার্ট, এই অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন শুরু করেন এবং আবিষ্কার করেন যে জমিদারের স্থানীয় পরিচারকদের (চৌধুরি), তার জমিদারির যাবতীয় প্রত্যক্ষণীয় সম্পত্তি হ্রাসের গোপন চক্রান্তের যন্ত্র বানানো হয়েছে। ভ্যানসিটার্ট তাই 'পরগণার কর্মকর্তাদের অপব্যবহারের একবারে চূড়ান্ত অবসান ঘটানোর একমাত্র উপায় হিসাবে একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী ইজারদারি রীতি'[২] গ্রহণের সপক্ষে যুক্তি দেখান। পরের বছর দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক, এইচ. কট্রেলও বিবৃতি দেন ঃ 'আমি চাই .... আপনাদের দেখাতে যে তার (জমিদারের) অত্যধিক প্রভাব রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা বজায় থাকবে, যতক্ষণ তার কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় চালিয়ে যাবে .... (সে) ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তার কর্মচারীদের জুয়াচুরি এমনভাবে গোপন করতে পারে যে তা আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব।'[৩]

এইজন্যই ভূমি থেকে রাজস্বের পরিমাণ সর্বাধিক করার পথে জমিদার-এর স্থানীয় প্রভাব বিরাট বাধা বলে বিবেচিত হল। অতএব মুর্শিদাবাদে রাজস্ব পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সরকারি ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও জমিদারি প্রতিষ্ঠানের বাহুল্য হ্রাসের ব্যাপারে একমত হল।[৪]

ভ্যানসিটার্ট খরচ কমানোর কাজ শুরু করলেন। তিনি জমিদারের কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের খরচ ২১,৮১৮ টাকা থেকে কমিয়ে করলেন ১৮,৫২৯ টাকা এবং স্থানীয় কর্মচারীদের খরচ ৫১,৭৮৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৩২,৭৩৮ টাকা।[৫]

যেসব কৃষি কর্মচারীদের রাজস্বমুক্ত ভূমি (চাকরান জমি) দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ তিনি কমিয়ে দিলেন নিম্নলিখিত হারে ঃ

সারণি ঃ ১ জি. ভ্যানসিটার্টের সুপারিশকৃত কৃষিকর্মীদের সংখ্যা হ্রাসের একটি তালিকা

	জমিদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীসংখ্যা হ্রাসের পূর্বে		প্রতিষ্ঠানের অধিকারে রাখা চলবে	
	ব্যক্তি	বিঘা	ব্যক্তি	বিঘা
ডাক ও পাইক[৬]	৬৭৪৩	১১৫৪৮৫	৩২০০	৮০০০০
বরকন্দাজ ও পিওন[৭]	৫৫১	১৪৭১০	৪০০	১২০০০
সওয়ার (ঘোড়সওয়ার)	২৬৬	২৬৪৭৮	২০	২০০০
	৭৫৬০	১৫৬৬৭৩	৩৬২০	৯৪০০০

উৎস ঃ সি সি আর এম-পি, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৭০।

এছাড়াও তিনি বার্ষিক ২০,০০০ টাকায় ৭৭ জন সওয়ার এবং ৪৬৪ জন বরকন্দাজ সম্বলিত জমিদারের মূল সৈন্যবাহিনীকে বার্ষিক ১০০০ টাকায় ১০ জন সওয়ার ও ২২২ জন বরকন্দাজ কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও করেন। যাইহোক, তিনি খাজনা আদায়ের কাজে সরাসরিভাবে নিযুক্ত অজস্র অধীনস্থ কর্মী যাঁরা কর্মচারী বলে অভিহিত হতেন এবং খাজনা-মুক্ত জমি (চাকরান জমি) অধিকার করতেন তাদের সংখ্যা হ্রাস করা ঠিক বোধ করেননি।[৮] কিন্তু এ-ও মনে হয় যে তিনি এই কর্মীসংকোচের পরিকল্পনাটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত

করতে পারেননি।

১৭৭১ সালে জে. লরেল দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত করার বিশেষ কর্মভার প্রাপ্ত হয়ে প্রেরিত হন। দিনাজপুরে তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য সমস্ত জমিদারিটি এক থেকে তিন বছরের জন্য সত্তরটিরও বেশি ছোট ছোট ইজারাদারের হাতে তুলে দেন এবং যেসব চৌধুরি, পরগনাগুলির ভারপ্রাপ্ত জমিদারের স্থানীয় কর্মচারী ছিলেন তাদের সবাইকে বরখাস্ত করে জমিদারের 'অত্যধিক প্রভাব' খর্ব করার প্রতিও একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিঃ

> "জমির খাজনা আদায়ের ভার একবছর পরগনার ইজারাদারদের হাতে দেওয়ার ফলে সরকারি কাজে চৌধুরিদের রাখার কোনো উপায় ছিল না, তাই তাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।"[৯]

নিম্নপদস্থ খাজনা আদায়কারী (কর্মচারী)-সহ সব ধরনের কৃষি কর্মী সংখ্যাও তিনি কমিয়ে আনলেন। যেখানে বিঘা চাকরান জমির অধিকারী ছিল ১৮,৩৭৮ জন, তা কমে এল ২০০,২৬৪ বিঘার অধিকারী ১৩,৯২৫ জনে।[১০]

যাই হোক, জমিদারের স্থানীয় প্রভাব হ্রাস করার ব্যাপারে সরকারি ইজারাদারি ও চৌধুরিদের বরখাস্তকরন যতটা সার্থক হবে আশা করা গিয়েছিল ততটা ফলপ্রদ হয়নি, কারণ জমিদারির বৃহদংশই নানা বেনামিতে প্রাক্তন অধিকারেই রয়ে যায়।[১১] জমিদার যেহেতু সরকারি ইজারাদার হিসাবে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরগনাগুলোতে তার নিজস্ব কর্মী নিয়োগ করতে পারতেন তাই গ্রামাঞ্চলে তাঁর প্রতিপত্তি সংরক্ষিত থাকল যথাপূর্বক মর্যাদায়।

১৭৭২ সালে কমিটি অফ আরকিট জমিদারিটিকে আবার পাঁচ বছরের জন্য বহুসংখ্যক সরকারি ইজারাদারদের হাতে তুলে দেয় ১,৫৩৮,৬৭১ টাকার নিট রাজস্ব আদায়ের চুক্তিতে।[১২] জমিদার আবারও বেনামিতে তাঁর জমিদারির যথেষ্ট পরিমাণ অংশ ধরে রাখলেন এবং বহিরাগত ইজারাদারদের খাজনা আদায়ে বাধা দেওয়ার সবরকমভাবে চেষ্টা করলেন। ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষে গ্রামাঞ্চলের পতিত অবস্থা, সরকারি রাজস্বের উচ্চ দাবি, জমিদারের চক্রান্ত এবং অদূরদর্শী অন্যায় দাবি ইত্যাদির কারণে প্রায় সব ইজারাদারদেরই রাজস্ব আদায়ে বাকি পড়ে গেল এবং যা তাদের পদ ও অভাব নষ্ট করে দেয়। ফলত কোম্পানির সরকার জমিদারি পরিচালনার সেই পাঁচ বছরের শর্ত শেষ হওয়ার আগেই বাধ্য হল জমিদারকে সেই দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে।[১৩]

১৭৭৫ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত সময়টি জমিদারের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিল, যেহেতু তার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট এবং স্বল্প পরিমাণ অর্থে (১,২৭৫,৯৬৮ টাকা) তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত জমিদারির একটি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই স্বল্প সময়কাল 'পুরানো' জমিদারের ক্রমহ্রাসমান মহিমার শেষ পর্ব লক্ষ্য করা যায়। ধার্য রাজস্বের হার কম হওয়ায় রাজস্ব প্রদানে কোনো বাকি পড়েনি এবং তিনি সরকার কর্তৃক হ্রস্বীকৃত জমিদারির কর্মীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৪]

১৭৮০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর কমিটি অফ রেভিনিউ তথা রাজস্ব কমিটি দিনাজপুর জমিদারিটি দু'বছরের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বর্ধিত অঙ্কে (১,৪৭৫,৯৬৮ টাকা) রাজা দেবী সিং নামে একজন রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদারের হাতে তুলে দেয়। তাঁর

ইজারাদারি ভোগদখলের কালে বিভিন্ন পরগনায় তাঁর নিজের লোক পাঠান এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করান তাঁর নিজস্ব পথে। নির্মম অন্যায় দাবির কারণে জমিদারিটিতে চরম বিভ্রান্তি দেখা দিল এবং খাজনা আদায় সংক্রান্ত স্থানীয় প্রথাগুলি[১৫] (উল্লেখ করা যেতে পারে) বিশেষভাবে বিশৃঙ্খল হল। রংপুর এবং এদ্রাকপুরেও যেখানে তার ইজারাদারি ছিল, সেখানেও তাঁর নিষ্ঠুর, অন্যায় দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কৃষক অসন্তোষ দেখা দিল যা বহু প্রাণনাশ ঘটায়।[১৬] দেবী সিং-এর সরকারি ইজারার ফলে জমিদারির স্থানীয় প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল জমিদারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও।

এই শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর জমিদারি পরিচালনার ভার পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হল অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারের হাতে, যাকে প্রাক্তন জমিদার নিজের মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রীর ভাই জানকীরাম সিং-এর অভিভাবকত্বে দত্তক নিয়েছিলেন।[১৭] এইসময় যদিও নিয়মিত রাজস্ব দেওয়া হচ্ছিল তবুও জমিদারির আর্থিক এবং পরিচালন সংক্রান্ত গঠনে কিছু বিপজ্জনক পরিবর্তনের প্রকৃতি দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়ঃ প্রথমত, ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা; দ্বিতীয়ত, দাতব্য ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ফলে জমিদারের সঞ্চিত আর্থিক সম্পদ হ্রাস[১৮] এবং সবশেষে, জমিদারির কাজ, বিশেষত চৌধুরিদের কাজকর্মের সঙ্গে বেসরকারি ইজারাদারি ব্যবস্থার সমন্বয় যা-কিনা ভেতর থেকে জমিদারি পরিচালনাকে বিচ্ছিন্ন করার সহায়ক হল।[১৯]

১৭৮৬ সালে রাজস্ব পরিষদ-এর আদেশে জানকীরাম সিংকে সন্দেহজনক কারণে অভিভাবকত্ব থেকে অপসারিত করা হয় এবং জেলার প্রথম কালেক্টর জি. হ্যাচ (১৭৮৬-১৭৯৩)-এর সুপারিশে পরিচালনার ভার দেওয়া হয় রামকান্ত রায়কে, যিনি ছিলেন জমিদারের দূরসম্পর্কের আত্মীয়।[২০] এর পর হ্যাচ জমিদারিটিকে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনলেন, যদিও দৈনন্দিন পরিচালনা সম্পাদন করতেন জমিদারি দেওয়ান রামকান্ত রায়। হ্যাচ এরপর জমিদারির উপর তাঁর প্রত্যক্ষ তদারকি জোরদার করার জন্য এবং এই জেলায় 'কর্ণওয়ালিশ নীতি' চালু করার জন্য জারি করলেন তথাকথিত 'হ্যাচ-এর সংশোধন নীতি।'[২১]

এর পরের ধাপে, যখন ১৭৭২ সালে জমিদার সাবালক হয়ে রামকান্ত রায়ের কাছ থেকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন তখনও গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল-এর এক বিশেষ আদেশ বলে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। জমিদারের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার এবং হ্যাচ প্রবর্তিত জমিদারি পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তন করার ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হল না।[২২] অতএব জমিদারও চলতি ব্যবস্থা ও নির্ধারিত কর্মচারীদের, সে তারা যত অসাধুই হোক, চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজস্ব পরিষদের কাছে সেই কর্মীদের বহু তছরুপির প্রমাণ দাখিল করে বারংবার আবেদন সত্ত্বেও তছরুপ উক্ত পরিষদ, হ্যাচ স্বয়ং যার একজন সদস্য হয়েছিলেন, ১৭৯৩ সালে তার প্রতিকার করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।[২৩] এমত অবস্থায় দেশ ও তার লোকজনের উপরে জমিদার-এর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রায় তুচ্ছ হয়ে গেল। আর একথা বললেও অতিকথন হবে না যে ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত জমিদারির উপরে তাঁর

নিয়ন্ত্রণ ছিল নামমাত্র। বস্তুত জমিদারি প্রতিপত্তি আরো ক্ষুণ্ণ হল কর্ণওয়ালিশ-এর ১৭৯২ সালের গ্রামীণ পুলিশি আইনের প্রবর্তনায়।

১৭৯২ সালে পাশ হওয়া 'বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কালেক্টরশিপের পুলিশি আইন'-এর প্রথম ধারাতেই বলা হয়েছিল ঃ

> "দেশের পুলিশ ভবিষ্যতে একমাত্র সরকারি অফিসারগণের, যাঁরা ঐ কাজের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত, তাঁদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন বলে বিবেচিত হবে। এই ধারাবলে জমিদার ও ইজারাদাররা তাদের শান্তি রক্ষার জন্য যে থানাদার ও পুলিশপ্রধানদের পোষণ করতেন, তাঁদের বরখাস্ত করবেন এবং কোনো জমিদার ও ইজারাদারই ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মচারী রাখতে পারবেন না।"[২৪]

জমিদারের পুলিশি বা থানাদারি ব্যবস্থা এইভাবেই অধিগ্রহণ করল কোম্পানির সরকার এবং সরকারি পুলিশ অফিসার বা দারোগা শ্রেণী নিয়োজিত হলেন জমিদারি এলাকায় তাঁদের সাহায্যের জন্য বা রইল আধাসামরিকবাহিনী।[২৫] দিনাজপুর জমিদারিটি ২৫টি থানা বা পুলিশি এলাকায় বিভক্ত হল এবং একজন করে দারোগা তাঁর বাহিনীসহ নিযুক্ত হলেন প্রতিটি থানায়। ব্রিটিশ ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট, যাঁর অধীনে দারোগারা নিযুক্ত হলেন, তিনি এইভাবে সমগ্র এলাকাটিকেই নিজের তদারকিতে রাখতে পারলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে জমিদার আর তাঁর জমিদারিতে কৃষকদের উপরে সেই সীমাহীন অধিকারকে খাটাতে সমর্থ হলেন না।

জমিদারের ক্ষমতাবিলুপ্তির এই প্রক্রিয়ায় লক্ষিত হয় যে এই কোম্পানির প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োগে জমিদারি ব্যবস্থাই এক সর্বময় নিরর্থকতায় পর্যবসিত হল। এবার, জমিদারির যাবতীয় সম্পত্তি হ্রাসের কারণগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, বলা হয় যে ১৭৭০ সালের বিরাট দুর্ভিক্ষ, দিনাজপুরের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি কৃষি ভূমিকে পতিত জমিতে পরিণত করেছিল;[২৬] সরকারি রাজস্ব আদায়কারিদের অন্যায় দাবি দেশটিকে ১৭৭১ থেকে ১৭৭৪ এবং ১৭৮১ থেকে ১৭৮৩-র মধ্যে দুবার চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে, এর ফলে এক বৃহদাংশ কৃষক কাজ ফেলে পালায় এবং ১৭৮০ ও ১৭৯৭ সালে বৃহৎ অঙ্কের সাময়িক খাজনা (মাথোট ও মাঙ্গন)[২৭] আরোপের ফলে; এবং ১৭৮৭ সালে তিস্তা নদীর অন্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় দেশের সেই অংশে যাতায়াতের মাধ্যম নষ্ট হয় ও শস্য ব্যবসায় ক্ষতি হয়।[২৮] জমিদারির সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই কারণগুলি যতই ধ্বংসাত্মক হোক না কেন এর প্রভাবে হয় সাময়িক নয় আংশিক। কিন্তু যথার্থ কারণ আরও গভীর বিপদজনক এবং অন্তর্ঘাতী তা হল জমিদারের কর্মচারী ও সরকারি অফিসারদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কৃষকদের কৌশলে কাজে লাগানো এবং অন্যায়ভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।

অন্তত, ১৭৮০ সালের গোড়া থেকে ব্রিটিশ শাসকরা বাংলার বহু অংশের জমিদারদের রাজস্ব প্রদানের অসুবিধার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে কৃষকদের কারচুপির দিকটাকেই দেখাতে শুরু করেন। ১৭৮০ সালের শেষের দিকে রাজস্ব পরিষদের কাছে পাঠানো বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদের দশবার্ষিক বন্দোবস্তের সমাপ্তি বিষয়ক ধারাবাহিক রিপোর্টগুলিতে এই মতই প্রধান।[২৯] এই বিবরণগুলির নিরিখে কৃষকদের কৌশলগুলিকে শ্রেণীকৃত বিভাজনীতে পাঠ করা যায়ঃ

(১) ইজারা (পাট্টা) বলে অধিকারপ্রাপ্ত জমির অতিরিক্ত জমি গ্রহণ, (২) প্রতারণা করে পাওয়া নিম্নতর হারের খাজনা জমির অধিকার, এবং (৩) জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গ্রামীণ হিসাব ইত্যাদিতে কারচুপি করে আসল জমায় ছাড় প্রাপ্তি। রংপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ধরনের চালাকির ফলে সম্পত্তি হ্রাসের পরিমাণ তাদের প্রকৃত মূল্যের প্রায় অর্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩০]

১৭৮৮ সালে হ্যাচ লিখেছেন যে ঃ

"প্রকৃত জমা বা খাজনা তালিকা হ্রাস পেয়েছে কয়েকটি কারণে, যার মধ্যে প্রধান হল চালাকি যা বহু বছর ধরে চালিয়ে আসছে মণ্ডলরা (গ্রাম প্রধান), পরামানিকরা (গ্রাম প্রধানরা) এবং গ্রামের মুখ্য অধিবাসীরা যারা রায়তদের প্রকৃত বা কল্পিত পলায়নের অজুহাতে মুক্ত পাট্টার (নির্দিষ্ট ইজারার মেয়াদ) উপরে কম হারে মূল্য নির্ধারিত যথেষ্ট পরিমাণে জমি নিজেদের অধীনে এনেছে এবং প্রকৃত প্রতিষ্ঠিত হার বা নিরিখে অচল হয়ে গেছে।"[৩১]

দিনাজপুর জমিদারির দেওয়ান রামকান্ত রায়ও কৃষকদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন ঃ

"হাভেলী পাঁজেরা পরগনা ইত্যাদি (দিনাজপুর জমিদারি) মহালগুলির (রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিভাগ) আসল জমা একইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে মণ্ডল, পরামানিক এবং অন্যান্যদের দেয় নির্দিষ্ট অনুদান, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় মুক্তার, নিম্নমূল্যায়িত জমি বা রায়তী জোত, নিরিখ কমী (রাজস্বের কমানো হার) এবং দোলসা কমীর[৩২] কারণে।"

এই ধরনের নিম্ন মূল্যের জমি তারা পেয়েছে 'মুস্তাফি এবং মফস্বল আমলা (স্থানীয় কর্মচারী)'-দের কাছ থেকে ষড়যন্ত্র করে। তিনি আরো লেখেন ঃ

"হ্রাস করা হারে আসল জমার পরিবর্তে মাঙ্গন, পলায়নজনিত ঘাটতি, আবওয়াব-এর বাৎসরিক বৃদ্ধি হয়েছে .... এটিই হল আসল জমা হ্রাসের এবং আবওয়াব ও মাথোটের বৃদ্ধির কারণ।"[৩৩] এইভাবে দিনাজপুরের কৃষকরা ক্রমশ নিয়মিতভাবে জমিদারির সম্পত্তি ক্ষয় করেছে এবং তার আর্থিক ভিত্তিটিকে সঙ্কীর্ণ করেছে। জমিদারি সম্পত্তির ক্রমাগত হ্রাসই জমিদারকে ঘাটতি পূরণের জন্য অসংখ্য নতুন কর ধার্য করতে বাধ্য করল এবং এতে দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত রীতিনীতিতে বিশৃঙ্খলা আরও গভীর হল।[৩৪] ১৭৯৯ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দিনাজপুরের নতুন জমিদারের জমা দেওয়া আবেদন পত্রটিতে দেখা যায় যে কৃষকদের ধূর্ততা পুরানো জমিদারের কি ভয়ানক ক্ষতি করেছিল ঃ "রায়তরা ঐ নিয়মগুলি (মাল ক্রোকের নিয়মাবলি) জেনে পুণ্যাহর (নতুন বছরের চাষ শুরু করার আগে অনুষ্ঠিত উৎসব) পরে তাদের খাজনার দুই-তিনমাসের দেয় একটি ক্ষুদ্র অংশ জমা দেয় এবং তারপরে শস্য ওঠার সময় পালিয়ে গিয়ে অন্যদের কাছে শস্য বিক্রি করে .... বর্তমানে এই ধরনের রায়ত-এর কাছ থেকে জমিদাররা কিছুই পান না .... অতএব জমিদাররা রায়তদের দেয় বিরাট বকেয়া অংশ উদ্ধার করতে পারেন না .... এই কারণে দিনাজপুর রাজের বিস্তৃত জমিদারি এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক জমিদারদের জমিদারি ধ্বংস হয়েছে।"[৩৫]

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রামাঞ্চলের ওপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ার ফলে কেবলমাত্র কৃষকদের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ সম্ভব হয়েছিল।

জেলার সরকারি কর্মচারী ও জমিদারের কর্মচারীদের অসাধুতার জন্যও জমিদারির সম্পত্তি হ্রাস পেয়েছিল। আমরা যেমন দেখেছি 'হ্যাচ-এর সংশোধন'-এর আমলে

সম্পত্তি তছরূপ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। দিনাজপুর জমিদারের নিজস্ব কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের অপকর্ম বিষয়ে নিম্নোক্ত অভিযোগে যথেষ্ট সত্যতা রয়েছে।[৩৬]

> "এই কর্মচারীরা .... তাদের দুষ্ট এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ দৃষ্টির জন্য মফস্বলের খাজনা আদায়ের এবং কালেক্টরকে রাজস্ব জমা দেওয়ায় এত অযত্ন এবং অবহেলা করেছে যে তিন বছরে মফস্বলের দেয় টাকার ঘাটতি ৮ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং সংগ্রহের পরিমাণ থেকে তারা নিজেরাই প্রায় ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করায় সরকারের কাছে আমার ৪ লাখ টাকা বাকি পড়েছে। এর ফলে আমার জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে গেল .... কালেক্টরের দেওয়ান ফুলচাঁদ, আমার জমিদারির দেওয়ানের পৌত্র মানিকচাঁদ .... এবং কালেক্টর ও কালেক্টরশিপের অফিসার ইত্যাদির নাজির উলী মহম্মদ এবং দিনাজপুর জেলার আদালতের কর্মচারী ও মানিকচাঁদ ইত্যাদি সহ আমার জমিদারির কর্মচারীরা প্রতারণার জন্য একসঙ্গে দল বেঁধে ষড়যন্ত্র করে বেশ কয়েকটি উর্বর ও উৎপাদনশীল মহালের মূল্য কমিয়ে দিয়ে .... (তারা) আমার গোটা জমিদারিটি কিনে নিয়েছে ....।"

ঐতিহাসিক নথিপত্র যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে দিনাজপুরের জমিদার কিছু না কিছু পরিমাণ ঋণে প্রায় সবসময়েই ভারাক্রান্ত ছিলেন। আমরা অবশ্য তাঁর ঋণবদ্ধতার ধরনে ১৭৮০-র দশকের মাঝামাঝি একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটতে লক্ষ্য করি। ১৭৮০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ের আগে জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে সম্পর্কটিকে একবার দেখে নিলে এই পরিবর্তনটি বুঝতে সুবিধা হবে। মুর্শিদাবাদে সরকারি কোষাগারে জমিদারের রাজস্ব প্রেরণের প্রয়োজনেই মনে হয় এই সম্পর্কটির উদ্ভব হয়। ধাতুমুদ্রায় তা প্রেরণের পরিবর্তে দিনাজপুর শহরে যাদের কুঠী ছিল সেই জগৎ শেঠ এবং গনেশ দাস-এর মতো মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠিত মহাজনদের হুণ্ডিতে জমিদার তা জমা দিতেন।[৩৭] শেঠেরা মনে হয় সেখানে তাঁদের গোলা ও কুঠী খোলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে।[৩৮] এই কুসীদজীবীরা এই অঞ্চলে যেখানে শীতকালীন সরু আমন ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হত সেখানে শস্য ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে আমানতি ব্যবসাও চালাতেন। সেইজন্য তাঁরা জমিদারের মুর্শিদাবাদে প্রদেয় হুণ্ডি অনুমোদনে এবং তার কাছ থেকে মুদ্রা গ্রহণে রাজি ছিলেন, যা গ্রামাঞ্চলে শস্য কিনতে লাগত।[৩৯] জমিদার এইভাবেই স্থলপথে মূল্যবান ধাতুমুদ্রা প্রেরণের অতিরিক্ত ব্যয় ও বিপদ থেকে অব্যাহতি পেতেন।[৪০] তেমনই কুসীদজীবীরাও তাঁদের হুণ্ডি জমিদারকে অনুমোদন করে তাঁর কাছ থেকে স্বাভাবিক প্রাপ্য অর্থের উপরেও তাদের ফসল কেনার প্রয়োজনীয় মুদ্রা সেখানেই পেতে পারতেন। যতক্ষণ জমিদারের আর্থিক স্থিতাবস্থায় সন্দেহ হত ততক্ষণ তাকে সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য ঋণ দিতে কুসীদজীবীরা বড় একটা ইতস্তত করতেন না। জমিদারও বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পরিশোধ করে দিতেন যখন কৃষকরা তাদের খাজনার বেশির ভাগটাই জমা দিত।[৪১] জমিদার ও কুসীদজীবীদের মধ্যে সম্পর্কটি এইরকমই ছিল। অতএব ১৭৮০-র দশকে প্রাক্-মধ্যপর্বে তাঁর ঋণবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবীভাবেই তার অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ইঙ্গিতবাহী ছিল না।

কিন্তু অপরিশোধিত ঋণ ক্রমেই জমা হতে শুরু করল কারণ তার স্থানীয় প্রভাবের পতন, তার সম্পত্তির হ্রাস, সরকারি চাহিদার বৃদ্ধি এবং 'হ্যাচ-এর সংশোধনী নীতি'

প্রবর্তন। ১৭৮৬ সালে রাজস্ব পরিষদ আরও বেশি রাজস্বের আশায় দেশ থেকে সংগৃহীত মোট রাজস্বের থেকে জমিদারকে যে ছাড় দেওয়া হত তা তুলে নেওয়ার আদেশ দিল জেলার ইংরেজ শাসকদের।[৪২] সেই অনুযায়ী হ্যাচ দিনাজপুর জেলায় জমিদারির বার্ষিক ভাতা (মোসায়রা) এবং জমিদারি পরিচালনা বাবদ খরচ (আক্রাজোত) দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, যা সব মিলে এক ১৮৪,৪৪৪ এর মতো বড় অঙ্কের টাকায় দাঁড়াত এবং এতে সরকারকে দেয় নীট রাজস্ব ১৭৮৪ সালের ১,২৭৫,৯৬৮ টাকা থেকে বেড়ে ১৭৮৭ সালে ১,৪৬০,৪৪৪ টাকায় দাঁড়ালো।[৪৩] এর অর্থ ১৪.৫ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি। আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে 'হ্যাচ-এর সংশোধন'-এর ব্যাপারে এটুকু নির্দেশ করলেই যথেষ্ট হবে যে দিনাজপুরের জমিদারের পক্ষে এর অর্থ দাঁড়ালো জমিদারির পরিচালনা বস্তুতঃ তার হাতছাড়া হওয়া, মোটা মাইনের ব্যবস্থা হওয়ার[৪৪] দরুন তাঁর আর্থিক সম্পদের প্রায় শূন্য অবস্থা এবং তার নিজস্ব কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা প্রায় অবাধ আত্মসাৎকরণ। সরকারি চাহিদা বৃদ্ধি এবং ১৭৮০-র দশকের মাঝামাঝি 'হ্যাচ-এর সংশোধন'-এর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের আর্থিক অবস্থা এতটাই নিস্বতায় পর্যবসিত যে তাঁর পক্ষে আর আগের মতো নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ক্রমশ বর্ধিত সেই অপরিশোধিত ঋণাঙ্ক তাঁকে জমিদারির কিয়দংশ কুসীদজীবী ও অন্যান্য উত্তমর্ণের কছে জামিনস্বরূপ বন্ধক দিতে বাধ্য করল।[৪৫] তা না হলে তাঁর জমিদারি আরও অনেক আগেই শেষ হত। বলা বাহুল্য এতেও তার আর্থিক ভিত্তি সঙ্কীর্ণতর হল। ১৭৮৮ সালের একটি দলিলে দেখা যায় যে, তাঁর ঋণ এক গণেশ দাসের কাছেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩২৯,০৪৯ টাকা।[৪৬] যেখানে দিনাজপুরের জমিদার তাঁর যাবতীয় আবশ্যক ব্যয় নির্বাহ, যেমন সরকারি রাজস্ব, জমিদারি নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মচারীর বেতন, ধর্মীয় কর্তব্য ও দান বাবদ ব্যয়সহ ব্যক্তিগত সাংসারিক খরচ বাদ দেওয়ার পর[৪৭] নীট অতিরিক্ত সংগ্রহ থেকে উপার্জন করেছেন ৬০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা। অতএব তাঁর বাৎসরিক ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার তিনগুণেরও বেশি ধার দাঁড়ালো শুধুমাত্র গনেশ দাস-এর কাছেই। সুতরাং আর্থিক অবনতি তাঁর দেউলিয়া ভবিষ্যতের হিসেব অতি সরল ও ততোধিক স্পষ্ট করল।

২. নতুন ক্রেতা

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবে জমিদারের আর্থিক অবস্থা প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম। যখন এক প্রধান কুসীদজীবী বেনারসী ঘোষ ১৭৯৭ সালে কলকাতায় জমিদারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করলেন[৪৮] তখন জমিদারির অবশ্যম্ভাবী অবসানের চিত্রটি ফুটে ওঠে। যদিও জমিদারি বিক্রির ব্যাপারটি কার্যত শুরু হয় ১৭৯৮ সালের এপ্রিল মাসে। জমিদারের পক্ষে একটি বিরাট অসুবিধা হল যে ১৭৯৮ এবং ১৭৯৯ সালে বাংলার ঋণের বাজার অত্যন্ত অনিশ্চয়তাপূর্ণ হওয়ায় এই বছরগুলিতে কোনো রকম ঋণ এমনকি অত্যাধিক চড়া হারের সুদেও পাওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।[৪৯] বাংলার অগণিত অঞ্চলে সরকারি নিলামের যে ঝড় বয়েছিল ১৭৯৬ সাল থেকে ১৮০২ সাল পর্যন্ত[৫০] এবং 'যে অসংখ্য ঋণ সরকার মাঝে মাঝে ছেড়েছিল, প্রধানত, যুদ্ধ

পরিচালনার খরচ মেটাতে'[৫১] তা-ই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবে এই সময়ের সংকটপূর্ণ ঋণের বাজারটিকে। এই সংকটমুহূর্তে জমিদার, একবার মহাজন-পরিত্যক্ত হলে নিশ্চিতভাবেই তিনি রাজস্ব জমা দিতে অপারগ হতেন এবং কঠোর বিক্রি আইনের আওতায় বাকি পড়া এক কিস্তি রাজস্বের অর্থই অবিলম্বে তার জমিদারির আংশিক বা সামগ্রিক ভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার সমার্থ হয়ে উঠত। একবার যদি জমিদারির একটি অংশও বিক্রি হয় তবে আর কোনো মহাজনই কোনো শর্তেই তাঁকে টাকা ধার দিতেন না। ফলত সেই জমিদারি অতিদ্রুত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত। আঠেরো শতকের শেষের দিকে দিনাজপুরের পুরানো জমিদারেরা এই ঘটনা গতিরই অনিবার্যতার শিকার হয়েছিল।

বাংলা ১২০৩ (এপ্রিল, ১৭৯৭)-এর শেষের দিকে সরকারের কাছে ১৩৩,৪২৪ টাকার এক সুবৃহৎ অঙ্ক বাকি পড়ে যায়, তবে যেভাবেই হোক সেটি শোধ করা হয়েছিল।[৫২] বাংলা ১২০৪ সালের প্রথম কিস্তিই আবার বাকি পড়ল এবং তখনকার কালেক্টর সি. বার্ড বোর্ড অব রেভিনিউ বা রাজস্ব পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ৬০,৯১৫ টাকা রাজস্বের একটি পরগনা বিক্রির জন্য নিলামে তুলে দেন। লালা মানিকচাঁদ নামে তখনকার জমিদারি দেওয়ান সেটি কিনে নেন ৩১,০০০ টাকায়। যেহেতু এটি স্পষ্টতই একটি বেআইনি বিক্রি তাই বোর্ড হস্তক্ষেপ করে এবং বিক্রি বাতিল করে দেয়।[৫৩] বাংলা ১২০৪ সালের শেষের দিকে বাকি পড়া রাজস্বের পরিমাণ জমতে শুরু করল এবং ১২০৪ সালের মাঘ মাসের শেষে (ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮) বাকি রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াল ৪৫১,৬৯১ টাকার মতো বৃহত্তর।[৫৪] খরার জন্য রায়তরা খাজনা দিতে পারেনি এই মর্মে জমিদারের আবেদন সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন ও জমিদারির অংশ বিক্রি করার অনুমতি দেন।[৫৫] ১৭৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম সরকারি অনুমোদনে বিক্রি হয় এবং ৪১টি ভূমিখণ্ড (লট) যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮৩,৫৮৬ টাকা, তা ২৮১,৬৬০ টাকায় বিক্রি হয়ে যায়।[৫৬]

১৭৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জমিদারের হাতে আর বিক্রি করার মতো কোনো সম্পত্তিই রইল না। তাঁর বসতবাড়ি, অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি ঠাকুরবাড়িও ক্রোক হয়ে গেল অপরিশোধিত রাজস্বের জন্য।[৫৭] সরকারি ও বেসরকারি ঋণে জমিদার ১৮০১-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জর্জরিত ছিলেন। কালেক্টর জি. স্মিথ তাঁর মৃত্যুসংবাদটি বোর্ড অব রেভিনিউকে জানিয়েছিলেন নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

> "এই অল্প কদিন আগে তার কী অবস্থা ছিল সেকথা সর্বজনবিদিত, বিশেষত –মি.হ্যারিংটন আর মি. হ্যাচ আপনারা ভালোই জানেন। তাঁকে ধরে সাধারণ কয়েদখানায় ছুড়ে দিতে আগ্রহী সেই উত্তমর্ণদের নজরবন্দী হয়ে নিজগৃহে কি দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। যখন হতভাগ্য লোকটির এই পরিণতি তখন দুজন দেওয়ান এবং এইসঙ্গে আমাকে একজনের পৌত্রকেও যোগ দিতে হচ্ছে (আমি এই কালেক্টরশিপের স্বর্গত দেওয়ান ফুলচাঁদের কথা বলছি) যারা ধনী, স্থূলকায় ও বর্ধিষ্ণু হয়ে উঠলেন এবং সেইসঙ্গে মালিক হলেন তাঁদের সেই হতভাগ্য প্রাক্তন মালিকের অত্যন্ত জাঁকাল জমিদারের কয়েকটি চমৎকার অংশের-ও।"[৫৮]

৩. নতুন ক্রেতা বিশ্লেষণ

এবার সেইসব ক্রেতাদের সামাজিক উৎস দেখা দরকার যাঁরা ১৭৯৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৭৯৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন নিলামে জমিদারির অংশগুলি কেনেন। বিক্রির যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে তার পরিমাণ হল এই জমিদারির মোট ভূমিরাজস্বের দাবির আশি শতাংশেরও বেশি।[৫৯] অতএব, এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে সরকারি নিলামগুলিতে যাঁরা ভূমিখণ্ডগুলি কিনেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে একটি যথেষ্ট সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। সংগৃহীত তথ্যে এইরকম তেরটি বিক্রির হিসাব আছে যেখানে ২৩৯টি ভূমিখণ্ড , যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,১৯৫,৯১৯ টাকা, সেগুলি ১৬০ জনেরও বেশি ব্যক্তির কাছে নিলামে বিক্রি করা হয়েছিল মোট ৮৩৭,৩৫৯ টাকার ক্রয়মূল্যে। সবকটি মূল বিক্রি সংগঠিত হয়েছিল দিনাজপুরের কালেক্টরের দপ্তরে। একবার কয়েকটি ভূমিখণ্ড কলকাতায় বিক্রি করা হয়েছিল দিনাজপুরে একটি বিফল বিক্রির পরে, কিন্তু সেখানে যে দাম দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তা ছিল অত্যল্প বা তাদের রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর ফলে কলকাতায় সরকারি বিক্রি একেবারেই পরিত্যক্ত হল।[৬০]

সারণি ঃ ২ বড় বড় ক্রেতাগণ যাদের প্রত্যেকের মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকার বেশি

নং	নাম	বাসস্থান	ভূমিখণ্ডের সংখ্যা	মোট রাজস্ব টাকা	ক্রয়মূল্য টাকা
১.	নারায়ণ চাঁদ রায়	দিনাজপুর	২৭	১০০,২৫২	৪২,৮৭৫
২.	মোক্তার মোহন সেন	কলকাতা	৮	৫৬,৬১৪	১৮,১২০
৩.	বৈদ্যনাথ দত্ত মণ্ডল	রাজগঞ্জ	৮	৫৩,৫৯৪	৪৩,২০০
৪.	কিষেণকান্ত রায়	দিনাজপুর	৮.৫৩	৩৯,১৯০	৩০,১৩৬
৫.	উলী মহম্মদ	দিনাজপুর	৭	৩৮,৬০২	৩৫,৪০০
৬.	ভবানী তালুকদার	রাজগঞ্জ	৭.৫	৩৩,৮৭৮	২১,১৬০
৭.	ধীরনারায়ণ চৌধুরী	খোলোরা	৫	৩২,৭৮৮	২৪,২৬০
৮.	নিত্যানন্দ রায়	মুর্শিদাবাদ	৬	৩০,৩৯২	২৯,১২৫
৯.	মানিকচাঁদ	পাটনা	৪	২৮,৮১২	২৬,৩৭৫
১০.	রাণী ত্রিপুরী সুন্দরী	দিনাজপুর	৫	২৪,৯৩৩	২৯,০৫০
১১.	ঠাকুরদাস নন্দী	খুলনা	৩	২১,৮০৫	৬,১০০
১২.	রাণী সরস্বতী আনন্দময়ী	দিনাজপুর	৩	২১,৫৭৯	১৬,২৬০
১৩.	উত্তমচাঁদ	দিনাজপুর	৫	২০,১২১	১৭,২৫৫

উৎসঃ পরবর্তী ৩ নম্বর তালিকার অনুরূপ

সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ক্রেতাদের নাম ঠিকানা থাকায় তাঁদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়, যেমন জনৈক পার্বতীচরণ দুটি ভূমিখণ্ড কিনেছিলেন ১৬,৫২৫ টাকায়। বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নথিপত্রে দুজন পার্বতীচরণকে দেখা যায়, একজন ব্যবসায়ী এবং অন্যজন দিনাজপুরের জমিদারের কর্মচারী। দুজনের মধ্যে কোনজন নিলামে ক্রেতা ছিলেন তা নির্ণয় করার কোনো নিশ্চিত উপায় নেই। এই ক্ষেত্রে যদিও সহজেই সেই ব্যবসায়ী পার্বতীচরণকে চিহ্নিত করা যায়। কারণ অত বড় বড় এলাকা কেনা একজন জমিদারের কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, প্রদত্ত বিশ্লেষণটি এই শর্তেই গ্রহণীয়।

উপস্থাপিত সারণি ঃ ২-এ দেখা যাচ্ছে ক্রেতাদের নাম ঠিকানা, ভূমিখণ্ডের সংখ্যা, রাজস্ব এবং ক্রয়মূল্য যাদের প্রত্যেকের মোট দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকার বেশি।

সবচেয়ে বড় ক্রেতা নারায়ণ চাঁদ রায় একজন অল্পবয়স্ক ছেলে। নিঃসন্দেহে সে রামকান্ত রায়ের বেনামি, যাঁর যৌথ দেওয়ানি ছিল লালা মানিকচাঁদ-এর সঙ্গে জমিদারির অবসানের সময়ে।[৬১] তাকে ঐ উচ্চপদে উন্নীত করেছিলেন হ্যাচ, যার কালেক্টর থাকাকালীন গোটা সময়টিতে তিনি ছিলেন তাঁর বিশ্বাসী দালাল।

দ্বিতীয় ক্রেতা মোক্তার মোহন সেন এই ৮টি ভূমিখণ্ড কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সরকারি নিলামে খুব কম দামে পেয়েছিলেন। তার পেশা নির্ধারণ করতে পারা যায়নি। পরে তিনি ভূমিখণ্ডগুলির একটি অংশ ছয়জন ব্যক্তিকে বিক্রি করেন।[৬২]

তৃতীয় ক্রেতা বৈদ্যনাথ দত্ত মণ্ডল ছিলেন দিনাজপুর জেলার রাজগঞ্জ নামে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর পুত্র যদুনাথ দত্তও ৫টি এলাকা কিনেছিলেন (যার মোট রাজস্বের পরিমাণ ১৫,৪০৪ টাকা; ক্রয়মূল্য ১৪,৪৬৫ টাকা)। বৈদ্যনাথ মণ্ডল জমিদারকে টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং ১৭৯৮ সালে বন্ধক হিঁসাবে নিয়েছিলেন একটি পরগনা।[৬৩]

চতুর্থ ক্রেতা কিষেণকান্ত রায় ছিলেন রামকান্ত রায়-এর এক ভাই। তিনি রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বেশ কয়েকটি জমি কিনেছিলেন যেগুলির মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫০,০০০ টাকায়।[৬৪]

পঞ্চম ক্রেতা উলী মহম্মদ ছিলেন কালেক্টরেটের একজন নাজির। প্রথমে তিনি জমিগুলি কেনেন নিজের নামে। কিন্তু কালেক্টর জে. এলিয়ট তাকে বেনাম ব্যবহারের উপদেশ দেন, যেহেতু সরকারি নিলামে আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মীদের উপর এবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাই নিলামটি বাতিল করে দেন।[৬৫] পরবর্তী নিলামে তিনি এই জমিগুলি কেনেন তার ছেলেদের নামে। তিনিও দেওয়ান লালা মানিকচাঁদের মাধ্যমে অত্যধিক চড়া হারের সুদে জমিদারকে টাকা ধার দেন ১৭৯৬ ও ৯৭ সালে।[৬৬]

ষষ্ঠ ক্রেতা ভবানীপ্রসাদ শর্মা তালুকদার ছিলেন দিনাজপুর কালেক্টরেটের একজন মুখ্য সেরেস্তাদার। তিনি এই জমিগুলি কেনেন তাঁর ছেলেদের নামে। কেনার পর অবিলম্বে তিনি সেগুলির কয়েকটিকে বেসরকারি ভাবে বিক্রি করেন দুজনের কাছে এবং খুব সম্ভব ভাল রকমই লাভ করেন।[৬৭]

ধীরনারায়ণ চৌধুরী, সপ্তম ক্রেতা, পূর্ণিয়াতে খোলোরার একজন প্রাক্তন জমিদার হিসাবে নথিভুক্ত।[৬৮]

অষ্টম ক্রেতা, নিত্যানন্দ রায় মুর্শিদাবাদে থাকতেন, কিন্তু তার পেশা নির্ণয় করা যায়নি।

লালা মানিকচাঁদ, নবম ক্রেতা, ছিলেন দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তিনি জেলার সরকারি দেওয়ান এবং দিনাজপুর জমিদারির যৌথ-দেওয়ান হিসাবে বহুবছর কাজ করেছিলেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র কীর্তিচাঁদ এবং সঙ্গমলালও কয়েকটি জমিখণ্ড কিনেছিলেন। বিক্রির হিসাবপত্রে দেখা যায় যে প্রথমজন একটি জমিখণ্ড

কেনেন (রাজস্ব ৬০৮২ টাকা, ক্রয়মূল্য ৪০০ টাকা) এবং পরবর্তীজনও একটি ভূমিখন্ড কেনেন (রাজস্ব ৮,৪২৭ টাকা, ক্রয়মূল্য ৫২৭৫ টাকা) ফুলচাঁদ যিনি ছিলেন মানিকচাঁদের একজন পৌত্র এবং যিনি জমিদারিটির অবসানের সময়ে দিনাজপুর জেলার সরকারি দেওয়ানের কাজ করছিলেন, তিনি তখনকার কালেক্টর ই. ওয়েব-এর সামনে সাক্ষ্য দেন যে কীর্তিচাঁদ ৪টি জমিখণ্ড কেনেন এবং মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র মিত্রলাল কেনেন দুটি জমিখণ্ড।[৬৯] দিনাজপুরের জমিদার তার আবেদনপত্রগুলির একটিতে অভিযোগ করেন যে ফুলচাঁদও অনেকগুলি জমিখণ্ড কেনেন যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা।[৭০] কিন্তু এর সত্যতা নির্ণয় করা যায়নি। অতএব, আমরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে মানিকচাঁদ ও তার জ্ঞাতিরা বিক্রির হিসাবপত্রে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশিই জমি কিনেছিলেন।

রাণী ত্রিপুরী সুন্দরী, দশম ক্রেতা, ছিলেন দিনাজপুর জমিদার-এর পত্নী।

একাদশতম ক্রেতা ঠাকুরদাস নন্দী ছিলেন রাজগঞ্জের একজন প্রধান ব্যবসায়ী।[৭১] ১৮০৭ ও ১৮০৮ সালে এই জেলার অনুপুঙ্খ সমীক্ষক বুকাননের মতে, তিনি কলকাতার কাছে খুলনায় বাস করতেন, দিনাজপুর থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল কিনতেন যা পাঠানো হত কলকাতা এবং মুর্শিদাবাদের বাজারে।[৭২] বিক্রির হিসাবপত্রে আমরা আরও কয়েকজন নন্দীকে পাই। জয়দেব নন্দী কিনেছিলেন ২টি জমি (মোট রাজস্বের পরিমাণ ১৪,৪৫৩ টাকা, ক্রয়মূল্য ৬,০০০ টাকা) এবং কাশীনাথ কেনেন একটি জমি (রাজস্ব ৬,৫৩১ টাকা, ক্রয়মূল্য ৩,১০০ টাকা)। খুব সম্ভব তারা ঠাকুরদাস-এর জ্ঞাতি, কারণ তাঁরই মতো তাঁরা দুজনেও কলকাতায় অনুষ্ঠিত একই নিলামের খরিদ্দার। পার্বতীচরণ নন্দী ছিলেন দিনাজপুরের একজন বড় কুসীদজীবী, যাঁর বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল কালেক্টরেটের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে।[৭৩] তাকে ভালভাবেই চিনতে পারা যায় অষ্টাদশতম ক্রেতা পার্বতীচরণ হিসাবে, যিনি দুটি জমিখণ্ড (মোট রাজস্ব ১৪,৩৮১ টাকা, ক্রয়মূল্য ১৬,৫২৫ টাকা) কিনেছিলেন সরকারি নিলামে। আরও একজন নন্দী ছিলেন রাজকিশোর, যিনি মুর্শিদাবাদের একজন উল্লেখযোগ্য কুসীদজীবী এবং যার বিভাগীয় শাখা ছিল দিনাজপুর এবং কলকাতায়।[৭৪] সম্ভবত এই নন্দীরা সবাই ছিলেন একই পরিবারভুক্ত।

উত্তমচাঁদ, ত্রয়োদশ ক্রেতা, ছিলেন খড়্গ সিং নাহার নামে রাজগঞ্জের এক বড় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর পুত্র। খড়্গ সিং নিজেও দুটি জমিখণ্ড (মোট রাজস্ব ১১,৩৭৭ টাকা, ক্রয় মূল্য ১৭,৩৪০ টাকা) কিনেছিলেন নিজের নামে। খড়্গ সিং ছিলেন দিনাজপুরের জমিদারের অন্যতম উত্তমর্ণ এবং জামিল হিসাবে তিনিও গ্রহণ করেছিলেন একটি পরগনা।[৭৫]

সারণি ঃ ৩-এ দেখা যায় নিলামগুলিতে দিনাজপুর জমিদারির নতুন ক্রেতাদের মধ্যে প্রধান পাঁচটি দলকে।

আমাদের তথ্যে ১৩টি সরকারি বিক্রি বর্ণিত হয়েছে যেগুলিতে ২৩৯টি ভূমিখণ্ড (মোট রাজস্ব ১,১৯৫,৯১৯ টাকা; ক্রয়মূল্য ৮৩৭,৩৫৯ টাকা) নিলাম হয়েছিল। তাদের মধ্যে সেইসব ক্রেতা যাদের দেয় রাজস্ব ছিল সর্বসমেত ৭৭১,০৮৯ টাকা, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই চিহ্নিত ক্রেতাদের নব্বই শতাংশেরও বেশি ছিলেন উপরিউক্ত

পাঁচটি সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে তাঁরা প্রায় একচেটিয়াভাবে অধিকার করেছিলেন সরকারি নিলামে বিক্রি হওয়া জমিদারি এলাকা। এতদ্‌সত্ত্বেও এটি লক্ষণীয় যে সারণি ঃ ৩-এর শ্রেণীবিভাজন পরীক্ষামূলক। এখানে লালা মানিকচাঁদ সরকারি কর্মচারীবৃন্দের শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু বস্তুত তিনি একই সময়ে একজন জমিদারের দেওয়ান-এর পদেও ছিলেন। তিনি একদা মুঘল সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী ছিলেন। এবং সেখান থেকেই ব্রিটিশ স্থানীয় শাসকদের অনুমোদনক্রমে রংপুরে নিযুক্ত হন।[৭৬]

সারণি ঃ ৩ সরকারি নিলামগুলিতে প্রধান পাঁচটি দলের ক্রয় করা ভূমিখণ্ডগুলির সংখ্যা, নিজ নিজ মোট রাজস্ব এবং ক্রয়মূল্য প্রদর্শন তালিকা।

দল ও নাম (১)	ভূমিখণ্ডের সংখ্যা (২)	মোট রাজস্ব টাকা (৩)	ক্রয়মূল্য টাকা (৪)
(১) জমিদারের কর্মচারীবৃন্দ			
রামকান্ত রায়, স্বর্গত জমিদারের দেওয়ান (বেনামিতে এবং তার জ্ঞাতি দ্বারা ক্রয় করা ভূমখণ্ড সহ)	৩৭.৫৩	১৫০,৪৮২	৭৪,৭৩৬
মুন্নালাল ইত্যাদি পুরাতন পারিবারিক কর্মচারীবৃন্দ	২.৬৭	১৬,৪৭৬	৯,০৭৮
চেতনচরণ নিয়োগী, তহশিলদার[৭৭] (বেনামিতে)	২.৩৩	১১,১০১	৪,৩০৮
শচীনন্দন, তহশিলদার	১	৭,১৬০	৭,৭০০
বিনোদরাম, পরগনার স্বর্গত নায়েব	১	৬,৯৩৫	৬,৭০০
রাজীব আলি, ঐ	১	৬,৪৬৪	২,৯০৫
শান্তিরাম, ঐ	১	৪,৫২৫	২,৬৫৮
গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী, ঐ	১	৪,৩০১	৬৩০
রামচন্দ্র রায়, তহশিলদার	১	৩,৫২৮	৮০০
দীন দয়াল, ঐ	০.৫	২,৫৭২	৭৪৫
মোট	৪৯.০৩	২১৩,৫৪৪	১১০,২৬০
(২) সরকারি কর্মচারীবৃন্দ			
মানিকচাঁদ, স্বর্গত সরকারি দেওয়ান (জ্ঞাতি সহ)	৭.৫	৪৩,৩২১	৩২,০৫০
উলী মহম্মদ নাজির (বেনামিতে)	৭	৩৮,৬০২	৩৫,৪০০
ভবানী তালুকদার, মুখ্য সেরেস্তাদার (বেনামিতে)	৭.৫	৩৩,৮৭৮	২১,১৬০
ফার্নান্ডেজ, লেখক, (বেনামিতে)	৩	১৪,২৫১	১৪,৪৫০
বিদেনাথ চৌধুরী, আবগারি সেরেস্তাদার (বেনামিতে)	৩	১২,৬৩০	৯,২৭৫
শিবচাঁদ, পুলিশ-কর সংগ্রাহক	২.৫	১১,০৭৫	১২,৭২৫
মহম্মদ আলি, মুনশী,[৭৮] (বেনামিতে)	২	৯,৮১৩	১,০০০
সৈয়দ মহম্মদ, মুর্শিদাবাদের কোর্ট অব সারকিট ও অ্যাপীল কোর্টের কাজী	১	৭,৮৮২	৫,১০০
জগন্নাথ সেন, কালেক্টরের ব্যক্তিগত কর্মচারী	১	৬,৮৭৬	৪,০০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
মুসিতুল্লা, মুনশী	১.৫	৪,৬৫৩	৩,২৮৮
লক্ষ্মীকান্ত, পুলিশি-কর সংগ্রাহক	১.৫	৪,৫৪৮	১,৫৭৩
রাধাকান্ত দাস, আবগারি প্রতিষ্ঠানের মুহুরি[৭৯]	০.৮৩	৪,৩০৩	৭৯৭
গঙ্গানারায়ণ সেন, দলিল রক্ষক	০.৫	২,৫৭২	৭৪৫
মায়ারাম সাহা, পুলিশি-কর সংগ্রাহক	০.৫	২,৪১২	১,৬৫২
রাজমোহন কালেক্টরের মুহুরী	০.৩৩	২,১৪৮	৩০৮
মোট	৩৯.৬৭	১৯৮,৯৬৪	১৪৩,৫২৩
(৩) ব্যবসায়ীবৃন্দ			
বিনোদনাথ মণ্ডল (জ্ঞাতিসহ)	১৪	৭৪,৪৬২	৭০,৬৭০
নন্দী (ঠাকুরদাস, জয়দেব ও কাশীনাথ)	৬	৪২,৭৮৯	১৫,২০০
খড়্গা সিং (জ্ঞাতিবর্গ সহ)	৭	৩১,৪৯৮	৩৪,৫৭৫
পার্বতীচরণ নন্দী	২	১৪,৩৮১	১৬,৫২৫
রাজীবলোচন	১	৬,৪৬৪	২,৯০৫
মোট	৩০	১৭০,৫৯৪[৮০]	১৩৯,৮৭৫
(৪) জমিদারের নিকট আত্মীয়বর্গ			
রাণী ত্রিপুরা	৫	২৪,৯৩৩	২৯,০৫০
রাণী সরস্বতী	৩	২১,৫৭৯	১৫,২৬০
জনকনাথ সিং	১	১১,১০৬	৭,৬৫০
গৌড়মোহন সিং	০ ৩৩	১,৮৯৪	৪৫৬
মোট	৯.৩৩	৫৯.৫১২	৫২,৪১৬
(৫) প্রতিবেশী জমিদারবর্গ			
ধীরনারায়ণ চৌধুরী, খোলোরার জমিদার (তাঁর জ্ঞাতিবর্গ সহ)	৭	৪২,০৯৪	২৬,৭৬০
রাজময় চৌধুরী ও কিষেণচাঁদ (পুর্ণিয়া জেলার দুজন জমিদার)	২	৭,৪৫২	১,৯৩০
মোট	৯	৪৯,৫৪৭	২৮,৬৯০
সর্বমোট	১৩৭.০৩	৬৯২,১৬১	৪৭৪,৭৬৪

উৎস ঃ বি আর-এম-এসি-ডি এন আর-এর প্রাসঙ্গিক বিবৃত্তিগুলি এবং বি আর-পি, জে ডি-সিভি-পি অ্যান্ড কোং এর বিবরণীগুলি থেকে প্রস্তুত। নতুন ক্রেতাদের চিহ্নিত করার জন্য নিম্নলিখিত গুলি সবচেয়ে কার্যকবী হয়েছে।

বি আর-পি ঃ ২০-৬-১৮০০, নং ৯-৩০; ২৯-৭-১৮০০,নং ২-৩
১৪-১০-১৮০০, নং ৬; ৪-১১-১৮০০, নং ২৩-২৭
১১-১১-১৮০০, নং ১৩; ১২-৬-১৮০১, নং ৪৫-৪৬
১৯-৬-১৮০১, নং ২৭এ-৩১; ৭-৭-১৮০১, নং ৫৪
১৭-৭-১৮০১, নং ৯-১৬; ২৪-৭-১৮০১, নং ৯
৮-৮-১৮০১, নং ৩১ ও ৩৯, ১-৫-১৮০৪, নং ৩৭-৩৯
৭-৮-১৮০৪, নং ১৬-১৭; ১০-১২-১৮০৫, নং ১-৩
৩-১-১৮০৬, নং ৬-৮; ২৬-১২-১৮০৬, নং ১৯

এই প্রাথমিক উৎসগুলি ছাড়াও প্রাগুক্ত এফ. ও. বেল-ও সহায়ক হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যমূলে অনুমান করা যায় যে তিনি কোম্পানির সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রে এই অঞ্চলে প্রভূত প্রভাব এবং সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। এ-কারণে

তাকে সরকারি পরিচয়ে শ্রেণীভুক্ত করাই যথাযথ। জমিদারি দেওয়ান রামকান্ত রায় দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন জমিদারের পরিবারের সঙ্গে।[৮১] কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁকে জমিদারের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে জমিদারের কর্মচারী সম্প্রদায়ভুক্তির দেখানোর কারণ তিনি তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন নিজের জমিদারি দেওয়ানের পদের সুযোগ নিয়ে, যে পদে তাকে উন্নীত করেছিলেন জি. হ্যাচ। বস্তুত জমিদার তাকে একজন শত্রু বলেই মনে করতেন।[৮২]

তবুও এই সারণি ঃ ৩ স্পষ্টতই দেখায় যে সরকারি কর্মচারী, জমিদারের কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী-মহাজনবর্গ যারা দিনাজপুর জমিদারির পতন ঘটানোর প্রধান হোতা, তারাই নতুন ক্রেতাও বটে। উল্লিখিত হয়েছে যে বহু বড় বড় ক্রেতা জমিদারকে টাকা ধার দিতেন এবং বন্ধক হিসাবে নিতেন পরগনাগুলি। তা বিশ্বাসযোগ্য, যদিও প্রমাণ করা কঠিন, যে তারা অনেকেই ভূমিখণ্ডগুলি লাভ করেছিলেন জমিদারের অপরিশোধিত ঋণের বদলে।

দিনাজপুর জেলার সেট্‌লমেন্ট অফিসার এফ. ও. বেল লিখেছিলেন ঃ

> "গল্প ছড়াচ্ছে যে রাজার কর্মচারীরা জমিখণ্ডগুলি কিনে ভাল করেছেন কিন্তু তাদের কেনার চিহ্ন অতি সামান্যই; যদি-না আমরা রামকান্ত ও তার ভাইকে ধরি।"

তিনি আরও যুক্তি দেখান যে ঃ

> "ক্রেতাদের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরা অল্পই ছিলেন।"[৮৩]

কিন্তু বেল-এর যুক্তির বিরুদ্ধে সারণি ঃ ৩ প্রতিপাদন করে যে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ এবং জমিদারের কর্মচারীবৃন্দই ছিলেন প্রধান ক্রেতা।

উপরিউক্ত পাঁচটি দলের হাতে ভূমিখন্ডগুলির কেন্দ্রিভূত হওয়ার কারণগুলি অন্তত দুই রকম। প্রথমত, সরকারি নিলাম পরিচালিত হত উৎসাহী সরকারি কর্মচারীদের সহায়তায় এবং সেইজন্যই, তাঁদের সঙ্গে পরিচয়হীন ব্যক্তিদের পক্ষে সরকারি নিলামে কোনোরকম লাভজনক এলাকা কেনাটা কঠিনই ছিল।[৮৪] দ্বিতীয়ত, এলাকাগুলির আয়তন স্থানীয় লোকেদের কেনার পক্ষে ছিল অতিরিক্ত বড়। বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কঠোর আদেশই ছিল যে বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট প্রতিটি জমির রাজস্ব যেন যতদূর সম্ভব উঁচুতে ধরা হয়, প্রায় ৫০০০ টাকা।[৮৫] যেহেতু তাঁরা জমিদারিটিকে অমন খণ্ডবিখণ্ডতায় ভাগ করতে চাননি। ১৮০৪ সালে, কালেক্টর টি. গ্রাহাম যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে বোর্ড যদি ক্ষুদ্রতর আয়তনের জমিখণ্ড বিক্রির অনুমোদন করে আর যদি পরগনার মণ্ডলরা এগিয়ে আসে তবে বিক্রির সময়ে ক্রেতাদের মধ্যে দর হাঁকার প্রতিযোগিতা আরও বেশি হবে, তার ফলে সম্ভাব্য ক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে।[৮৬] ছোট ছোট আয়তনে জমিদারিটি বিক্রির অনুমতি যদি বোর্ড দিত, তবে নতুন জমিদারশ্রেণীর গঠন হয়ত কিছুটা ভিন্নরকম হত।

এই সূত্রে নিলামের পরে-পরেই জমির ঘনঘন বিক্রি এবং বিভাজনের ক্রিয়াগতিতে নজর দিতে হয়। কখনও কখনও কালেক্টর ও তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে ভালরকম পরিচিত ব্যক্তিগণ নিলামে নিজেদের নামে জমি কিনতেন, কিন্তু আসলে ক্রয়মূল্যটি দিতেন অন্যরা যারা সেগুলি নিজেদের জন্য নিতে চাইতেন। পরবর্তীরা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর যেসব ভূখন্ড লাভ করতেন নামমাত্র বেসরকারি বিক্রির মাধ্যমে এবং পূর্বোক্ত ক্রেতা, অবশ্যই

পুরষ্কার হিসাবে বেশ ভাল পরিমাণই লাভ করতেন।[৮৭] অন্য ক্ষেত্রে, কিছু ব্যক্তি যারা বড় জমির একটি অংশ কিনতে চাইতেন তারা একত্র হয়ে যৌথ মালিকানায় তা কিনতেন। কখনও কখনও তাঁরা যৌথভাবেই ভূমিখন্ডটি অধিকার করে রাখতেন এবং কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি ভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতেন।[৮৮]

বিক্রির হিসাবগুলি দেখলে যথার্থই বিস্মিত হতে হয় যে কী কম দামে দিনাজপুরের জমিদারিটি বিক্রি হয়েছিল ১৭৯৯ সালে। ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সালের ঋণবাজারের মন্দা নিশ্চয়ই ঋণদান ব্যবস্থাকে কঠোর নিয়মে আটকেছিল তা অস্বীকারের নয়। তা সত্ত্বেও, জমিদারের পক্ষে অধিকতর সর্বনাশ করেছিল সরকারি কর্মচারীদের অসাধুতা। বাংলা ১১৯৮ বঙ্গাব্দ (১৭৯১/২) হ্যাচ কর্তৃক প্রস্তুত পঞ্চবার্ষিক নথিকরণে জমিদারিটির অন্যায্য এবং অসম রাজস্বের হার আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নথিকরণে রাজস্ব নির্ধারণে ভারসাম্য ছিল না, কয়েকটি মহলের কম আবার কয়েকটির চড়া।[৮৯] ফলে সেগুলির কয়েকটি খুবই লাভজনক হয়েছিল এবং অন্যগুলির ক্ষতি হয়েছিল। সরকারি আমলারা অবশ্যই, খুব ভাল করে জানতেন কোন মহলগুলি লাভজনক আর কোনগুলি নয়। ১৮০৪ সালে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল, ওয়েলেসলিকে লেখা চিঠিতে বোর্ড অব রেভিনিউ উল্লেখ করেন যেঃ

> "ঐ সময়ে (১৭৯৯) দিনাজপুরের জমিগুলি যে কম দামে বিক্রি হয়েছে তাতে কালেক্টরের সঙ্গে যুক্ত আমলাদের অন্যায় প্রভাব তার একটা বড় কারণ বলে ধরে নেবার মত যথেষ্ট যুক্তি আমাদের রয়েছে,"[৯০] এবং সেইসঙ্গে আবগারি বিভাগের প্রয়াত মুন্সুরি রাধাকান্তের বেনামিতে কেনা জমিগুলি পুনরায় বিক্রির সুপারিশ করেন। ১৭৯৯ সালে ২০৫ টাকায় কেনা রাধাকান্তের জমিগুলি ১৮০৪-এর পুনর্বিপননে পাওয়া যায় ১২,৩৩৫ টাকার বিরাট অঙ্ক।[৯১]

সরকারি আমলারা সেই বছর সরকারি বিক্রিতে কী পরিমাণ কুকর্ম সাধন করেন তারই ইঙ্গিত এই ঘটনা। এই অসম রাজস্বের হারই খানিকটা ব্যাখ্যা করে কেন অনেক নতুন ক্রেতা তাদের রাজস্ব দিয়ে উঠতে পারেননি এবং কেন তাঁদের জমিদারিগুলি সরকারি কর্তৃত্বে আবার বিক্রি হয়ে যায় আশ্চর্য তাড়াতাড়িতে। ১৮০০ সাল থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৮৩টি ভূখণ্ড বা ভূমির অংশ যেগুলির মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮৯,১৩১ তা দিনাজপুরে ফের বিক্রি হয়, যার ক্রয়মূল্য ছিল ২৭৯,৩৯৬ টাকা।[৯২]

৪. নতুন ক্রেতাদের জমিদারি পরিচালনা

বাংলা ১১৯৪ অব্দে (১৭৮৭/৮) দিনাজরপুর জেলাটি ২৮টি জমিদারি নিয়ে গঠিত ছিল, কিন্তু জেলাটির প্রায় নব্বই শতাংশ নিয়ে গঠিত পুরাতন জমিদারের জমিদারিটির পতনের অব্যবহিত পরেই তার মালিক হলেন কম করেও ৪০০ জন ছোট ছোট জমিদার।[৯৩] ফলে যা ঘটল তাহল পুরানো ও বড় জমিদারের পতন এবং অসংখ্য নতুন ও ছোট ছোট জমিদারের উত্থান।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নতুন ক্রেতারা বেশিরভাগই ছিলেন সরকারি আমলা, আগের জমিদারের কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী। তাঁদের অনেকেরই নিজেদের পেশা

দেখাশোনার সময় ছিল না এবং তাই সেই নতুন জমিদারি পরিচালনার ভার দেওয়া হল তাদেরই দেওয়ান বা গোমস্তাদের। এখান থেকেই অনুপস্থিত জমিদারি প্রথার শুরু, আর তা হয়ে ওঠে গ্রামাঞ্চলে দেওয়ানদের বেআইনি কর আদায়ের ঢালাও বন্দোবস্ত। এতদসত্ত্বেও বুকানন লক্ষ্য করেন যে তাঁদের জমিদারিগুলি সাধারণভাবে ছিল পুরানো পরিবারের জমিদারির চেয়ে সুপরিচালিত। তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন ঃ

> "প্রতিনিধি আমলারা সবকিছুই নিজেদের মত করে পরিচালনা করেন; কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, যেহেতু তাঁদের মনিবরা সকলেই সাধারণভাবে দক্ষ কাজের লোক এবং নিজেরাই আগে আমলা থাকার দরুন জমিজমার কাজ বোঝেন, তাই তাঁদের জমিদারিগুলির উন্নতি হচ্ছে এবং এগুলি তুলনামূলকভাবে সুপরিচালিত।"[১৪]

আর একটি বিষয় যা নতুন জমিদারদের জমিদারি পরিচালনা সহজতর করেছিল তাহল ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন (হপ্তম) পাশ। এই আইনবলে জমিদাররা কৃষকদের উপরে অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। জমিদারির নিম্নতর কর্মচারীদের সঙ্গে কৃষকদের ষড়যন্ত্র তবুও চালু রইল,[১৫] কিন্তু কৃষকদের এই ধরনের ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য ধরনের কৌশলের মোকাবিলা করার জন্য জমিদাররা নিঃসন্দেহে ভালরকম প্রস্তুত ছিলেন সরকারের জোরদার সমর্থনের জোরে, বিশেষ করে, কর্ণওয়ালিশ-এর প্রতিষ্ঠিত নতুন বিচার ব্যবস্থায়।

পঞ্চম ক্রেতা উলী মহম্মদ তিনটি ভূখণ্ড কেনেন দেহট্ট পরগনায়।[১৬] কেনার অব্যবহিত পরেই তিনি নিজেই পরগনার অভ্যন্তরে যান এবং ঘোষণা করেন যে তিনি ঐ-অঞ্চলের নতুন মালিক। বাজারগুলিতে তিনি কৃষকদের একত্রিত করেন এবং বাঁশ পুঁতে দেন, যেগুলি ছিল জমির মালিকানার প্রতীক। তিনি তারপর 'রায়তদের সন্তুষ্ট' করেন তাদের পুরানো পাট্টা মেনে নিয়ে বা কৃষিঋণ (তাকাভি) অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ভূখণ্ডগুলিতে নিয়োগ করেন তহশিলদার বা স্থানীয় পরিচালকদের এবং পূর্বতন কোতোয়াল ও পাইক যারা তাঁর অধীনে কাজ করতে রাজি তাদের খাজনামুক্ত চাকরান জমির অধিকার বহাল রাখার অনুমতি দেন। এছাড়াও তিনি প্রতি হাজার টাকা খাজনা আদায়ের জন্য একজন করে মণ্ডল বা গ্রামপ্রধানও নিয়োগ করেন। খাজনা প্রথমে গ্রামের মণ্ডলরা সংগ্রহ করতেন এবং তারপর প্রেরণ করতেন নিম্নতর খাজনা আদায়কারী বা কর্মচারীদের কাছে। কর্মচারীরা তা দিতেন ভূমির তহশিলদারকে, যিনি সেই খাজনা পৌঁছে দিতেন রাজগঞ্জে নতুন জমিদার উলী মহম্মদকে। যখন কৃষকরা তহশিলদারের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতেন তখন তারা সরাসরি উলী মহম্মদ-এর কাছেই সে বিষয়ে অভিযোগ করতেন। জমিদারিতে অনুপস্থিত থেকেও তার ব্যবস্থাপনার উপর তিনি এইভাবেই নজর রাখতেন। বুকানন জনৈক গুরুপ্রসাদের উল্লেখ করেছেন যিনি ঃ

> "শুধুমাত্র নিজের হিসাবপত্রই যত্নসহকারে পরীক্ষা করেন না, যখনই তিনি কারচুপি সন্দেহ করেন তখনই সেইখানে নিজের হাতে মাপবার দড়ি তুলে নিয়ে নিজের আমলাদের সত্যবাদিতা সরেজমিনে পরীক্ষা করেন। তার সব কিছুই ভদ্র এবং সম্মানজনক এবং জমিদারিটি যেন একটি সাজান বাগান।"[১৭]

'পুরানো' জমিদারদের মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়াস বিরল ছিল এবং এমনকি যদি বা তাদের সেই ইচ্ছাও থাকত তাদের জমিদারির বৃহদায়তনই নিশ্চয় তাদের এইধরনের তত্ত্বাবধান থেকে ব্যাহত করত। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নতুন জমিদারের

নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দের কিছু উদাহরণ বুকানন আমাদের দিয়েছেন। দিনাজপুরের রাজা তার ৮টি ভূমিখণ্ড এবং একটি পরগনা নিয়ে গঠিত জমিদারিটির 'শেষ অবস্থায়', সেটি পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মচারীবৃন্দকে বহাল রেখেছিলেন।[৯৮]

সারণি ঃ ৪ ৮টি ভূমিখণ্ড পরিচালনার জন্য দিনাজপুরের জমিদারের নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ

	বিঘা	টাকা
১ জন দেওয়ান যিনি সমগ্র জমিদারিটি দেখাশুনা করেন		১,২০০
৮ জন তহশিলদার বা সহকারী		২,৪০০
৪০ জন মুহুরি বা দলিল লেখক		৩,৮৪০
২৪ জন সিরদার বা পুরানো রক্ষীবাহিনীর কর্মচারী	১,২০০	
১৬ জন মির্ধা বা পুরানো রক্ষীবাহিনীর অধস্তন কর্মচারী	৪৮০	
২০০ জন পাইক বা নতুন রক্ষীবাহিনীর সেনা	৪,০০০	
৮ জন দফাদার বা নতুন রক্ষীবাহিনীর কর্মচারী		৩৮৪
২৪ জন বরকন্দাজ বা নতুন রক্ষীবাহিনীর সেনা		৮৬৪
২০০ জন কোতোয়াল বা সংবাদবাহক	২,০০০	
৫৩৭ জন	৭,৮৭২	৮,৬৮৮

উৎসঃ এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

এই ৮টি ভূখণ্ডের মোট ধার্য খাজনা ছিল ১১০,০০০ টাকা যা থেকে ভূমিরাজস্ব (৭৯,০০০ টাকা), কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ (৮৬৮৮ টাকা) এবং মোট খাজনার ৪ শতাংশ হারে ইজারাদারদের কমিশন (৪৪০০ টাকা), সবমিলিয়ে ৯২,০৮৮ টাকা বাদ দিতে হবে। অতএব জমিদারির নিট আয় ছিল ১৭,৯১২ টাকা বা মোট আয়ের ১৬.৩ শতাংশ।[৯৯]

সারণি ঃ ৫ একটি পরগনার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য দিনাজপুরের জমিদারের নিযুক্ত কর্মচারী

	বিঘা	টাকা
১ জন দেওয়ানের সহকারী		২৮০
১ জন জমানবিশ বা হিসাবরক্ষক		৩৬০
৭ জন মুহুরি		৪৮০
১ জন দফাদার		৪৮
৭ জন বরকন্দাজ		২৫২
৩ জন দফতরি বা নথিরক্ষক	৩৬	
৪ জন সিরদার	২০০	
১০০ জন পাইক	২,০০০	
১০০ জন কোতোয়াল	১,৫০০	
২৭৪ জন	৩,৭৩৬	১,৭৮০

উৎস ঃ সারণি ঃ ৪-এর অনুরূপ।

এই পরগনার অর্থনৈতিক গঠনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ[১০০]

মোট ধার্য খাজনা ছিল ৯৬,৫৮২ টাকা যা থেকে ভূমিরাজস্ব (৮১,৫৯১ টাকা), কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ (১,৭৮০ টাকা) এবং ইজারাদারদের কমিশন (৩৮৬৩ টাকা), সবমিলিয়ে ৮৭,২৩৪ টাকা বাদ দিতে হবে। অতএব এই পরগণা থেকে নিট আয় ছিল ৯,৭৫৬ টাকা বা মোট আয়ের ১০.১ শতাংশ ।[১০১]

অদিত চৌধুরী নামে একজন ব্যবসায়ী দেহট্ট পরগনায় একটি ছোট ভূমিখণ্ড ক্রয় করেছিলেন এবং সেটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত কর্মচারীবৃন্দ নিয়োগ করেছিলেন।[১০২]

সারণি ঃ ৬ অদিত চৌধুরীর নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ

	বিঘা	টাকা
১ জন তহশিলদার		১২০
১ জন জমানবিশ		৮৪
১ জন মুহুরি		৩৬
১ জন পোদ্দার বা কুসীদজীবী		২৪
২ জন বরকন্দাজ		৫১
১ জন সিরদার	২০	
১০ জন পাইক	১২০	
৭ জন কোতোয়াল	৫৬	
২৪ জন	১৯৬	৩১৫

উৎস ঃ সারণি ঃ ৩-এর অনুরূপ।

এই ভূখন্ডের মোট ধার্য খাজনা ছিল ৬,৩০০ টাকা যা থেকে ভূমিরাজস্ব (৪,৫০০ টাকা), কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ (৮৬৮৮ টাকা) এবং মোট খাজনার ৪ শতাংশ হারে ইজারাদারদের কমিশন (২৫২ টাকা), সবমিলিয়ে ৫,০৬৭ টাকা বাদ দিতে হবে। অতএব নিট আয় হিসাবে জমিদার-এর থাকত ১,২৩৩ টাকা বা মোট আয়ের ১৯.৬ শতাংশ।

দিনাজপুরের নতুন জমিদাররা এইভাবে তাঁদের জমিদারি পরিচালনা করতেন কখনও কখনও সরাসরি তাদের প্রতিনিধি আমলাদের মাধ্যমে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তাঁদের জমিদারিগুলি সম্পূর্ণত বা অংশত পাট্টা দিতেন ইজারাদারদের তিন থেকে নয় বছরের মেয়াদে। ইজারাদাররাও তাঁদের কমিশন হিসাবে পেতেন মোট খাজনার ৪ থেকে ৬ শতাংশ। যখন গোটা জমিদারিটি ইজারাদারদের পাট্টা দেওয়া হত তখনও জমিদার সেটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত রাখতেন এবং ইজারাদারবা নিজেদের খাজনা আদায়ে তাঁদের সাহায্য পেতেন। সাধারণত, কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন মণ্ডল বা গ্রামপ্রধান। আর গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারি এবং তারপর তা দেওয়া হত জমিদারের অধস্তন কর্মচারীদের বা ইজারাদারদের কাছে। গ্রামের হিসাবরক্ষক তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা গ্রামটি থেকে সংগৃহীত খাজনার ৩ শতাংশ পেতেন এবং গ্রামপ্রধান পেতেন ১ শতাংশ। নিম্নতর কর্মচারীরা অনেকেই তাদের পুরষ্কার হিসাবে পেতেন খাজনামুক্ত জমি।[১০৩]

সারণি ঃ ৩, ৪, এবং ৫ থেকে দেখা যায় যে পুলিশ আইন ('Regulation for the Police'.... ১৭৯২) পাশ হওয়া সত্ত্বেও নতুন জমিদাররা যথেষ্ট সংখ্যক আধা সামরিক কর্মচারী পোষণ করতেন, যদিও এই আইন তাদের সব পুলিশ কর্মচারীদের বরখাস্ত করার আদেশ করেছিল। এতদ্সত্ত্বেও, কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাসের প্রতি ঝোঁকটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পোষণ করা কর্মচারীদের

সঙ্গে নতুন জমিদারদের পোষণ করা কর্মচারীদের সংখ্যার তুলনা থেকে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।[১০৪]

নির্দিষ্ট হারে ধার্য রাজস্ব, জোরদার সরকারি সাহায্য এবং তাদের জমিদারির ক্রমবর্ধমান সম্পত্তির ফলেই মনে হয় নতুন জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। জমিদারিটি যদি কোনো জমিদার স্বয়ং পরিচালনা করতেন তবে তিনি তাঁর নিট লাভ হিসাবে মোট আয়ের ২০ শতাংশেরও বেশি আশা করতে পারতেন। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন সারণি ঃ ৫-এ দেখা যায়, যেখানে সরকারের ধার্য রাজস্বের চাহিদা অসমানুপাতিক হারে বেশি ছিল, সেখানে তিনি তাঁর নিট লাভ হিসাবে ১০ শতাংশও পেতেন না।

৫. বক্তব্যের উত্থান ঃ সমাপ্তির ভূমিকা

দিনাজপুর জমিদারির পতনের দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়াটির উৎস অনুসরণ করা যায় নবাব মীর কাশিমের শাসনকালে (১৭৬০ - ১৭৬৩) রাজনৈতিক অরাজকতার দিনগুলিতে। মুঘলদের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গী এই বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়া নিম্নস্তরের ক্ষমতার কাঠামোর উপরে না হয়ে পারেনি। বিভ্রান্তি ও পতন এইভাবেই 'পুরানো' জমিদারদের জমিদারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায় খাজনা আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত প্রথার অব্যবস্থায় এবং গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের দ্রুত উত্থানের মধ্যে।[১০৫] এছাড়াও, ১৭৬৫ সালে কোম্পানির কর্তৃত্ব গ্রহণ জমিদারদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোম্পানির সরকার তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিম্নলিখিত দুটি বিষয় মনে রেখেছিলেন, সে দুটি হল, গ্রামাঞ্চল থেকে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ সর্বাধিক করা এবং জমিদারদের বিশেষত বড় বড় জমিদার, যাঁরা তাঁদের কর্তৃত্বের পক্ষে ভীতিপ্রদ, সেইসব জমিদারের স্থানীয় ক্ষমতাকে দমনমূলক নিয়ন্ত্রণ। এই নীতিগুলির অনুসরণ স্বাভাবিকভাবেই জমিদারদের ক্ষমতার কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা গভীরতর করল এবং ফলে তাঁদের সম্পত্তিও হ্রাস পেল। যদিও, দিনাজপুর জমিদারির পতনের মুখে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপটি ছিল কর্ণওয়ালিশ-ব্যবস্থার প্রবর্তন, যার একটি অঙ্গ সুবিদিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দিনাজপুরে এটি বলপূর্বক কার্যকর করেন জি. হ্যাচ (হ্যাচ-এর সংশোধনী নীতি)। বস্তুত, দিনাজপুরের জমিদারের পক্ষে এর অর্থ দাঁড়ালো সরকারি চাহিদার আকস্মিক বৃদ্ধি, বাস্তবিকপক্ষে নিজের জমি এবং কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাহরণ এবং জেলার আমলা ও নিজের কর্মচারীদের জাজ্জ্বল্যমান কুকর্ম এবং অন্যায় আত্মসাৎকরণ। ফলে তিনি আর্থিক অসুবিধায় পড়েন এবং অপরিশোধিত ঋণের জটিলতায় আটকে যান। ১৭৯৭ সালে যখন কুসীদজীবীরাও তাঁকে ত্যাগ করল তখনই দেখা যায় তাঁর পতনের অনিবার্যতা। বিক্রির আইনের ফলে এই বিশাল জমিদারি দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সামগ্রিকভাবে কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থা একটি বড় ও পুরানো জমিদারির পতন এবং নতুন ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট জমিদারির উদ্ভব ঘটায়।

পুরানো জমিদারির ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থিত নবীন অভিজাত ভূম্যধিকারীদের

গঠন সম্পর্কে এ-পর্যন্ত অনেক মতামতই ব্যক্ত হয়েছে। কয়েকজন গবেষক এমনকি এতদূর পর্যন্ত বলার চেষ্টা করেছেন যে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পর্যন্ত গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোর গঠন ও চরিত্রে কোনওরকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।'[১০৬]

এই ধরনের মত টেঁকা কঠিন যদি আমরা ধরি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রায় এক দশকের মধ্যেই জমিগুলি যেগুলির রাজস্ব ছিল ১১,৭৬৭,২০০ টাকা, মূল্য হিসাবে বাংলার সমগ্র রাজস্বের প্রায় ৬২ শতাংশ,[১০৭] সেগুলি বিক্রি হয়ে যায় সরকারি নিলামে। আমাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে দিনাজপুরের একটি বড় ও পুরানো জমিদারি ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, যেগুলির ক্রেতারা বেশিরভাগই এসেছিলেন তিনটি সামাজিক বিভাগ থেকে ঃ প্রাক্তন জমিদারের কর্মচারী, সরকারি আমলা এবং ব্যবসায়ী। এটি লক্ষণীয় যে এই জমিদারিটির পতন ঘটানোর প্রধান উদ্যোক্তা তারাই ছিলেন। দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে এবং পরে জমিদারদের চরিত্রের পরিবর্তনটি বর্তমানে আমরা আলোচনা করব।

মুঘলদের অধীনে পুরানো জমিদাররা বিশেষ করে বড় বড় জমিদাররা পুরোপুরি সামরিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন[১০৮] এবং সরকারি কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারতেন। তাদের এলাকার মধ্যে বেশি বিচার ক্ষমতাও ভোগ করতেন তারা। কৃষকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে তারা খোলাখুলিভাবে দমনমূলক উপায় ব্যবহার করতেন এবং এই উদ্দেশ্যেই বিশাল আধা-সামরিক বাহিনী রাখতেন।[১০৯] পক্ষান্তরে কর্ণওয়ালিশ-ব্যবস্থার অধীনে 'নতুন' জমিদাররা তাদের সামরিক চরিত্র থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং সরকারের পক্ষে আর বিপদ বলে পরিগণিত হতেন না। তাঁরা অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে তাঁদের জমিদারিতে কোনরকম পুলিশি কর্মচারী রক্ষা করার এবং শাসন ও বিচার ক্ষমতার প্রয়োগ করার ব্যাপারেও নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। কর্ণওয়ালিশ-ব্যবস্থা এবং ভূমির-বাজারের উদ্ভব[১১০] হল নতুন উপাদান যেগুলির অভিজ্ঞতা 'পুরানো' জমিদারদের আগে হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে বিপুল পরিমাণে সরকারি ও বেসরকারি বিক্রি ঘটে ও সেইসঙ্গে উপরোক্ত উক্ত দুটি নতুন উপাদান মিলে 'নতুন' জমিদারদের জমিদারির প্রকৃতিতে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলির ব্যাখ্যা করে, যেকয়টি তার আভাস দিয়েছেন জে. ওয়েস্টল্যান্ড ঃ

> "এই জমিদারিগুলি তাদের প্রকৃতিতে পুরানো জমিদারিগুলি থেকে ভিন্ন; এগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট এবং গ্রামাঞ্চলব্যাপী একক জমিদারি নয় যেখানে তাদের মালিকেরা বড় জমিদার বলে প্রসিদ্ধ, বরং এগুলি বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন জমির সংকলন যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লব্ধ, বিভিন্ন ধরনের অধিকারাধীন এবং সারা অঞ্চলে ইতঃস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। জমিদারি, বাস্তবিকপক্ষে, পদমর্যাদা অপেক্ষা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্ণওয়ালিশ-ব্যবস্থা এইভাবে সাফল্যের সঙ্গে 'পুরানো' জমিদারদের, যারা প্রকৃতিতে অনেকটাই ছিলেন 'সামন্ত'-প্রভু, তাদের পরিণত করল 'নতুন' জমিদারে, যারা প্রকৃতিতে বেশিরভাগই ছিলেন অনুপস্থিত ভূম্যধিকারী ও ভূমি ব্যবসায়ী।"[১১১]

এখন যেহেতু নতুন জমিদাররা নতুন বিচার ব্যবস্থায় (স্থানীয় আদালত ও গ্রামীণ পুলিশি ব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণাধীন হলেন এবং খাজনা দিতে অক্ষম কৃষকদের উপরে শারীরিক

অত্যাচারমূলক শাস্তি খোলাখুলিভাবে প্রয়োগের অনুমতি হারালেন, সেহেতু তাঁদের নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার সাহায্য একান্তভাবেই আবশ্যিক হয়ে উঠল। ১৭৯৯ সালের 'হপ্তম' অর্থাৎ সপ্তম আইন পাশ করাই হয়েছিল তাঁদের খাজনা আদায় সহজতর করতে। এই উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয়ভাবে সফল হয় স্থানীয় আদালতের কর্তৃত্বে খাজনা দিতে অক্ষম কৃষকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রায় অবাধ ক্ষমতা জমিদারদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে। কৃষকদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটি জমিদারদের অবাধ স্বাধীনতা দেয় এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সার্থকভাবে সংযত রাখে পরবর্তী বহুবছরের জন্য।[১১২]

কোম্পানির সরকারের দফায় দফায় আইন পাশের ফলে যে কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল পুরানো জমিদারদের পতন ও নতুন জমিদারদের উত্থান।[১১৩] এই পরিবর্তনের সমাপ্তিলগ্নেই কোম্পানির সরকার সাফল্যের সঙ্গে সৃষ্টি করলেন একটি নতুন স্থিতিশীল কৃষিকাঠামো যেটি বাংলায় তাঁদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের উপযোগী হয়েছিল। নম্র এবং নিরীহ নতুন জমিদাররা, যাঁরা নিয়মিত পূরণ করলেন কোম্পানির অর্থনৈতিক চাহিদা, কোনরকম গুরুতর যন্ত্রণা না দিয়েই, তাঁরা বাংলার দেশ ও সমাজ শাসনে কোম্পানির দেশীয় কনিষ্ঠ অংশীদার বলেই বিবেচিত হতে পারেন। (২২ মে, ১৯৭৮)

[এই প্রবন্ধটি ১৯৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত 'উত্তরবঙ্গের কৃষি সমাজের গঠন, ১৭৬৫-১৮০০' — এই শিরোনামে আমার পি. এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধানত, প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে লেখা। আমি এই সুযোগে আমার গবেষণা নির্দেশক অধ্যাপক বি. বি. চৌধুরীকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁর সহৃদয় তত্ত্বাবধান এবং উৎসাহ দান আমাকে গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে।]

সংক্ষেপিত শব্দের একটি তালিকা প্রবন্ধের দেওয়া হল ঃ

সংক্ষিপ্ত শব্দসূচি

বি ডি আর - ডি এন আর	ঃ	বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস - দিনাজপুর, ২ খণ্ড।
বি আর - পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি বোর্ড অফ রেভিনিউ।
বি আর- এম-এসি-ডি এন আর	ঃ	মিসলেনিয়াস রেকর্ডস- বোর্ড অফ রেভিনিউ - এ্যাকাউন্ট সেল অফ স্টেটমেন্টস অফ ল্যাণ্ডস সোল্ড ফর এরিয়ারস অফ রেভিনিউ ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অফ দিনাজপুর।
বি আর - ডব্লিউ-পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি বোর্ড অফ রেভিনিউ - ওয়ার্ডস।
সি সি -পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি কমিটি অফ সারকিট।
সি সি আর - পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি কনট্রোলিং কমিটি অফ রেভিনিউ।
সি সি আর এম- পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি কনট্রোলিং কাউন্সিল অফ রেভিনিউ অ্যাক্ট মুর্শিদাবাদ।
সি আর - পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি কমিটি অফ রেভিনিউ।
জি জি সি- আর ডি- পি	ঃ	প্রসিডিংস অফ দি গর্ভনর জেনারেল ইন কাউন্সিল - রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

জে ডি - সি আর - পি : প্রসিডিংস অফ দি জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট - ক্রিমিনাল।
জে ডি- সি ভাই - পি : প্রসিডিংস অফ দি জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট - সিভিল।
পি সি আর -ডি এন আর - পি : প্রসিডিংস অফ দি প্রভিনসিয়াল কাউন্সিল অফ রেভিনিউ অ্যাক্ট দিনাজপুর।

সূত্র নির্দেশ

১ এই বিষয়গুলির উপরে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের প্রথম ভাগ (প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।
২ সি সি আর এম-পি, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৭০।
৩ তদেব, ২৯ জানুয়ারি ১৭৭১।
৪ সি সি আর এম-পি, ৭ মে ১৭৭১; সি সি আর এম-পি, ২ নভেম্বর ১৭৭১।
৫ সি সি আর এম-পি, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৭০।
৬ ডাক : পথিক ও পত্রবাহকগন।
পাইক : পদাতিক সৈনিক, নিম্নতর পুলিশ বা রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী।
৭ বরকন্দাজ : বন্দুকধারী।
পিওন : পেয়াদা, পুলিশের বা সামরিক কাজ করে এমন এক স্থানীয়বাহিনী।
৮ সি সি আর এম-পি, ৩১ ডিসেম্বর ১৭৭০।
৯ তদেব, ২৫ জুলাই ১৭৭১।
১০ তদেব।
১১ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১২ সি সি-পি, ২৬ জানুয়ারি ১৭৭৩।
১৩ বিশদ বিবরণের জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৪ বিশদ বিবরণের জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৫ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৬ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৭ সি আর - পি, ৪ ডিসেম্বর ১৭৮৩, নং ২০ - ২১।
১৮ তদেব, ১৪ নভেম্বর ১৭৮১।
১৯ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২০ বি ডি আর - ডি এন আর, খন্ড ১, ৬ নভেম্বর ১৭৮৬, নং ২২।
২১ 'হ্যাচ-এর সংশোধন নীতি'-র উপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার পি.এইচ. ডি.গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২২ বি আর-পি, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩, নং ৪৬-৫২; তদেব, ১ অক্টোবর ১৭৯৩, নং ১।
২৩ তদেব, ৩ জানুয়ারি ১৭৯৩, নং ৩৯-৪৮; বি আর ডব্লিউ-পি, ৩ জুন ১৭৯৪, নং ৬ - ৭
২৪ ডব্লিউ. আর. গুরলে, *এ কনট্রিবিউশন টুওয়ার্ডস এ হিস্ট্রি অফ দি পোলিশ ইন বেঙ্গল*, কলকাতা, ১৯১৬, পৃ. ২৯-৩০।
২৫ জে ডি - সি আর-পি, ১৮ অক্টোবব ১৭৯৩, নং ১৩-১৫।
২৬ সি সি আর এম - পি, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৭৯।
২৭ বি ডি আর - ডি এন আর, খন্ড ২, ১৬ জানুয়ারি ১৭৮২, নং ২৫৪; জে ডি-সি ভি-পি, ৫ জানুয়ারি ১৭৯৮, নং ১৯।
২৮ বি আর - পি, ৯ নভেম্বর ১৭৮৭, নং ১৭।
২৯ জি জি সি - আর ডি - পি, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৭৯০।
৩০ বি আর - পি, ২২ মার্চ ১৭৯০, নং ১৪; তদেব, ১২ মে ১৭৯৫, নং ৫১।

৩১ বি ডি আর - ডি এন আর, খণ্ড ২, ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৮, নং ২৭৭।

৩২ এই পরিভাষাটির অর্থ নির্ধারণ করা যায়নি।

৩৩ বি আর পি, ১১ এপ্রিল ১৭৮৮, নং ৫৮ (এনক্লোজার সি)।

৩৪ বিশদ বিবরণের জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং ষষ্ঠ অধ্যয়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৫ বি আর - পি, ২ জুলাই ১৭৯৯, নং ৮০।

৩৬ তদেব, ১১ নভেম্বর ১৮০০, নং ১৪।

৩৭ পি সি আর - ডি এন আর - পি, ১৩ জুন ১৭৭৫।

৩৮ বি ডি আর - ডি এন আর, খণ্ড ১, ১৬ ডিসেম্বর ১৭৮৯, নং ৪৯৬।

৩৯ তদেব।

৪০ সশস্ত্র রক্ষিদল বাহিত সরকারি টাকা মুর্শিদাবাদের পথে একদল ডাকাত কর্তৃক লুঠতরাজের ঘটনা বিরল ছিল না। বি আর - পি, ১৮ এপ্রিল ১৭৯৯, নং ৮-১০।

৪১ সি. সি. আর এম - পি, ২১ জানুয়ারি ১৭৭১, এল আর নং ২৫ এবং এল এস নং ৪৪।

৪২ বি ডি আর - ডি এন আর, খণ্ড ১, ৪ মে ১৭৮৬, নং ২।

৪৩ তদেব, খণ্ড ২, ১৫ জানুয়ারি ১৭৮৮, নং ২৭৭; বি আর-পি, ১৩ এপ্রিল ১৭৮৯, নং ৫০।

৪৪ খাজনা সংগ্রাহক জে. এলিয়ট, মন্তব্য করেন ঃ 'ইদানিং রাজার কাজে এত অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মজুরী ও ভাতা রাজার বাড়তি সম্পদের প্রায় সম্পূর্ণটাই শোষণ করে নেবে।'
বি আর - ডব্লিউ - পি, ৩০ মে ১৭৯৪, নং ৭; এবং রাজস্ব পরিষদকে প্রেরিত রাজার আবেদন পত্রটিও, বি আর- ডব্লিউ -পি, ২৫ এপ্রিল ১৭৯৪, নং ৬।

৪৫ বি আর - পি, ৩০ জানুয়ারি ১৭৮৭, নং ৩৭ - ৪০।

৪৬ তদেব, ৫ অগাস্ট ১৭৮৮।

৪৭ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪৮ বি আর - পি, ২৮ মার্চ ১৮০০, নং ১১-১২।

৪৯ তদেব, ১০ অগাস্ট ১৭৯৮, নং ৩৬।

৫০ সিরাজুল ইসলাম, "চেনজেস ইন ল্যাণ্ড কন্ট্রোল ইন বেঙ্গল আণ্ডার দি আর্লি অপারেশন অব দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট", *জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ*, খণ্ড ১৭, নং ৩, ১৯৭২, পৃ. ২৪, তালিকা - ১

৫১ বি বি চৌধুরী, "ল্যাণ্ড মার্কেট ইন ইর্স্টান ইন্ডিয়া, ১৭৯৩ - ১৯৪০ অধ্যয় ১ ঃ দি মুভমেন্ট অব ল্যাণ্ড প্রাইসেস", *দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাণ্ড সোসাল হিস্ট্রি রিভিউ*, খণ্ড ১২ - ১, ১৯৭৫, পৃ. ১১।

৫২ বি আর-পি, ৭ জুলাই ১৭৯৭, নং ২৪।

৫৩ তদেব, ১ অগাস্ট ১৭৯৭, নং ৩৬; তদেব, ১৫ অগাস্ট ১৭৯৭, নং ৫৮এ।

৫৪ তদেব, ২৩ মার্চ, ১৭৯৮, নং ৪৩ ও ৪৭।

৫৫ তদেব, ১৩ মার্চ ১৭৯৮. নং ২৩; তদেব, ২৪ এপ্রিল ১৭৯৮, নং ২৫।

৫৬ তদেব, ১১ মে ১৭৯৮, নং ৩৫; বি আর-এম -এসি - ডি এন আর।

৫৭ বি আর - পি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৯৯, নং ২৬ ও ৩৬।

৫৮ তদেব, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮০১, নং ৭।

৫৯ বি আর- এম - এসি-ডি এন আর।

৬০ তদেব, একটি বিক্রির হিসাব - তারিখ ২ জুলাই ১৭৯৮।

৬১ বি আর-পি, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫, নং ১-৩।

৬২ তদেব, ৩১ জুলাই ১৮০১, নং ১০।

৬৩ তদেব, ১৯ জুন ১৮০১, নং ৩০।

৬৪ তদেব, ৮ অগাস্ট ১৮০১, নং ৩১।

৬৫ ১৭৯৩ সালের দ্বিতীয় আইনের পঞ্চদশ ধারায়, "দেশী কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী ও কালেক্টরদের উপরে নির্ভরকারী এবং তাদের সহকারীরা সকলেই নিষিদ্ধ সরকারি নিলামে কালেক্টর-এর বিলিবন্দেজ ক্রয় নিষিদ্ধ করা কোনো জমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় ক্রয় করতে, শাস্তিস্বরূপ ঐ জমি বাজেয়াপ্ত করবে সরকার ....," বি আপ - পি, ২০ জুন ১৮০০, নং ১২।

৬৬ বি আর- পি, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫, নং ১-৩।

৬৭ তদেব, ৪ নভেম্বর ১৮০০, নং ২৪।

৬৮ তদেব, ২৭ নভেম্বর ১৭৯৮, নং ২৪।

৬৯ তদেব, ৪ নভেম্বর ১৮০০, নং ২৪।

৭০ তদেব, ১১ নভেম্বর ১৮০০, নং ১৪।

৭১ জে ডি - সি ভি -পি, ২৯ মে ১৭৯৫, নং ১৩-১৫।

৭২ এফ. বুকানন, *এ জিওগ্রাফিকাল স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাণ্ড হিস্টোরিকাল ডেসক্রিপশন অফ দি ডিস্ট্রিকট অর জিলা অফ দিনাজপুর ইন দি প্রভিন্স অফ সুবাহ্ অফ বেঙ্গল*, ১৮৩৩, পৃ. ৩১৭।

৭৩ বি আর-পি, ৩ জানুয়ারি ১৮০৬, নং ৮।

৭৪ তদেব, ২৩ ডিসেম্বর ১৮০০, নং ২৫।

৭৫ জে ডি-সি ভি-পি, ২৯ মে ১৭৯৫ নং ১৪; এফ ও বেল, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যাণ্ড সেটলমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিকট অফ দিনাজপুর*, ১৯৩৪-১৯৪০, ১৯৪২, পৃ. ৭৪।

৭৬ বি ডি আর- ডি এন আর, খণ্ড ২, ১৬ এপ্রিল ১৭৮৭, নং ১৩৪; বি আর - ডব্লিউ-পি, ২৫ জুলাই ১৭৯৪, নং ১।

৭৭ জি. হ্যাচ এবং রামকান্ত রায় কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরগনার কর্মচারী।

৭৮ কালেক্টরেটে পার্শী ও হিন্দুস্থানী ভাষার অনুবাদক বা দোভাষী।

৭৯ মাদক পানীয় দ্রব্যের প্রস্তুতকারীগণের ও বিক্রেতাগণের কাছ থেকে তাদের দেয় আদায়কারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন লিপিকার।

৮০ বিক্রির হিসাবপত্রে তিনজন ব্যক্তির পদবী জোরালোভাবে ইঙ্গিত দেয় যে তারা ব্যবসায়ী সমাজভুক্ত ছিলেন। তারা হলেন গিরধর সাহা, তত্বি দালাল এবং রামদালাল এবং তাদের মোট জমির সংখ্যা ৫.৫, মোট রাজস্বের পরিমান ২৭,৫৩১ টাকা এবং মোট ক্রয়মূল্য হল ২৩,৪৪৫ টাকা। আমরা অবশ্য তাদের এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি, যেহেতু এই অনুমান দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার মত আমাদের কোন প্রামাণিক তথ্য নেই।

৮১ বি ডি আর- ডি এন আর, খণ্ড ২, ১৬ জুন ১৭৮৭, নং ১৪৯।

৮২ বি আর -পি, ৩ জানুয়ারি, ১৭৯৪,নং ৪২ (দিনাজপুরের জমিদারের পেশ করা একটি আবেদন-পত্র)।

৮৩ এফ ও বেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৮৪ বি পি-পি, ৪ নভেম্বর ১৮০০, নং ২৪; তদেব, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫, নং ১-৩; রাজা রামমোহন রায়, "অন দি সিসটেম অফ ইণ্ডিয়া", *দি ইংলিশ ওয়ার্কস অফ রাজা রামমোহন রায়*, ভাগ ৩, ১৯৪৭, পৃ. ৪৪, উত্তর ২৬ এবং ২৭।

৮৫ বি আর-পি,১১ অক্টোবর ১৭৯৯, নং ১৮; তদেব, ১৭ এপ্রিল ১৮০১, নং ৩।

৮৬ তদেব, ৬ নভেম্বর ১৮০৪, নং ১৬।

৮৭ তদেব, ৪ নভেম্বর ১৮০০, নং ২৩-২৭; তদেব, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮০১, নং ২; তদেব, ১২ জুন ১৮০১, নং ৪৬।

৮৮ তদেব, ৩০ জানুয়ারি ১৮০১, নং ২৬; তদেব, ১৪ অগাস্ট ১৮০৪, নং ২০।

৮৯ তদেব, ৭ নভেম্বর ১৮০০, নং ২৪; এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

৯০ বি আর-পি, ১ মে ১৮০৪, নং ৩৯।

৯১ তদেব, ৭ অগাস্ট ১৮০৪, নং ১৬-১৭।

৯২ বি আর - এম - এ সি - ডি এন আর।

৯৩ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল*, খণ্ড ৭, পুর্নমুদ্রন ১৯৭৪, পৃ. ৪১৫, ৪২২।

৯৪ এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৯৫ তদেব, পৃ. ২৪০।

৯৬ বি আর-পি, ১০ ডিসেম্বর ১৮০৫, নং ১-৩; তদেব, ৩ জানুয়ারি ১৮০৬, নং ৬-৯।

৯৭ এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৯৮ এটি মনে হয় যে ১৮০১ সালে অল্পবয়স্ক জমিদারের মৃত্যুর পর রাণী সরস্বতী এবং রামকান্ত রায় একটি সমঝোতা করেন। রাণী একজন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন খুব সম্ভবত যিনি ছিলেন রামকান্ত রায়ের একজন নিকট আত্মীয়। পরিবর্তে রামকান্ত রায় তার ক্রীত ভূখণ্ড এই নতুন জমিদারকে দেন এবং নিজে সেই জমিদারির দেওয়ান হন। এই ৮টি ভূমিখণ্ড এবং একটি পরগনার প্রধান অংশ যা আমরা বর্তমানে দেখি তা নিশ্চয় আসলে রামকান্ত রায়েরই কেনা। এতদসত্ত্বেও এই বিষয়টি প্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে পুরোপুরি যাচাই করা যায়নি। এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৮ দ্রষ্টব্য।

৯৯ এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮। তিনি বলেছেন এই ৮টি ভূমিখণ্ড মূলত রাণী সরস্বতীর কেনা। কিন্তু আমাদের তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে তার ক্রয়ের পরিমাণ এত বেশি হতে পারে না।

১০০ বুকানন লিখেছেন যে এই পরগনাটি 'বিক্রি হয়নি' কিন্তু এটি অন্যান্য ঐতিহাসিক দলিলের বিরোধী যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিষয়ে ৯৮ নম্বর পাদটীকায় পুরোপুবি দলিলভিত্তিক না হইলেও আমার মতটি দ্রষ্টব্য।

১০১ এফ. বুকানন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

১০২ তদেব, পৃ. ২৪৮।

১০৩ তদেব, পৃ. ২৫০-২৫২।

১০৪ নিম্নলিখিত মোটামুটি হিসাবটি থেকে দেখা যায় ঃ
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে দিনাজপুর জমিদারির মোট আনুমানিক আয় এবং সবধরনের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৭৫০,০০০ টাকা এবং ২০,০৪৯ জন বা ৮৭ টাকা মোট আয় প্রতি একজন করে, যেখানে উপরের তিনটি উদাহরণেই (সারণি ঃ ৩,৪,৫) সেগুলি ছিল মোট ২১২,৮৮২ টাকা এবং ৮৩৫ জন বা ২৫৬ টাকার মোট আয় প্রতি একজন। অতএব, নতুন জমিদারদের কর্মচারীদের সংখ্যা পুরানো জমিদারের কর্মচারী সংখ্যার অর্ধেকেরও অনেক কম ছিল।

১০৫ এই বিষয়গুলি উপরে বিস্তৃত আলোচনা এবং বিশদ বিবরণের জন্য আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০৬ সি পালিত, *টেনশনস ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি*, ১৯৭৫, পৃ. ১৫-১৬।

১০৭ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, সারণি ঃ ১।

১০৮ গুলাম হুসেন, *সিয়ার মুতাখেরিন*, ১৯০২, পরিচ্ছেদ ১৪, পৃ. ১৭৬, ১৭৭, ২০৪; জে. লং, *সিলেকশনস ফ্রম আনপাবলিশড় রেকর্ডস অফ গভর্ণমেন্ট ফর দি ইয়ার্স* ১৭৪৮ *টু* ১৭৬৭ ইত্যাদি, ১৮৬৯, নং ৫০৪।

১০৯ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১১০ বি. বি. চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ৩ এবং ৪।

১১১ *জে ওয়েস্টল্যাণ্ড, এ রিপোর্ট অফ দি ডিস্ট্রিকট অফ যেশোর ঃ ইটস অ্যান্টিকুইটিস, ইটস হিস্ট্রি অ্যাণ্ড ইটস কমার্স*, দ্বিতীয় মুদ্রন, ১৮৭৪, পৃ. ১৪৩।

১১২ আমার পি.এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১৩ এই পরিবর্তনের মানে, যদিও, এই নয় যে 'পুরানো' জমিদারির মালিকরা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন। মনে হয় বেশ কয়েকজন 'পুরানো' জমিদার ছিলেন যারা সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের পরিবর্তন করে 'নতুন' জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন।

অনুবাদ ঃ শ্রীলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

২

জমিদারি প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ঃ বাংলার কৃষি সমাজের পরিবর্তন (১৮৮৫ - ১৯০২)

আকিনবু কাওয়াই

বাংলার জমিদার ১৮৮৫ - ১৯৪০ ঃ বর্ধমান রাজ

১. প্রথম পর্ব ঃ জমিদারদের দমনমূলক ক্ষমতার পরিবর্তন ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের প্রথম ব্যবস্থাপনা ১৮৮৫ - ১৯০২

১.১ বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত ও বিকাশের গতি প্রকৃতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের কাঠামো ও সংগঠনে যে বিশেষ পরিবর্তন আনে তা হল, বৃহৎ যৌথ পরিবারগুলির বিভাজন ও নতুন ছোট ছোট পরিবারের অভ্যুদয়।[১] এইরকম আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলির মধ্যে সব থেকে ক্ষমতাশালী ছিল বর্ধমান রাজপরিবার, সামরিক ও অসামরিক ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই।[২] সরকারি সূত্রে ১৭৯০-এ জমির আয়তন অনুপাতে রাজস্বের পরিমাণ অনুযায়ী এরকম বারটি অতি ক্ষমতাশালী পরিবারকে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। নিলাম আইনের ধারায় এই পরিবারগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ধমান রাজের ব্যাপারটি বিশিষ্ট, কারণ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে তারা সক্ষম হয়েছিলেন। এই পরিবার স্বকীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সফল হয়।[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাধারণত জমিদারদের ঐতিহ্যগত ক্ষমতার বিনিময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংহতি সাধনের প্রক্রিয়াটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকেই চালু হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে সামরিক শক্তিই বর্ধমান রাজপরিবারকে তার শাসনাধীন এলাকার বিস্তৃতি এবং 'ভূ-সম্পত্তি'-র নিয়ন্ত্রণে সমর্থ করেছিল। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কয়েকবছর ব্রিটিশ প্রশাসনের সংহতিকরণ প্রক্রিয়া এই রাজপরিবারের খাজনা আদায়ের ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে ক্ষুন্ন করতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিশেষত, পুলিশ ও বিচার বিভাগ বর্ধমান রাজপরিবারকে কেন প্রভাবিত করতে পারেনি তার সদুত্তর ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংহতিকরণ প্রক্রিয়া সত্বেও বর্ধমান রাজপরিবারের প্রকৃতি ও বিস্তৃতির অলোচনার পটভূমিতে পেতে পারি।[৪]

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বপর্যায়ে বা তার সূচনাকালে বর্ধমান রাজপরিবারের বিকাশ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে মুঘল আমলে এই পরিবারের বিকাশের উৎস কী ছিল

এবং ব্রিটিশ আমলের সূচনাপর্বে বর্ধমান রাজ কিরকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল।

লাহোরের কাতলি অঞ্চলের আবু রায় ছিলেন বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতে ছিলেন ক্ষত্রিয়।[৫] ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুঘল দরবার থেকে বর্ধমান শহরের রেকাবী বাজারের 'চৌধুরী' এবং 'কোতয়াল' হিসাবে নিযুক্ত হন। বর্ধমান তখন ছিল চাকলা বর্ধমানের ফৌজদারের অধীন। তাঁর পুত্র বাবু রায় বর্ধমান পরগনাসহ অন্য আরও তিনটি তালুক-এর অধিকারী হওয়া ছাড়াও 'চৌধুরী' উপাধিটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। তাঁদের পরিবারের আদিভূমি বৈকুণ্ঠপুর ত্যাগ করে তিনি বর্ধমানে আসেন। বাবু রায়-এর পর আসেন তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম রায়। ঘনশ্যাম রায়-এর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় নতুন জমিদারির স্বত্ব অর্জন করেন এবং ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব-এর কাছ থেকে এক ফরমান পান। এই ফরমানে তাঁকে বর্ধমান পরগণার 'জমিদার' ও 'চৌধুরী' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর জগতরাম রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে আসেন কীর্তি চাঁদ যিনি বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তির সাথে আরও নতুন পরগনা যুক্ত করেন। কীর্তি চাঁদ ফতেপুরসহ বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের আরও অঞ্চল অধিগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি চন্দ্রকোনা ও বর্ধ (হুগলি জেলার তারকেশ্বরের নিকট) রাজপরিবারগুলির কিছু তালুকসহ হুগলির বলঘ্র রাজপরিবারের বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তিও অধিগ্রহণ করেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে কীর্তি চাঁদের মৃত্যুর পর উত্তরসূরী হিসাবে আসেন তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায়। তিনি জন্মসূত্রে পাওয়া তালুকগুলিতে মণ্ডলগড়, চন্দ্রকোনার মত পরগনাগুলি যুক্ত করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ প্রদত্ত ফরমানবলে তিনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে চিত্রসেন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান ও তার মৃত্যুর পর উত্তরসূরী হিসাবে আসেন দত্তকপুত্র (তারই) তিলক চাঁদ। এই দত্তকপুত্র গ্রহণের ঘটনার পর বর্ধমান রাজ আইন চালু করেন যে, রাজের সম্পত্তি মালিকদের কোনো সন্তানদের মধ্যে বিভাজন করা যাবে না। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তিলক চাঁদের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে আসেন তেজচাঁদ রাই। তার সময়কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বর্ধমান রাজ-তালুকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) প্রবর্তন।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির রাজস্বনীতির ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য স্থানের জমিদারি ব্যবস্থা প্রভাবিত হলেও, বর্ধমান রাজপরিবারে তার কোনো লক্ষ্যণীয় প্রভাব পড়েনি। বরং ১৭৬৯-৭০-এর দুর্ভিক্ষে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানি প্রণীত 'চাষাবাদ রাজস্ব' ব্যবস্থার বিভিন্ন বিধি বর্ধমান রাজপরিবারের গ্রামীণ ক্ষমতার ভিত্তিভূমিকে অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ এই 'চাষাবাদ' ব্যবস্থার চড়া খাজনা সরকারের মূল উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। সম্ভবত এই নীতির সাফল্য বর্ধমান রাজার কর্তৃত্বকে অনেকটাই শিথিল করতে পারত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার অব্যবহিত পরই বর্ধমান রাজপরিবার কোম্পানির নিকট তার প্রদেয় রাজস্ব মেটাতে ব্যর্থ হয়। রাজপরিবারের এই ব্যর্থতার কারণ ছিল কিছু অস্থায়ী ইজারাদারদের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ জমি ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এই ইজারাদাররা পরবর্তীকালে ভুয়ো বলে প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের দেয় রাজস্বের অর্থ তারা রাজপরিবারকে না দিয়ে নিজেরাই কুক্ষিগত করে রাখে। ফলস্বরূপ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির রাজস্ব পর্ষদ বর্ধমান রাজ-তালুকের

কিছু অংশ নিলামে বিক্রি করে দেয়। মহারাণী বিষ্ণু কুমারীর মৃত্যুর পর মহারাজা তেজচাঁদ বর্ধমান রাজতালুক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজপরিবারের পতনের গতি রুদ্ধ করার জন্য তিনি অস্থায়ী ইজারার জমিগুলিকে চিরস্থায়ী ইজারা (বা পত্তনির) আওতায় আনেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের পত্তনিবিধি অনুযায়ী তিনি এই ইজারাকে বৈধতা দান করেন।[৬]

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তেজচাঁদ মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকারী হিসাবে আসেন তার দত্তক পুত্র মহতাব চাঁদ। অবিলম্বেই তিনি ভারতের তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অভিধায় স্বীকৃত হন। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান ও তার উত্তরাধিকারী আসেন তার দত্তক পুত্র আফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুর। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ তিনিও মারা যান ও বর্ধমান রাজতালুকের দায়িত্ব কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে চলে আসে।

বর্ধমান রাজ-এর বিকাশ ঘটেছিল এক সুনির্দিষ্ট পথে। প্রথম শুরু ছিল ছোটভাবে, পরে এই রাজপরিবার স্বকীয় সম্পদ বৃদ্ধির যাবতীয় সুযোগ কাজে লাগাল। অনেক তালুকই বাস্তবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দখল করা হয়েছিল। মুঘল দরবার শেষ পর্যন্ত এই দখলের ঘটনাগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা দেন। এই ধারা ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাশালী বর্ধমান রাজপরিবার ও মুঘল দরবারের মধ্যেকার নিবিড় সম্পর্ক পরিস্ফুট করে তুলেছে। অযোধ্যার তালুকদারেরা যখন তালুক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসাবে গ্রামীণ সমাজে নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগাতেন[৭] বর্ধমান রাজপরিবার তালুক নিয়ন্ত্রণের জন্য মোটামুটিভাবে অস্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন। অধ্যাপক এন. কে. সিন্‌হা[৮] দেখিয়েছেন, স্থানীয় সমাজে বর্ধমান রাজপরিবারের কোনো সামাজিক ভিত্তিভূমি না থাকলেও ভূ-স্বত্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এদের ক্ষমতা ছিল অসীম। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজপথে ডাকাতি রোধ, অপরাধীদের শাস্তিদান ইত্যাদি ক্ষমতা মুঘল দরবার বর্ধমান রাজপরিবারকে অর্পণ করেছিল। বর্ধমান রাজপরিবার এই দায়িত্ব পালনের জন্য সামরিক শক্তির উপরই নির্ভর করতেন। মুঘল দরবার এই বর্ধমান রাজপরিবারকে সামরিক শক্তি গঠনকার্যে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল দরবার কর্তৃক প্রদত্ত এক ফরমান বর্ধমানের রাজাকে '৫,০০০ পদাতিক ও ৩,০০০ অশ্বারোহীবাহিনীর সেনাধ্যক্ষের' উপাধি দান করেন।[৯]

সামরিকবাহিনীর ভরণপোষণ করা হত পরিষেবামূলক জমির আয় থেকে। বর্ধমান রাজপরিবার নগদ অর্থ দিয়ে এক বিশাল সৈন্যগৃহ (নাগদিন) তৈরি করেছিল। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে এই নগদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩,০০০ টাকায়।[১০] তবে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব ইংরেজদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। বর্ধমান জেলার 'শান্তি শৃঙ্খলা' ব্যবস্থা সরাসরি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করে।[১১] এই পুলিশি ব্যবস্থা প্রচলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বর্ধমান রাজপরিবারের ব্যয়ভার ৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়।[১২] কোর্ট অব ওয়ার্ডের উদ্যোগে জমি জরিপ ও রাজস্ব ধার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার সময়কালে চৌকিদারি (গ্রামপ্রহরী) এবং ঘাটোয়ালি (নদী পারাপারের রক্ষক) স্বত্বের প্রচলন হয়। এইভাবে মাত্র এক বছর সময়কালে (১৮৯৭-৯৮) ৩৩,৬১৯ একর জমি পুনরায় অধিগৃহীত হয়।[১৩]

ইংরেজরা বর্ধমান রাজপরিবারের সংগঠিত সামরিক শক্তিকে বহুলাংশেই ভেঙ্গে দিয়েছিল। যদিও 'বেসামরিকীকরণ'-এর এই প্রক্রিয়া[১৪] বর্ধমান রাজপরিবারের খাজনা আদায়ের ক্ষমতা খর্ব করতে পারেনি। বকেয়া খাজনা আদায়, পত্তনিদারের বিরুদ্ধে মামলা বা বকেয়া খাজনা সংগ্রহের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ধমান রাজপরিবার একটি শক্তিশালি আইনি বিভাগ গঠন করেছিল। জমিদারি ব্যবস্থার কাঠামোকে এইভাবে ধীরে ধীরে প্রয়োজনমুখী করে তোলা হয়। বর্ধমান রাজপরিবারের কর্মকান্ড ক্রমশ সামরিক শক্তির পরিবর্তে আইনবিদদের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে। এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত পর্যালোচনার দরকার। তবে প্রথমে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংহতিকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করব।

২. কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃক বর্ধমান রাজপরিবারের ক্ষমতা অধিগ্রহণের পটভূমি

২.১ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের রাজস্ব নীতির বিবরণ

এ. ইয়াং তাঁর ঊনবিংশ শতকে বিহারের স্থানীয় সমাজ সংক্রান্ত গবেষণায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের কাজকর্ম সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

> "সহযোগীগোষ্ঠী / মিত্রপক্ষের স্বার্থরক্ষায় সরকারি প্রয়াসই সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে বিহারের বড় বড় ভূস্বামীদের কোর্ট অব ওয়ার্ডের ছত্রছায়ায় থাকার কারণ। তালুকগুলিতে সরকারি হস্তক্ষেপের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়েই প্রতিভাত হয় যে কোর্ট অব ওয়ার্ডও ছিল ইংরেজদের সহযোগীগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করার অপর আর এক পদ্ধতি। যতদিন পর্যন্ত সরকার ও তার ওয়ার্ডগুলির মধ্যে কোনো স্বার্থসংঘাত ছিল না ততদিন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ছিল জটিল এবং সরকারি ব্যবস্থাপনা মূলত জমিদারির সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যেই পরিচালিত হত।"[১৫]

ইয়াং কোর্ট অব ওয়ার্ডের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন ঃ (১) কোম্পানির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমিদারদের সুরক্ষা, এবং (২) জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ। ইয়াং তাঁর আলোচনায় এই সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে জমিদারি তালুকগুলি অধিগ্রহণে তৎপর ছিল। ব্রিটিশরা এই উদ্দেশ্যে বহুলাংশে সফল হয়েছিল। হয় সরাসরিভাবে তারা জমিদারি পরিচালনা করত, না হয় পরোক্ষভাবে জমি ইজারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং জমি ইজারার 'সুষ্ঠু পরিচালনার' উদাহরণ হিসাবে তালুকগুলি বিবেচিত হবে এই অছিলায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের মাধ্যমে তালুকগুলি পরিচালনা করতেন।[১৬] সর্বোপরি, তালুক পরিচালনার অভিজ্ঞতার সূত্রে ব্রিটিশ সরকার বোঝেন যে জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সুস্পষ্ট নীতি ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করা দরকার। বলাই বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য জনহিতৈষীমূলক ছিল না। ভূমি রাজস্বের নিশ্চয়তা নির্ভর করত রায়তদের বৈভবের উপর, এই বৈভব আবার নির্ভর করত ভূ-স্বত্বের সুরক্ষার উপর।[১৭] ১৮৭০-এর দশকে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল[১৮] ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্বকে সদর মহকুমা স্তর পর্যন্ত প্রসারে

উদ্যোগী হয়েছিলেন।[১৯] ১৮৮১-৮২ সালের বাৎসরিক বিবরণে এই বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছেঃ

> "রায়তদের শ্রীবৃদ্ধির মূল অবলম্বন ছিল ভূ-স্বত্বের সুরক্ষা, লেফটেন্যান্ট গভর্নর খুশি যে কোর্ট অব ওয়ার্ড এইসব অধিকার ক্ষুন্ন না করে ন্যায়বিচার ও স্বত্বাধিকার বজায় রেখেছেন .... দেশের আইন ও রীতি রায়তদের যেসব অধিকার দিয়েছে জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় সরকার তা খর্ব করবে এমন কোনোও কারণ নেই। দেশের আইন ও রীতির ভিত্তি ছিল দুই পক্ষকে সুবিধাদানের নীতি। লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই নীতির ব্যাপারে একমত ও তিনি চান এটাই ঠিকভাবে অনুসৃত হোক। এই নীতি অনুসারে ন্যায্য ও একই হারে খাজনা নির্ধারণ করা উচিত সব ম্যানেজারের। ভারত সরকারের মতে এই নীতি কার্যকরীর সবচেয়ে ভাল উপায় হল যথাযথ ক্ষেত্র সমীক্ষার সাথে স্বত্ব নথিভুক্ত করা এবং লে. গভর্নর এ ব্যাপারে একমত।"[২০]

সরকারকে 'জমি জরিপ ও ক্ষেত্র সমীক্ষা'র ব্যবস্থা গ্রহণে ও জমিদারি তালুকের অন্তর্গত জমিস্বত্বের নথিভুক্তি করায় বৈধতা দানের মধ্যে ১৮৮৫ সালে প্রণীত বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট / বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনের তাৎপর্য আংশিকভাবে নিহিত ছিল।[২১] মূলত যে চারটি পর্যায়ে এই আইন কার্যকরী হয়েছিল সেগুলি হল[২২] যথাক্রমে ঃ (১) ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং জমির মানচিত্র তৈরি, (২) ভূ-স্বত্বের নথিভুক্তি, (৩) রায়ত কর্তৃক দেয় খাজনার নির্ধারণ, (৪) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই ক্ষেত্র সমীক্ষা ও জমি জরিপ ব্যবস্থাদি সরকারকে খাজনা সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদিতেও হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ করেছিল।

১৮৮৫ সালের আইনের আগে ব্রিটিশ সরকারের খাসমহল জমি বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের আওতায় যেসমস্ত তালুকগুলি ছিল সেগুলির জরিপ ও সমীক্ষার ব্যবস্থা, স্বল্প মাত্রায় হলেও প্রযোজ্য হত।[২৩] বিশ্বাসযোগ্য কৃষি পরিসংখ্যান ও ভূমি বা খাজনার সঠিক হিসাব সংগ্রহের জন্য সরকারি তত্ত্বাবধানে সরকারি তালুকে অথবা বাতিল করা জমিদারি তালুকে এই জমি জরিপ ও সমীক্ষার কার্যাদি সম্পন্ন হত। রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁদের তালুক পরিচালনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছিলেন যে জমি জরিপ সংক্রান্ত মানচিত্র ও ভূমিস্বত্বের নথিভুক্তিকরণের তথ্যপঞ্জি ছাড়া জমিদারি পরিচালনা ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা অসম্ভব। বলাই বাহুল্য যে, এইসব তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল 'সুষ্ঠু পরিচালনার' অপরিহার্য অঙ্গ।[২৪]

এখন প্রশ্ন হল 'সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' বলতে সেই সময়ে কী বোঝানো হত? জমি জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা অনাদায়ী বিপুল বকেয়া খাজনার পরিমাণ কমিয়ে এনেছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অনুরূপ কোনো পরিস্থিতি ছাড়াই রাজস্ব আধিকারিকেরা বকেয়া খাজনার পরিমাণ কমালেন। এর মূল কারণ ছিল জমিদারদের উচ্চ-হারে রাজস্ব আরোপ ও রাজস্ব সংগ্রহের প্রবণতার বিরোধিতা করা। বলা বাহুল্য যে জমির জরিপ ও অন্যান্য সমীক্ষার মাধ্যমেই রাজস্ব-কর্মীরা এই দুষ্টক্ষত-মূল চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বেঙ্গল টেনান্সি বিল / বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনের খসড়ায় বলবৎযোগ্য হওয়ার আগে প্রকাশিত ১৮৮৩-৮৪ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে তৎকালীন কৃষি সম্পর্কগুলিতে এরকম অসন্তোষের আভাস রয়েছে অনেক জায়গায়। এবং রাজস্ব বিভাগের

কর্মকর্তারা বুঝেছিলেন যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি জরিপ ও সমীক্ষা প্রক্রিয়া প্রচলনের মধ্যে দিয়েই এই অসন্তোষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে ও তার সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, এককথায় তালুকগুলির 'সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' সম্ভবপর হতে পারে।[২৫] এখন দেখা যাক, ১৮৮৩-৮৪ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে তালুকগুলির 'সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা' সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ঃ

"খাজনা সংক্রান্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের পূর্বে সতর্কতাসহ পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা মোটামুটি স্বীকৃত ছিল। গতবছর লেফটেন্যান্ট গভর্নর মন্তব্য করেন যে, আমাদের ভুললে চলবে না যে অনাদায়ী বকেয়া টাকা বা অত্যাধিক হারে নির্ধারিত খাজনা উভয়ই রায়তের দুরাবস্থার কারণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ খাজনা ব্যবস্থার পরিবর্তে এই অত্যাধিক খাজনা ও তজ্জনিত সৃষ্ট বিপুল পরিমাণ বকেয়া রায়তকে নিকৃষ্ট খাজনা-প্রদায়ী-রায়তে পরিণত করে। সুতরাং রাজস্ব পর্ষদের উচিত ১৫টি ওয়ার্ডের তালুকগুলিতে যেখানে যতটা সম্ভব, জমি জরিপ সমীক্ষা ও জমি স্বত্বের নথিভুক্তিকরণের নীতি অবলম্বন করে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়া যখন আইনে পরিণত হবে তখন এই সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে। রায়তের খাজনা প্রদানের ক্ষমতা ও তাঁদের স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত যে খাজনা ব্যবস্থা তাই হল সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রিত খাজনা ব্যবস্থার পরিচায়ক। বিহার এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার জমিদারির বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি (যা অন্যান্য পাশ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারিগুলির ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে) যে খাজনার পরিমাণ এতই বেশি যে তা-আদায় করা সম্ভব শুধুমাত্র জমিদারদের চরম উন্নতির সময়কালে। যদিও রাজস্ব পর্ষদ এমতবস্থাতেও প্রমাণপত্র, পদ্ধতির আওতায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাদিও নিতে পারত। যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডের সার্টিফিকেট / প্রমাণপত্র পদ্ধতির সহযোগেও তার অধীনস্থ জমিদারদের কাছ থেকে চলতি বছরের খাজনার সাধারণত নব্বই শতাংশ বা তারও অধিক বকেয়া খাজনা আদায়ই করতে পারছে না, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, পরিবর্তিত কোনো উন্নত সরকারি রাজস্ব ব্যবস্থা কী আদৌ জমিদারি তালুকগুলির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাকে নিয়মানুগ করতে সক্ষম হবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ত্রুটির উৎস আদৌ পদ্ধতিগত নয়, বরং চড়া হারে নির্ধারিত খাজনার দাবির জন্যই।"

তালুক সমূহের 'সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা' বলতে রাজস্ব বিভাগীয় পর্ষদ দুটি বিষয় নির্দেশ করে ঃ (১) সাধারণ প্রজাকে একজন নিয়মিত খাজনাদানকারী প্রজা করে তোলা এবং (২) রায়তের 'ক্ষমতা অনুযায়ী' খাজনা ধার্য করা। এই 'জমি জরিপ ও সমীক্ষা ব্যবস্থা' এবং জমিস্বত্বের নথিকরণের প্রক্রিয়া ছিল 'সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার' অন্যতম উপায়। তাছাড়া আইনি ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি তালুকগুলি বহুলাংশে ব্রিটিশ আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় এসে গিয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের সংশোধনী আইন (প্রথম) সেই সকল জমিদারি তালুকগুলিকেই প্রমাণপত্র পদ্ধতির আওতায় এনেছিল যাদের জমিস্বত্বের নথি প্রস্তুত ছিল।[২৬] এই নতুন পরিস্থিতিতে (একদিকে জমিদারদের বেসামরিকীকরণ ও অন্যদিকে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের উন্নয়ন) জমিদারদের খাজনা আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ভূমিস্বত্বের নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া অবশ্য ইতিমধ্যেই তালুক পরিচালনার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।[২৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে,

১৮৮৫ সালে রাজস্ব পর্যদ বর্ধমান রাজপরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে জমিদারদের উপর নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে রাজস্ব পর্যদ বড় বড় তালুকগুলি অধিগ্রহণের জন্য সব রকম সুযোগ কাজে লাগায়।[২৮]

২.২ অধিগ্রহণ

বর্ধমানের মহারাজা আফতাব চাঁদ বাহাদুর মারা যাওয়ার অব্যবহিত পরই কলকাতার রাজস্ব পর্যদের কাছে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে দুটি জরুরী তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের ২৬শে মার্চ বর্ধমানের কালেক্টর কর্তৃক প্রেরিত প্রথম তারবার্তার বয়ান ছিল নিম্নরূপ ঃ

"মহারাজা গত রাতে মারা গেছেন। আমি ২৭ নং ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিয়েছি।"[২৯]

বর্ধমানের কমিশনার কর্তৃক ঐ একই তারিখে প্রেরিত তারবার্তার বয়ান ছিল ঃ

"মহারাজা গত রাতে মারা গেছেন। সরকারি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কালেক্টর সম্পত্তির হেপাজত গ্রহণে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।"

বর্ধমান রাজপরিবার বিশাল সম্পত্তি অধিগ্রহণের সূত্রে বোর্ড সর্বপ্রথম এই রাজপরিবারের বিষয়-সম্পত্তির খুঁটিনাটি তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। বর্ধমান রাজ তালুকটির গুরুত্বের কারণেই রাজস্ব পর্যদ সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর ছিল।

রাজস্ব পর্যদ বর্ধমান রাজপরিবারের জটিল পারিবারিক সম্পর্কগুলির বিষয়ে অবগত ছিল।[৩০] সদ্যপ্রয়াত মহারাজার কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না[৩১] এই বিষয়টিও পর্যদ জানত। সুতরাং এটা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, বর্ধমানের মহারাজার মৃত্যু রাজস্ব পর্যদের কাছে এই বিশাল তালুকটি অধিগ্রহণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

বর্ধমানের তৎকালীন কালেক্টর / সমাহর্তা টি. ই. ককস্‌হেড মহারাজার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরেই ১৮৯৭-তে প্রণীত আইনের ৯ম বিধির ধারা ২৭-এর নির্দেশ কার্যকর করবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তিনি দেওয়ান বি. বি. কাদুর, টি. দে, মহারাজার ব্যক্তিগত সচিব/আপ্ত সহায়ক বি. মিলার-এর সহায়তায় রাজবাড়ি পরিদর্শন করেন ও রাজপরিবারের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির সুরক্ষার স্বার্থেই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মিলার দোয়াগের মহারাণী অর্থাৎ প্রয়াত মহতাব চাঁদের পত্নীকে প্ররোচিত করেন তাঁর হাতে অন্দর মহলের যাবতীয় চাবি তুলে দেওয়ার জন্য এবং অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সম্পত্তি সমন্বিত ঘরগুলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৩২]

বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কাছে কালেক্টর নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি চান ঃ

(ক) ব্রিটিশ সরকারের উচিত সত্বর বর্ধমান তালুকটিকে দৃঢ়হস্তে অধিগ্রহণ করা। কারণ বর্ধমান রাজপরিবার সম্পত্তির বিচারে ছিল সেই সময়ে বাংলার অন্যতম বৃহৎ একটি তালুক এবং এই রাজপরিবারের পারিবারিক সম্পর্কগুলিও ছিল জটিল। সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহ, মামলা-মোকদ্দমা ও সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার যে এই তালুকটির ধ্বংস ডেকে আনবে, এই আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

(খ) কাপুর এবং মিলারকে জয়েন্ট ম্যানেজার করে দেওয়া উচিৎ। কাপুর ছিলেন প্রয়াত মহারাজার শ্যালক এবং পূর্বতন মহারাজা মহতাব চাঁদ (মৃত্যু ১৮৭৯ খ্রি.)-এর

ভাগ্নে। এছাড়া তিনি শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য এবং দেওয়ান পদে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাও ছিল। তাঁর ছেলেকেই নাবালিকা মহারাণী (তিনি ছিলেন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত মহারাজা আফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুর-এর পত্নী) সম্ভবত দত্তক নেবেন। রাজপরিবারের সাথে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াও চারিত্রিক গুণাবলী ও তালুক পরিচালনার কাজে তাঁর পারদর্শিতার জন্যই তিনি ছিলেন ঐ পদটির জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। অন্যদিকে মিলার ১৬ বছর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করা ছাড়াও মহারাজা মহতাব চাঁদ ও আফতাব চাঁদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করেছেন। কেবলমাত্র মিলারকে সহযোগী হিসাবে পেলেই কাপুর দোয়াগের মহারাণী ও তার অনুগামীদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারবেন। তাছাড়া তার বিশ্বস্ত বন্ধু ও পুরানো সহকর্মী মিলারকে সহযোগী হিসাবে না পেলে কাপুর রাজপরিবারের প্রতি তার সহজাত আনুগত্যসত্ত্বেও এই দুরুহ দায়িত্ব গ্রহণে দ্বিধা করবেন।

(গ) এই তালুকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের নির্দেশ অনুযায়ী বকেয়া টাকা সংগ্রহের দায়িত্ব এই দুই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করার জন্য কালেক্টরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুমতি রাজস্ব পর্ষদের দেওয়া উচিৎ।[৩৩]

কালেক্টরের নেওয়া এই সমস্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে রাজস্ব পরিষদের অনুমোদন পায়। এবং এই মর্মে ১৮৮৫ সালের ৩১শে মার্চ একটি নির্দেশনামাও জারি করা হয়।[৩৪] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল অ্যাক্টের শর্তাদি অনুযায়ী বর্ধমান রাজ তালুকটি কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন হয়।[৩৫]

২.৩ রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বে রাজস্ব পর্ষদের মনোভাব

কোর্ট অব ওয়ার্ড-এর কার্যকলাপ কিন্তু খুব সচ্ছন্দে সংগঠিত হয়নি। এই নীতি প্রযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ধমান রাজপরিবারে অন্তর্কলহ শুরু হয়, যা বর্ধমানের মহারাজার জীবদ্দশায় দেখা যায়নি। বস্তুত এমন একটি বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর হওয়াতেই বর্ধমান রাজপরিবারের বিরোধীগোষ্ঠী নিজেদের দাবি তোলে। দাবিগুলি ছিল মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি আর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। মহারাজার নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুই এই অন্তর্বিরোধের সূত্র।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের নীতির কাছে বর্ধমান রাজপরিবারের অন্তর্কলহ যাতে এই বিশাল লাভজনক তালুকটির পরিচালনা বিপদাপন্ন না করে তোলে সেই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখাই ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এই সম্ভাব্য আশঙ্কা দূরীকরণের মাধ্যমেই কেবল সরকার কর্তৃক ধার্য রাজস্ব নির্বিঘ্নে আদায় করা যেতে পারে। এই কোর্ট অব ওয়ার্ডের নীতির সাধারণ লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধাচারণকারী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে তাই আইনি ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সবলে প্রয়োগ করা হয়।

২.৩.১ দোয়াগের মহারাণীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দাবি

মহারাজার মৃত্যুর পর দোয়াগের মহারাণী বর্ধমান তালুকের কিছু সম্পত্তি দাবি করেছিলেন। তার দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) কুজাঙ এবং সুজামুতা তালুকটির অধিগ্রহণের দাবি

এবং (২) অন্যান্য ভূসম্পত্তির দাবি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই সম্পত্তিগুলি কিন্তু ক্রয়ের সময় দোয়াগের মহারাণীর নামেই নিবন্ধীকৃত হয়। (৩) হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (যেমন অলংকার, সরকারি দলিল ইত্যাদি)-র দাবি। মহারাণী এই হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তির দাবির ক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলেন যে, এগুলি তার স্বামীর করে যাওয়া উইল অনুসারে তারই প্রাপ্য।[৩৬]

কুজাঙ

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান রাজপরিবার যখন কুজাঙ তালুকটি ক্রয় করে তখন তা প্রথমে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের বেঙ্গল ইনহেরিট্যান্স রেগুলেশন অ্যাক্টের আট নং ধারা অনুযায়ী[৩৭] এবং তার পর ১৮৭৬ সালের অ্যাকটের আট নং ধারা অনুযায়ী দোয়াগের মহারাণীর নামে নিবন্ধীকৃত করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন এই তালুকটির স্বত্বাধিকারিণী। তার নামেই সরকারি রাজস্ব জমা হত এবং তিনি ছিলেন বকেয়া খাজনা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার প্রধান অভিযোগকারী। স্থানীয় ম্যানেজার এবং নায়েবের নিযুক্তি তার অনুমোদিত পরোয়ানা / নিযুক্তিনামার ভিত্তিতেই হত। উকিল ও মোক্তারদের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের আধারও ছিলেন তিনি। কোর্ট অব ওয়ার্ডের নীতির বলে বর্ধমান রাজপরিবার অধিগৃহীত হলেও এই পরিস্থিতিতে তালুকটি পরিচালনা করা ছিল যথেষ্ট সমস্যামূলক।

নিজ কর্তৃত্ববলে কোর্ট অব ওয়ার্ড উত্তরাধিকারের দাবিদার দুই দলের মধ্যস্থতা করেছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড কাপুরের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিল। দোয়াগের মহারাণী আবার কাপুর ও মিলারকে ম্যানেজার পদে নিযুক্তির সিদ্ধান্তের চরম বিরোধী ছিলেন। রাজস্ব পর্ষদ অবশ্য এই সমস্যার সমাধান আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে না করে প্রশাসনিক মধ্যস্থতার সাহায্যে করেছিল। দোয়াগের মহারাণী সম্পত্তির দাবি তোলার সাথে সাথেই রাজস্ব পর্ষদ সেই সম্পত্তিগুলি সরাসরি দখল করে নেয়। এবং রাজস্ব পর্ষদ মহারাণীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করে। পূর্বে সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যাদি নিষ্পত্তির জন্য মহারাণীকে প্রদত্ত বিশাল ধনরাশি সম্পত্তিতে তার দাবির বৈধতাকে প্রমাণ করে।[৩৮] এমতাবস্থায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের সমস্যা সহজেই অনুমেয়। 'এই সব মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর স্থানে দোয়াবের মহারাণীর পরিবর্তে কার নাম বসবে - ম্যানেজারদের, না এই নীতির আওতাধীন অন্য কারও'—এই নিয়ে সমস্যাটি বেশ জটিল হয়ে উঠেছিল।[৩৯] এই সমস্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা দাবিদার হিসাবে কোর্ট অব ওয়ার্ডের নাম দেওয়ার বিপক্ষে রাজস্ব পর্ষদ অভিমত জ্ঞাপন করে। প্রয়াত মহারাজা আদালতের রায় অনুসারে নীলামে যে তালুকগুলি ক্রয় করেন সেগুলির নীলামে ক্রেতা হিসাবে দোয়াগের মহারাণীর নাম নথিভুক্ত করা হয়। সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডের পক্ষে 'যাবতীয় সম্পত্তি কার্যত প্রয়াত মহারাজের' — এই মর্মে সরাসরি মামলা করা সম্ভব ছিল না। এই গোটা প্রক্রিয়ায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অবস্থান ছিল সম্পত্তির একজন অংশীদার হিসাবে। এই অবস্থানের দৃঢ়তা নির্ভরশীল ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডের শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপগুলির উপর।[৪০] কোর্ট অব ওয়ার্ডের কুজাঙ তালুকটির অধি-গ্রহণের কাজে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য একজন ম্যানেজারের অতিসত্বর

কুজাঙে যাওয়া প্রয়োজন বলে রাজস্ব পর্ষদ মনে করেছিল। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল নিম্নরূপ[৪১] ঃ (১) মহারাণীর নামে স্থানীয় কর্মচারীদের প্রদত্ত সমস্ত সনদ, নির্দেশনামাগুলি ফিরিয়ে নিয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ড নীতি অনুসারে তাদের পুনঃপ্রয়োগ, (২) মহারাণীর কাছে গচ্ছিত সমস্ত পুরনো জামিনের চুক্তিপত্রগুলি বাতিল করে কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিয়ন্ত্রণে নতুন চুক্তিপত্র প্রদান, (৩) প্রত্যেক মালকাছারিতে[৪২] এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করা যে, তালুকের অন্তর্গত সমস্ত কর্মচারীদের শুধুমাত্র কোর্ট অব ওয়ার্ড-এর নির্দেশ ভিন্ন অন্য কোনো নির্দেশের পালন করতে হবে না, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দেশের কোনো মান্যতা নেই, (৪) তালুকের কয়েকজন মুখ্য রায়তকে ডেকে এনে সাবধান করে দেওয়া যে, তারা যেন কোর্ট অব ওয়ার্ডকেই তাদের বকেয়া খাজনা দেয়, কারণ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত খাজনার রশিদ বাতিল বলে পরিগণিত হবে, (৫) জেলার প্রধান বিচারপতি, মহকুমার বিচারপতি,[৪৩] কালেক্টর, জেলাশাসক এদের সকলের প্রতি এই মর্মে প্রতিবেদন জ্ঞাপন করা যে, বর্ধমান রাজ তালুকটির ন্যায় কুজাঙ তালুকটি কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছে। সুতরাং কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণের আগে এই তালুকটির আম-মোক্তারীর যে ক্ষমতা দোয়াগের মহারাণীর নামে অর্জিত ছিল তা স্বাভাবিক ভাবেই বাতিল বলে পরিগণিত হল।

সুজামুতা তালুক এবং অন্যান্য সম্পত্তি যা মহারাণীর নামে নিবন্ধীকৃত ছিল সেগুলির অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও রাজস্ব পর্ষদ একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। ফলস্বরূপ টি. বি. মিলারকে রাজস্ব পর্ষদের নির্দেশে ১৮৮৫ সালে ১২ই অগাস্ট কুজাঙ তালুকের ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়। মিলার পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন।[৪৪] যদিও মূল সমস্যা ছিল দোয়াগের মহারাণীকে নিয়ে, যিনি ছিলেন তালুকগুলির নিবন্ধীকৃত / আইনানুগ অধিকর্ত্রী। ল্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট / জমি নিবন্ধীকরণ আইন-এর ৭৮নং ধারার শর্তাবলী অনুসরণ করে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন দুই ম্যানেজারকে তাদের নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যেই নিবন্ধীকৃত করাকে রাজস্ব পর্ষদ যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিল। ঐ আইনের ৪৭ নং ধারা অনুযায়ী এই নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব ছিল কালেক্টরের, যিনি উক্ত ম্যানেজারদের নিযুক্তির উপস্থাপনযোগ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন। এই সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে রাজস্ব পরিষদ উড়িষ্যার কমিশনারকে দোয়াগের মহারাণীর পরিবর্তে উক্ত দুই ম্যানেজারের নাম ঐ তালুকদ্বয়ের অধিকর্তা হিসাবে নিবন্ধীকৃত করার নির্দেশ দেয়। ঐ নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং ফলস্বরূপ কোর্ট অব ওয়ার্ডের উক্ত তালুক দুটির উপর প্রকৃত আইনানুগ অধিগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়।[৪৫]

রাজস্ব পর্ষদ এই অজুহাত দেখায় যে, মহারাণী হলেন উক্ত তালুক দুটির পারিবারিক পরম্পরা অনুসারে বেনামি অধিকর্ত্রী। বর্ধমান রাজের কিছু সম্পত্তি তবুও মহারাণীর কুক্ষিগত ছিল। এই সমস্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের পেছনে রাজস্ব পর্ষদের মূল যুক্তি ছিল ঃ (ক) মহারাণী কখনই নিজের অধিকার হিসাবে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেননি, (খ) একখণ্ড একটি জমি উপহারের এক ঘটনায় দেখা গেছে যে জমিটি মহারাণীর নামে কেনা হয়েছে তবে কুজাঙ তালুকটি যে মহারাণীর সম্পত্তি সেই মর্মে কোন চুক্তিপত্র পাওয়া যায়নি, (গ) উপরন্তু দোয়াগের মহারাণী ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ফলে

রায়তের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তারজন্য কোনো ত্রাণ ব্যবস্থা নেননি। দুঃসময়ে ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে রায়তের পাশে এসে দাড়ানো ভূস্বামীর অন্যতম কর্তব্য আর মহারাণী এই কর্তব্য পালনে অপারগ হয়েছিলেন, বলা বাহুল্য কোর্ট অব ওয়ার্ড সেই সময়ে প্রজাহিতৈষী ভূস্বামীর দায়িত্ব পালন করেন।[৪৬]

পরবর্তী পর্যায়ে রাজস্ব পর্ষদ দোয়াগের মহারাণীর নামে যেসব সরকারি জামিন ছিল সেগুলি হস্তগত করে এবং কুজাঙ ও সুজামুতা তালুকদুটির খাজনা সংগ্রহ সংক্রান্ত নথিপত্রগুলি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়।[৪৭] মহারাণী মাসিক ৪,০০০ টাকার ভাতাসহ বার্ষিক ৫,০০০ টাকা যা তিনি তার স্বামীর সময় থেকে পেয়ে আসছেন এবং অন্যান্য সম্পত্তিবাবদ বার্ষিক ২০,০০০ টাকার বিনিময়ে কুজাঙ, সুজামুতাসহ আরও কয়েকটি ছোট তালুকের স্বত্ব ত্যাগ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আই.পি.পুগকে মধ্যস্থ হিসাবে না পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু মহারাণী গহনাগাটির দাবি পরিত্যাগ করেননি। সেই সময় কলকাতা হাইকোর্টে মহারাণীর দত্তক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির কাজে মহারাণী ব্যারিষ্টার আই.পি.পুগকে নিয়োগ করেছিলেন।[৪৮] ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাণীর সম্পত্তি ও দত্তক সংক্রান্ত মামলা উভয়েরই নিষ্পত্তি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাপুর তার বিবৃতিতে খোলাখুলিভাবেই লেখেন ঃ

> "মধ্যস্থ হিসাবে মি. পুগ-এর নিয়োগ দুর্ভাগ্যজনক। এই নিযুক্তি আমার অজ্ঞাতে ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র তাঁর মক্কেল দোয়াগের মহারাণীর স্বার্থরক্ষাতেই প্রযুক্ত।"[৪৯]

সুজামুতা তালুকটির উপর মহারাণীর অধিকার একইভাবে বর্জিত হয়েছিল। সুজামুতা তালুকটিও দোয়াগের মহারাণীর নামেই কেনা হয়েছিল। কুজাঙ তালুকটির মত এখানেও মহারাজের মৃত্যুর পর দুটি বিরোধীগোষ্ঠী সম্পত্তি অধিগ্রহণে সচেষ্ট হয়েছিল। রাজস্ব পর্ষদের বার্ষিক বিবৃতি রিপোর্টে বলা হয় যে, কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদেরকে দোয়াগের মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে জাহির করে মফস্বলের কিছু অধস্তন কর্মচারীকে কোর্ট অব ওয়ার্ডের কর্তৃত্বের পরিবর্তে নিজেদের কর্তৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ কোনো সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় তা ভেবে কুজাঙ তালুকটি অধিগ্রহণে রাজস্ব পর্ষদের নির্দেশিত গৃহীত ব্যবস্থাদিরই পুনঃপ্রবর্তন করা হয়, সুজামুতা তালুকটি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মহারাণীর নামে নিবন্ধীকৃত সম্পত্তিকে পুনরায় নতুন দুই ম্যানেজারের নামে নিবন্ধিকৃত করা হয়।[৫০] এই বিবাদমূলক পরিস্থিতিতে আবার সুজামুতা তালুকটির খাজনাকৃত আয়েরও ভীষণ তারতম্য হত। ১৮৮৭-৮৮ সালে দেখা যায় এই তালুকটির খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল খুব স্বল্প। এর মূল কারণ রায়তরা এই সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ড আর মহারাণীর বিবাদের সুযোগে তাদের খাজনা প্রদানের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী রায়তরা বর্ধমান রাজ কর্তৃক নির্ধারিত খাজনার দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। কারণ হিসাবে তারা বলে যে বর্ধমান রাজের খাজনা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সেস আদায় বেআইনি।[৫১]

২.৩.২ বর্ধমান দত্তক মামলা

বর্ধমান দত্তক মামলা-র মধ্য দিয়েই রাজপরিবারের অন্তর্কলহের চরিত্র ও পরিবারের

প্রতি রাজস্ব পর্ষদের মনোভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কুজাঙ আর সুজামুতা তালুক দুটির অধিগ্রহণ ছিল দোয়াগের মহারাণীর অভিপ্রায়ের স্বার্থসন্নিবিষ্ট — এই কারণেই দত্তক নেওয়ায় তাঁর আপত্তি ছিল তীব্র। এই মামলার ফলেই দেওয়ান কাপুর আর দোয়াগের মহারাণীর দ্বন্দ্বের সূচনা — আর এই বিরোধের ক্ষেত্রে রাজস্ব পর্ষদের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়াত মহারাজার উইল অনুযায়ী স্বল্পবয়সী মহারাণী বিনোদায়ী দেবী একটি ছেলে দত্তক নিতে পারতেন। মহারাণী, তাঁর পিতা লছমী নারায়ণ খান্না এবং তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদা দেবীর সন্তানকে — মহারাণীর সৎভাই — দত্তক পুত্র হিসাবে নিতে চেয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে মহারাণী লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অনুমোদন[৫২] প্রার্থনা করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর অবশ্য এই ব্যাপারে কোনো অনুমোদন না দিয়ে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ নিজের মন্তব্য পেশ করেন যা আবার অ্যাডভোকেট জেনারেল নথিভুক্ত করে রাখেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মহারাণীর আবেদনকে নাকচ করে দেন, কারণ তার মতে মহারাণীর দাবিটি ছিল অকার্যকর এবং হিন্দু আইন অনুযায়ী বেআইনি।[৫৩] পরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই-এর গৃহীত সরকারি প্রস্তাব অনুসারে অল্পবয়সী মহারাণী লালা বনবিহারী কাপুরের পুত্র লালা বিজনবিহারী কাপুরকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এই দত্তক নেওয়া ছেলের নাম দেওয়া হয় মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর।[৫৪] দোয়াগের মহারাণীর অবশ্য নির্বাচিত দত্তকপুত্রটি নেওয়া পছন্দ ছিল না। তার প্রধান শত্রু বি. বি. কাপুর নিজেই দোয়াগের মহারাণীর এই প্রতিক্রিয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৮৫-১৯০২ খ্রিস্টাব্দের বর্ধমান রাজ তালুকের প্রশাসনিক বিবৃতিতে শ্রীকাপুর উল্লেখ করেন যে, দোয়াগের মহারাণীর মূল ইচ্ছা ছিল বিজনবিহারীর পরিবর্তে নিজের ভাইপোকে[৫৫] দত্তক গ্রহণ নেওয়া। একদিকে তার নেওয়া দত্তক বাতিল ও অন্যদিকে তালুক অধিগ্রহণ, এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের কারণে দোয়াগের মহারাণী কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলার শুনানির আগেই সমস্যাগুলি আপসে মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই আপসের শর্ত অনুযায়ী দোয়াগের মহারাণীর প্রাপ্য ছিল ১৩ লক্ষ টাকা নগদ, একটি বাড়ি ও চিরদিনের জন্য বর্ধমান তালুকের সব দিঘি এবং ১০নং ক্লাইভ স্ট্রীটের দুটি ব্লক রাণীর জীবদ্দশা পর্যন্ত। এছাড়া কুজাঙ ও সুজামুতা সংক্রান্ত সমঝোতায় রাণীর প্রাপ্যও বহাল ছিল। এসবের বিনিময়ে তাঁকে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণকে বৈধ বলে স্বীকার করতে হয়েছিল। এই আপসের জন্য মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল শুধু নগদ টাকার অঙ্কেই ১৫ লাখ টাকা, আর গহনাগাটির মূল্য বাবদ আরও ৭ লক্ষ টাকা। কাপুরের বিবৃতি অনুযায়ী ১৮৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে এই মামলার নিষ্পত্তি রাজপরিবারের সদস্যদের অন্তর্কলহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল।[৫৬] আপসের শর্তানুযায়ী দোয়াগের মহারাণীর প্রাপ্যের পরিমাণ খুব সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণে মহারাণীর বিরোধিতা ও তাঁর সম্পত্তির দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল।

রাজস্ব পর্ষদ এই ব্যাপারে কিভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল সেটাও একটি বিচার্য বিষয়। কাপুরের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার ঘটনাটি সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পূর্বেই রাজস্ব পর্ষদের কার্যনির্বাহী সদস্য জন বীমস্ এই দত্তক সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি

জমা করেন। জন বীমস্-এর এই স্মারকলিপির উপর ভিত্তি করেই রাজস্ব পর্ষদের কার্যনির্বাহী সচিব / সম্পাদক সি. ই. বাকল্যাণ্ড দত্তক গ্রহণের ঘটনাটি যাতে করে সরকারি অনুমোদন পায় সেই মর্মে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন।[৫৭] এই স্মারকলিপিটিতে কাপুরের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার বিরুদ্ধে দোয়াগের মহারাণীর প্রতিবাদের কাহিনী বিবৃত আছে। দোয়াগের মহারাণী এই মর্মে বক্তব্য পেশ করেন যে, এই দত্তক গ্রহণের ঘটনাটি হিন্দু আইন অনুসারে মূলত তিনটি কারণে বাতিলযোগ্য। কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) কারণ সে (যাকে দত্তক নেওয়া হবে) ছিল নাবালিকা মহারাণীর বোনের সন্তান।

(২) কারণ সে (যাকে দত্তক নেওয়া হবে) ছিল তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

(৩) কারণ তার (যাকে দত্তক নেওয়া হবে) বয়স ছিল পাঁচ বছরের বেশি।

এই দত্তক সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ আলোচনা মূলত প্রথম দুটি কারণকে নিয়েই সীমিত ছিল, আর তৃতীয়টি কার্যত বাদ দেওয়া হয়েছিল। দোয়াগের মহারাণীর এই ত্রিবিধ যুক্তির বিরুদ্ধে তার নাবালিকা বোন, যিনি ছোট মহারাণী বলে পরিচিত ছিলেন, নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। বলা বাহুল্য যে তিনি কাপুরের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। ছোট মহারাণীর বক্তব্য ছিল মোটামুটি এরকম ঃ যেহেতু বর্ধমানের রাজপরিবার ছিল প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব থেকে আগত এবং ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত এবং এছাড়াও এই রাজপরিবার বহুদিন থেকেই পাঞ্জাবি রীতিনীতি অনুসরণ করে আসছে যেগুলি কোনো ভাবেই মিতাক্ষরা আইনের কঠোর নীতিগুলির অনুরূপ নয়, সেহেতু দত্তক নেওয়ার ঘটনাটি পাঞ্জাবের রীতিনীতি অনুসারে অনুমোদনযোগ্য (যাঁকে দত্তক নেওয়া হবে সে নাবালিকা মহারাণীর বোনের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও এবং সে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও)। এই বাদানুবাদের ফলে মূল যে দুটি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে সেগুলি হলোঃ

(১) দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ধমান রাজপরিবার কী হিন্দু মিতাক্ষরা আইন দ্বারা, নাকি পাঞ্জাবের প্রথাগত আইন দ্বারা পরিচালিত হত?

(২) যদি বর্ধমান রাজপরিবার পঞ্জাবের প্রথাগত আইন দ্বারাই পরিচালিত হয় তাহলে দত্তক সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঞ্জাবের প্রথাগত আইনের স্বরূপটি কী?

বীমস্ কাপুরের সন্তান দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করতে গিয়ে তার স্মারকলিপিতে মন্তব্য করেন যে, কাপুরের সন্তানকে দত্তক হিসাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তটি নিতান্তই বিচক্ষণ এক সিদ্ধান্ত, আর তাছাড়া এই কাপুর হলেন একজন যুক্তিবান, সম্ভ্রান্ত, অনুগত এবং সুবিবেচক লোক। বর্ধমানের রাজকার্য পরিচালনা করার ও বর্ধমান রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কাপুর নিজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত ছেলের যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং এই পদে তিনি অন্য কারও কথা ভাবতেও পারতেন না। এই দত্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমাধান কী হবে সে বিষয়ে বীমস্-এর ধারণা ছিল যে এই প্রশ্নের কোন সমাধান সম্ভব নয় যতদিন না হাইকোর্টে এই দত্তকের মামলার আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি না হয়। কারণ বীমস্ মনে করতেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরাই দিতে পারবে, রাজস্ব পর্ষদের সদস্যদের মত কোন প্রশাসনিক অফিসার নয়।[৫৮]

এই স্মারকলিপির ভিত্তিতে বাকল্যাণ্ড কাপুরের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামতগুলিকেও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্ধমান রাজপরিবার যে পাঞ্জাবের প্রথাগত আইন দ্বারা পরিচালিত হত এই বিষয়টির উল্লেখ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগে হয়নি। নাবালিকা মহারাণী যেদিন থেকে কাপুরের সন্তানকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকৃতি জানায়, ঠিক সেদিন থেকেই পাঞ্জাবের প্রথাগত আইনের প্রসঙ্গটিকে, বর্ধমান রাজপরিবার যে এই প্রথাগুলি দ্বারা পরিচালিত হত তার প্রমাণ হিসাবে, উল্লেখ করা হত।[৫৯] বিদগ্ধ আইনি উপদেষ্টারা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, বর্ধমান রাজপরিবার পাঞ্জাবের প্রথা ও রীতিনীতি বজায় রাখেনি; উপরন্তু বর্ধমান রাজপরিবারের কার্যাদিনির্বাহের ক্ষেত্রে সুদূর অতীত থেকেই মিতাক্ষরা আইন ও শাস্ত্র (শাস্ত্রানুমোদিত নীতি) এই দুইয়ের কার্যকারিতার ধারাবাহিকতাও বজায় রয়েছে। আইন উপদেষ্টারা মন্তব্য করেন যে, নাবালিকা মহারাণীর বোনের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণরূপেই বাতিলযোগ্য এবং বর্ধমান রাজপরিবায়ের ইতিহাসে এরকম কোনো নজির নেই। আইন উপদেষ্টারা এও বিশ্বাস করতেন যে ব্রাহ্মণ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে এধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বস্তুত বোনের সন্তানকে দত্তক নেওয়ার রীতি শুধুমাত্র শূদ্রদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল যারা এই ধরনের দত্তক নেওয়াকে আদর্শ দত্তকের রীতি বলে মনে করত।[৬০] বাকল্যাণ্ড তার রিপোর্টে আইন উপদেষ্টাদের এই অসম্মতিগুলির পর্যালোচনা করে দত্তক গ্রহণের সুপারিশ করেন মূলত তিনটি কারণের ভিত্তিতে। সেগুলি হলোঃ

(১) রাজপরিবার দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথা আর নিয়মগুলিই মান্য করে আসছে;[৬১]

(২) পাঞ্জাবের আদালত এই মর্মে সহমত পোষণ করেছে যে, পাঞ্জাবে বোনের ছেলেকে দত্তক নেওয়ার রীতি বাতিল বলে স্বীকৃত;[৬২]

(৩) কাপুরের সন্তানকে দত্তক হিসাবে নেওয়ার প্রস্তাবটি সমগ্র বর্ধমান শহর ও বর্ধমান জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রস্তাব। শুধুমাত্র দোয়াগের মহারাণীর অনুগামীরাই এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।[৬৩]

এই তিনটি কারণ ছাড়াও তিনি আরও মন্তব্য করেন ঃ

"রাজস্ব পর্ষদ এই সুপারিশ সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তাদের (আইন উপদেষ্টাদের) মতে নাবালিকা মহারাণী এই মামলার একজন যথার্থ স্বাধীন প্রতিনিধি, এবং তিনি লালা বনবিহারীর (কাপুর) সন্তানকে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি উৎসাহী।"[৬৪]

৩. কোর্ট অব ওয়ার্ডের তালুক ব্যবস্থাপনা

৩.১ বর্ধমান রাজপরিবারের সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

১৯টি জেলায় বর্ধমান রাজপরিবারের ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি ছিল,[৬৫] যা ২০ লক্ষ জনসংখ্যা সম্পন্ন ৪,১৯৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ভূসম্পত্তির অধিকাংশই পত্তনি ব্যবস্থা, মুকররি[৬৬] লীজ ব্যবস্থা, এবং ইজারা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হত এবং

বাকি জমি খাস (সরাসরি) ব্যবস্থাপনার অধীনে রাখা হত। কুজাঙ এবং সুজামুতা তালুকদুটি ছিল বর্ধমান রাজপরিবারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ তালুক যেগুলি রাজপরিবারের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হত। কটক জেলাস্থিত কুজাঙ তালুকটি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে, আর মেদিনীপুরের সুজামুতা তালুকটি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ক্রয় করা হয়। খাসমহলের রায়তরা সংখ্যায় ছিলেন ৭০,২১৩ জন আর পত্তনিদার ও মুকররিদারদের সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ৩,০০০ জন।[৬৭] তালুকগুলির বিভাজন করা হত দু'ভাগে, যথা জমিদারি ও দেবোত্তর।[৬৮] জমিদারি ও দেবোত্তর অংশগুলি থেকে আয় হত যথাক্রমে ৬৮৭,৭১৯ টাকা ও ৩০০,২১৯ টাকা।[৬৯] এছাড়া ছিল দেবসেবা সম্পত্তি।[৭০] যথাযথভাবে বলতে গেলে এই দেবসেবা সম্পত্তি কিন্তু বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনার উদ্দেশ্যে চিরতরে সমর্পিত কোনো সম্পত্তিকে বোঝাতো না। বস্তুত দেবসেবা সম্পত্তি থেকেও তালুকগুলি খাজনা আদায় করত আর তা পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় উৎসব উৎযাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় হত।[৭১]

৩.২ তালুক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা

যেদিন থেকে তালুকগুলি কিছু পরিমাণ জমি চিরস্থায়ী ইজারা দিতে শুরু করল[৭২] তখন থেকেই বর্ধমান রাজপরিবার প্রায়শই তার দেয় রাজস্ব দিতে অক্ষম হয়। এই অর্থনৈতিক সমস্যা বস্তুত তালুক ব্যবস্থাপনার দুর্বল কাঠামোর জন্যই উদ্ভূত হয়েছিল।[৭৩] যদিও কিছু সময় পরে বর্ধমান রাজপরিবারই বাংলার সবচেয়ে সম্পদশীল পরিবার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

> ".... বর্ধমান রাজপরিবার অবশেষে একজন সুবিবেচক রাজার তত্ত্বাবধানে এল ঃ অধীনস্থ রায়ত ব্যবস্থার প্রণয়ন, এছাড়া তালুকের উন্নয়ন প্রকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ প্রবর্তন করেছিল। এই সকল ব্যবস্থার সূত্রে বর্ধমান রাজপরিবার বাংলার সবচেয়ে সম্পদশালী রাজপরিবারের মর্যাদা পায়।"[৭৪]

বর্ধমান রাজপরিবারের এই সাফল্য মূলত দুটি কারণেঃ

(১) ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিশেষত, আইন ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ ও উন্নয়ন,

(২) বর্ধমান রাজ কর্তৃক ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে মূলত আইন বিভাগের মাধ্যমে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন।

ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দৃঢ়প্রতিষ্ঠার সমান্তরালে বর্ধমান রাজপরিবার তার নিজস্ব আইন বিভাগ তৈরি করেছিল। এই নিবন্ধে আমরা জমিদারি ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। ম্যাকলেন জমিদারি ব্যবস্থার এই বড় রকমের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কতকগুলি কারণ উল্লেখ করেন ঃ (১) পারিবারিক দ্বন্দ্ব, (২) সুসংগঠিত জমিদারি সেনাবাহিনীর বিভাজন এবং (৩) রাজস্বমুক্ত জমিগুলির পুনঃগ্রহণ।[৭৫] জমিদারি বাহিনীর বিভাজন ও রাজস্বমুক্ত জমিগুলির পুনরুদ্ধার এই দুটি বিষয় মূলত জমিদারি আয় হ্রাসের প্রধান কারণ। যদিও জমিদারি ক্ষমতার হ্রাস সর্বত্র উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য ঘটেনি। কিছু জমিদার কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই নতুন ব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন, আর এই নতুন ব্যবস্থার ফলে তারা লাভবানও হয়েছিল। বর্ধমান রাজপরিবার ও তার আত্মীয়দের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান

ছিল যা কিনা সে সময়ে বাংলার অন্যান্য জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে দেখা যেত না। এও দেখা গিয়েছিল যে, বর্ধমান রাজপরিবারে অপরাপর পরিবারের তুলনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব কমই ছিল। আর সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে কখনও বিভাজিত হয়নি।

মহারাজা মহতাব চাঁদ বাহাদুর-এর সময়কালে তালুক পরিচালনার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং মহারাজের। মহারাজকে এই কাজে সাহায্য করার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট এক পর্ষদ ছিল। প্রত্যেক সদস্য আবার আলাদা আলাদা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এই সদস্যরা আবার প্রত্যেকেই ছিলেন মহারাজের ব্যক্তিগত সহকারী ব্যক্তি। মহারাজা তার জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়ে তালুক পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব প্রত্যাহার করেন এবং তালুক পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা মিলার ও বি. বি. কাপুরের উপর ন্যস্ত করেন। মিলার ও কাপুর সেই সময়ে ছিলেন যথাক্রমে পর্ষদের সভাপতি ও সহসভাপতি। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহতাব চাঁদের মৃত্যুর পরও এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। মহতাব চাঁদের উত্তরসূরী আফতাব চাঁদ মহতাবের ওপর খাসমহল পরিচালনার দায়ভার নিয়মানুগভাবেই এসে পরে। তিনি বর্ধমান রাজপরিবারের জমিদারি প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিবর্তন সাধন করেননি।

বর্ধমান রাজপরিবারের আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপের আলোচনাও এ- প্রসঙ্গে এসে পড়ে। তালুকগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ-আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বর্ধমান রাজপরিবারের তালুকগুলি যে এক বিশৃঙ্খল পরিচালন ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, এমন দোষারোপ কিন্তু করা সম্ভব নয়। তালুক পরিচালনার জন্য চারটি বিভাগ ছিল, যথা (১) রাজস্ব বিভাগ, (২) বিচার বিভাগ (আদালত), (৩) ব্যয় বিভাগ (খরচ), (৪) গৃহ নির্মান বিভাগ (ইমারত)। যদিও পরবর্তীকালে এই চতুর্থ বিভাগটির বিলোপ সাধন করা হয় এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতি অন্যান্য তিন বিভাগের কার্যাবলী তত্ত্বাবধানের সাথে সাথে এই চতুর্থ বিভাগের সাধারণ কার্যাবলীর দেখাশুনা করতেন।

ক. রাজস্ব বিভাগ

এই বিভাগের কাজ ছিল তৌজিদের[৭৬] রেজিস্টার ঠিক রাখা, রাজপরিবারের আওতাধীন সমস্ত খাজনামুক্ত ও খাজনাদায়ী জমির হিসাব রাখা, পত্তনিদার ও অন্যান্যদের কাছ থেকে সব ধরনের খাজনা আদায় করা। এছাড়াও বকেয়া টাকার হিসাব রাখা এবং আইন বিভাগের কাছে সেই হিসাব জমা করার মাধ্যমে আইন বিভাগকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৮ নং উপধারা অনুযায়ী বা অন্য কোনো আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী বকেয়া টাকা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে সমর্থ করা। এই বিভাগ সমস্ত পত্তনিদারদের কাছ থেকে কাবুলিয়তগুলি ও জমিননামাগুলি নিয়ে নিয়েছিল এবং সবধরনের পাট্টা ও দাখিলাগুলি দেওয়া হত এই বিভাগের থেকে। এই বিভাগ সরকারি রাজস্বও নিয়মিত প্রদান করত। যদিও রাজস্ব সংক্রান্ত জরুরী তথ্যগুলি সংরক্ষিত থাকত ভেতরের কোনো সুরক্ষিত ঘরে, যা পরিচিত ছিল 'ভিতর আলমারি' হিসাবে। এই বিভাগের সমস্ত কার্যা-বলীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল 'জমা সদস্যে'র। এই 'জমা সদস্য' আবার কাজ করত ম্যানেজারের নির্দেশ অনুযায়ী অথবা দৈনন্দিন কাজের (দস্তুর আমূল) লিখিত সরকারি নিয়ম অনুসারে।

খ. আইন বিভাগ

ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্থাপনার সাথে সাথে আইন বিভাগ তালুকগুলির বকেয়া খাজনা আদায়ের স্বীকৃত আইনি পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয় হাতিয়ারে পরিণত হয়। বকেয়া খাজনার সমস্ত মামলা এই বিভাগই দায়ের করত। অধিকার, শিরোপা, ডাকমূল্য, সেনাবাহিনীর রেশন সরবরাহের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি এইসব বিষয় সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলাগুলিও আইন বিভাগের সেরেস্তাই দায়ের করতেন। সরকারি বিচারালয় থেকে আগত রুবাকর বা লিখিত কার্যবিবরণীগুলির জবাব দেওয়ার জন্য ও ফৌজদারী এবং পৌরসভা ক্ষতিপূরণ ও খাজনা প্রভৃতি বিষয়ে মামলা দায়ের করা ও মামলাগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আইন বিভাগের একজন আলাদা সেরেস্তাদার ছিল। রাজপরিবারের সমস্ত বেতনভোগী কর্মচারীদের সাথে রাজপরিবারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চুক্তি সংক্রান্ত বিষয় এই আইন বিভাগই নির্বাহ করত। এই বিষয়গুলির সরাসরি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল আইন বিভাগের সদস্যের।

আইন বিভাগের এই সদস্য ম্যানেজারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করত এবং তাকে স্থানীয় বিচারালয়ের যে কোনো আইনজীবী সাহায্য করত। বিভিন্ন জেলা ও চৌকির (জনসমষ্টির একক) সমস্ত মোক্তাররা এই আইন বিভাগের সদস্যের আয়ত্বে ছিলেন এবং তাঁরা এই সদস্যের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন এবং তাঁদের সমস্ত হিসাবপত্র এর কাছেই জমা করতে হত। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন। এছাড়াও দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে তিনি তার কাছে প্রেরিত সরকারি লিখিত বিধি অনুযায়ী কাজ করতেন।

গ. ব্যয় বিভাগ

ব্যয় ও বকেয়া মেটানো সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলির দেখাশোনা করতেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্য। সদর ও মফস্বলের সমস্ত কর্মচারীদের মাসিক বেতন এই বিভাগই প্রদান করত। দেবসেবা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামরিক কর্মচারীদের ভরণপোষণ, আস্তাবল, গোশালা, পিলখানার দেখাশোনা এবং আইন বিভাগের জন্য নির্ধারিত খরচের ব্যয়ভার এই বিভাগই বহন করত। ম্যানেজারের কাছে বাৎসরিক হিসাব জমা করার আগে এই বিভাগকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে হিসেব-নিকেশ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হত। এছাড়া ব্যয় বিভাগকে এও দেখতে হত প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আসবাব পত্রের বিস্তৃত তালিকা নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিয়েছে কিনা এবং তালিকাগুলি পরীক্ষার দায়িত্বও ছিল এই বিভাগেরই। এই বিভাগ ম্যানেজারের নির্দেশানুসারে তোষাখানা (সংগ্রহশালা), ত্রাণগৃহ এবং ডাক্তারখানাগুলিরও দেখাশোনা করত। বস্তুত ম্যানেজাররা বর্ধমান রাজপরিবারের সমস্ত বিভাগগুলি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রত্যেক বিভাগের সদস্য ও উর্ধ্বতন আধিকারিকেরা এই ম্যানেজার বা সচিবের কাছেই তাঁদের কাজকর্মের খতিয়ান জমা দিতেন ও তাঁদের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করতেন। হিসাবপত্র প্রাথমিকভাবে নিচের স্তরে পরীক্ষার পর আবার ম্যানেজারের দপ্তরে পরীক্ষা হত। কোনো একজন ম্যানেজারের সাক্ষর ছাড়া কোনো অর্থই প্রদান করার ক্ষমতা ব্যয়বিভাগের ছিল না। ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, বাগান সবকিছুই এই ম্যানেজারদের আদেশ

ও তত্ত্বাবধানের ভিত্তিতেই তৈরী করা হত ও পরিচর্যা করা হত। এই বিষয়ে সমস্ত চুক্তি এই ম্যানেজারদের দ্বারাই প্রদত্ত হত।[৭৭]

মহতাব চাঁদের (১৮৭৯) সময়কালে বর্ধমান রাজের তালুক ব্যবস্থাপনার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল রাজকীয় আমলাতান্ত্রিক এলাকার নীতি যা মূলত প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনের মত সরকারি আইনের দ্বারা নির্দেশায়িত হত।[৭৮] পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে বর্ধমান রাজের তালুক ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করা যেতে পারে, যেমন ঃ (ক) আমলাতান্ত্রিক কাঠামোযুক্ত এই তালুক ব্যবস্থাপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপ ছিল সরকারি কাজের সমতুল্য, (খ) তালুক ব্যবস্থাপনার এই সমস্ত কার্যকলাপ নির্বাহ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার অধিকার ছিল আধিকারিকদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বন্টিত এমনকি আধিকারিকদের দমনমূলক নির্দেশ প্রণয়ন করার ক্ষমতাটিও ছিল সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা নির্দেশায়িত, (গ) তালুক ব্যবস্থাপনার এই সমস্ত কার্যকলাপের প্রাত্যহিক নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য ও এছাড়াও আনুসঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য তালুক ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত বন্দোবস্তের আয়োজন করা হয়। এই পদ্ধতিগত বন্দোবস্তের ধারক ও বাহক ছিল রাজকীয় আইনানুযায়ী নির্বাচিত আমলাবর্গ।[৭৯] উপরোক্ত তিনটি বিভাগের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরগুলির জমিদারি আমলাবর্গের সদস্যদের মধ্যে এই সমস্ত কার্যাবলী বন্টিত হত। উর্ধ্বতন দপ্তরগুলি অধস্তন দপ্তরগুলির দেখাশোনা করত এবং পর্ষদ সমস্ত বিভাগগুলি ও অধীনস্থ দপ্তরগুলির ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। লক্ষণীয় বিষয় হল, তালুক ব্যবস্থাপনা আবার নির্ভর করত নিম্নবর্গীয় কর্মচারী ও স্থানীয় সব ধরনের লিপিকর / অনুলেখকদের দ্বারা কৃত আনুষ্ঠানিক নথিপত্রের উপর। বর্ধমান রাজপরিবার অধিগ্রহণের সময় রাজস্ব পর্ষদ তালুক ব্যবস্থাপনার এই সকল নিয়মনীতিগুলি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিদ্যমান তালুক ব্যবস্থাপনাকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব পর্ষদ তালুকের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের প্রণালীকে আরও সরলীকৃত করেছিল এবং বিভাগগুলির অধস্তন কিছু দপ্তরকে সংযুক্ত করেছিল। ফলস্বরূপ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বর্ধমান রাজপরিবারের তালুক পরিচালন ব্যবস্থা একটি সুষ্ঠু 'আমলাতান্ত্রিক' কাঠামো লাভ করেছিল। অন্যদিকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মহারানা মহেশ্বর সিং-এর মৃত্যুর পর রাজস্ব পর্ষদ যখন দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবার অধিগ্রহণ করেছিল, তখন এই রাজপরিবারের তালুক পরিচালন ব্যবস্থা ছিল পতনোন্মুখ। রাজস্ব প্রদান ও তালুকের চলতি ব্যয়ভার বহনের জন্য দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারকে নিয়মিতভাবে ঋণ করতে হয়, রাজস্ব পর্ষদের ধারণা ছিল যে দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের মহারাজা আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে এই রাজপরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত এবং এই অবস্থার পুনরুদ্ধারও সম্ভব হোত না।[৮০] রাজস্ব পর্ষদ দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের এই রকম দৈন্যদশার জন্য তালুক ব্যবস্থাপনায় আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অভাবকেই দায়ী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো কিন্তু বর্ধমান রাজপরিবারের তালুক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ছিল। এই বিষয়ে কোর্ট অব ওয়্যার্ডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃক দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবার অধিগ্রহণের পূর্বে এই তালুকে ঠিকাদারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঠিকাদাররা এই তালুকের অন্তর্গত সব্ব গ্রামগুলির ইজারা নিত।

তালুক পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব আমলাদের উপর ন্যস্ত থাকত। এই আমলারা তাদের বন্ধু, আত্মীয়পরিজনদের মধ্যে কিছু জমি খুব সহজ শর্তে ইজারা দিত আর বাকি জমি বহিরাগতদের চড়া হারে খাজনার ভিত্তিতে ইজারা দিত। এই খাজনার হার এতই বেশি ছিল যে ইজারাদাররা সাধারণত এই খাজনা মেটাতে ইচ্ছুক ছিল না, তবে এই খাজনা মেটানোর জন্য তারা রায়তদের উপর অন্যায্যভাবে খাজনা ধার্য করত ও বেআইনি ভাবে জমি লীজ দিত। খাজনার এক অংশ জামানত হিসাবে অগ্রিম জমা দেওয়ার জন্য রায়তদের উৎসাহ দেওয়া হত না বা পাট্টা বা কাবুলিয়তগুলিরও খুব কমই পরিবর্তন করা হোত। ফলস্বরূপ দেখা গিয়েছিল, এই তালুকের ইজারাকৃত জমির পরিমাণ ছিল প্রচুর, কিন্তু সেই তুলনায় ইজারাবাবদ প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ ছিল একেবারেই নগন্য। ঠিকাদাররা সবসময়ই বকেয়া টাকার জালে জড়িয়ে থাকত। বস্তুত ঠিকাদাররা ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন একেবারেই অপদার্থ, যাদের কাছ থেকে বকেয়া শোধের আশা করা ছিল নিরর্থক।"[৮১]

রাজস্ব পর্ষদ ঠিকাদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে তহশিলদারি ব্যবস্থা (যা পরবর্তীতে 'চক্রবত ব্যবস্থার' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়) প্রণয়নের মাধ্যমে দ্বারভাঙ্গা তালুককে সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের অধীনে পাঁচজন তহশিলদার ও ষোলজন নায়েব তহশিলদারের নিযুক্তির মাধ্যমে দ্বারভাঙ্গা তালুকের কিছু কিছু অঞ্চলে তহশিলদারি ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রচলন করা হয়।[৮২] কিন্তু কালক্রমে গ্রামসংক্রান্ত নথিপত্র প্রস্তুত করা হয় ও গ্রামের 'সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র' লোকেদের ন্যায্য শর্তে জমি ইজারা দেওয়া হয়। এই ইজারাকৃত জমির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য, সম্পূর্ণ ভূ-সম্পত্তির মাত্র কুড়ি শতাংশ। এই ইজারাগুলির ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের উপর শর্ত আরোপ করা হয় যে, তারা কোর্ট অব ওয়ার্ডের নির্দেশ ব্যতীত খাজনার হারের কোন বৃদ্ধি করতে পারবে না। ঠিকাদারদের আবার খাজনা প্রদানকারীদের নামের তালিকা বা জমাবন্দী সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হত।[৮৩]

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তহশিলদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে সার্কেল-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল যথাক্রমে ঃ

(ক) এই ব্যবস্থায় তহশিলদারদের পরিবর্তে অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন সার্কেল আধিকারিকদের নিযুক্তি করা হয় যাদের গুরুত্ব ছিল মোটামুটি ভাবে উপ-ম্যানেজারদের সমতুল্য।

(খ) এই চক্র / সার্কেল আধিকারিকরা জেনারেল ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের তত্ত্বাবধানে নিজেদের চক্রের / সার্কেলের তালুক পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাদিনির্বাহ করত। তাদের কাজের জন্য উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রায়তদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ছিল এই চক্র / সার্কেল আধিকারিকদের।

(গ) পূর্বতন ব্যবস্থায় পাটোয়ারিরা (গ্রামীণ হিসাব-রক্ষক) খাজনা আদায় করত। নতুন ব্যবস্থায় তাদের দায়িত্ব ছিল শুধুই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের।[৮৪] বাস্তবিকই এই চক্র/ সার্কেল-ব্যবস্থা অনুসারে গৃহীত নতুন পদক্ষেপগুলির ফলে এই তালুকে সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত রাজস্ব ও খাজনাকৃত আয়ের যে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রাজস্ব পর্ষদ দ্বারভাঙ্গা তালুকটি অধিগ্রহণ

করেছিল, সে পরিস্থিতিতে রাজস্ব পর্ষদের কাছে এই চক্র / সার্কেল-ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ও ছিল না। যদিও রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক এই চক্র / সার্কেল-ব্যবস্থা প্রণয়ন খুব অল্প সময়ে হয়নি। বস্তুত সংগঠিত জমিদারি আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।[৮৫]

রাজস্ব পর্ষদের কাছে বর্ধমান রাজপরিবারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা ছিল দ্বারভাঙ্গা রাজপরিবারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিপরীত একটি ধারণা ঃ

"প্রথম বর্ধমান রাজ বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব রাজস্ব পর্ষদের কাছে পেশ করল। কোর্ট অব ওয়ার্ডকে বর্ধমান রাজের সম্পত্তির হিসাবনিকেশ দেখাশুনার ক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য রাজস্ব পর্ষদ এই বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবকে একটি নীতি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। বর্ধমান রাজ-তালুকটি অন্যান্য সকল তালুকের তুলনায় সেই সময়ের সবচেয়ে বিত্তশালী ও গুরুত্বপূর্ণ তালুক হিসাবে পরিগণিত হত বা বর্ধমান তালুকটির পরিচালনার দায়িত্ব বিগত বেশ কয়েকবছর যাবৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডের উপরই ন্যস্ত ছিল — শুধুমাত্র এই কারণেই যে বর্ধমান রাজের জন্য এরকম বিশেষ ব্যবস্থার প্রণয়ন করা হয়েছিল তা নয়। বস্তুত বর্ধমান তালুক ও দ্বারভাঙ্গা হাটোয়ার ন্যায় অন্যান্য তালুকগুলির মধ্যে পার্থক্য শুধু মাপে বা মাত্রারই ছিল না, ধরনেরও ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড কোনো তালুকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রায়শই দেখা যেত যে তালুকগুলির হিসাবপত্র থাকত ভুলভ্রান্তিতে ভরা, নথিপত্রগুলি অসম্পূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হত হয় অসঙ্গতিপূর্ণ, নয় অপ্রতুল। সম্পত্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাহীন একজন ব্যক্তিকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হত। কিন্তু বর্ধমান রাজপরিবারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। তালুকের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ খুব সাবধানতার সাথে করা হত। এই হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির সমস্যা (যদি তা আদৌ সমস্যা বলে বিবেচিত হয় তাহলেই) ছিল একটিই তা হল নিয়মিত বিস্তারিত কার্যবিবরণী প্রস্তুত করার অত্যধিক প্রবণতা। এছাড়া এই তালুকের অন্যান্য নথিপত্রগুলিও থাকত সুসংগঠিত এবং সম্পূর্ণ ...."

রাজস্ব পর্ষদের কাছে বর্ধমান রাজ-তালুকটি বিশিষ্ট বলে স্বীকৃত হওয়ার মূল কারণ ছিল এর কার্যকরী ব্যবস্থাপনা। রাজস্ব পর্ষদ এই মর্মে মন্তব্য পেশ করেছিলেন ঃ

"বর্তমান পরিস্থিতিকে কোর্ট অব ওয়ার্ডের এই তালুকে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন নিষ্প্রয়োজন এবং বর্তমান ব্যবস্থাতে কোর্ট অব ওয়ার্ডের নূন্যতম হস্তক্ষেপ করা উচিৎ। যেমন, এই তালুকের জন্য কোনো ব্যয় পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে কৃপণতা না করে অর্থনৈতিক দিকটি বিচার করা উচিৎ এবং ম্যানেজারদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে কার্য সম্পাদনের জন্য তাদের কিছু স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ।"[৮৬]

১৮৮৬ সালে বর্ধমান রাজপরিবারের জমিদারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।[৮৭] পূর্বতন মহারাজা মহতাব চাঁদ (১৮৭৯)-এর সময়কালের জমিদারির প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। গৃহ নির্মাণ বিভাগটির অবলুপ্তি হয়েছিল। ১৮৯১ সালে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইজন ম্যানেজার রাখার প্রথার বিলোপ ঘটে! ফলস্বরূপ কাপুরই একমাত্র ম্যানেজারে পরিণত হন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য তার অধীনস্থ আরও দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয় এবং কোর্ট অব ওয়ার্ড প্রচলিত ব্যবস্থার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এই আয়োজন চালু থাকে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার দুই ম্যানেজারের দায়িত্বের পুনর্বন্টন করে। সাধারণত

ভূসম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল কাপুরের। টি. মিলার অনুমোদিত ব্যয়ের বিষয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাসমাইনে ও পেনশন/অবসরকালীন ভাতার বিষয়সহ বিবিধ বিষয়গুলির দেখাশোনা করতেন। মিলারের পরবর্তী যখন এইচ. আর. রেইলি ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হলেন তখন ১৮৮৫ সালের দায়িত্ব বন্টন প্রণালী যথাযথ বলে প্রতিপন্ন হল। ফলস্বরূপ ১৮৮৫ সালে রাজস্ব পর্ষদ ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে রেইলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। পর্ষদের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী রেইলি এখন থেকে খাস ভূসম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, তবে কলকাতা বাজারস্থিত ভূসম্পত্তি ও দার্জিলিং-এ বর্ধমান রাজের ঘরবাড়ি, মন্দির এসবের দায়িত্ব তার আওতার বাইরে রাখা হয়। আর কাপুরের দায়িত্বে থাকল তালুকের বাকি সকল দপ্তর তত্ত্বাবধানের ভার। এক্ষেত্রেও সেই বিষয়গুলি কাপুরের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হল যেগুলি দুই ম্যানেজার যৌথ ভাবে নির্বাহ করতেন।[৮৮] ১৮৯১ সাল থেকে ম্যানেজার ও দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মধ্যে নতুনভাবে দায়িত্ব বন্টিত হয়। এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী বাবু শ্রীনাথ দত্তের (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের একজন) ওপর ন্যস্ত হয় খাসমহল দেখাশোনার দায়িত্ব, আর দ্বিতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বাবু আশুতোষ সেনের উপর ন্যস্ত হয় আইনি বিষয়াদি নির্বাহের দায়িত্ব।[৮৯] লক্ষনীয় যে দুজন সহকারী সচিবের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন দুই সচিবের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, যা কোর্ট অব ওয়ার্ডের তালুক ব্যবস্থাপনার স্থায়িত্ব আনায় সফল হয়। এই পরিবর্তন বর্ধমান রাজের জমিদারি আমলা নির্ভর চরিত্রটিকেই চেনায়। বলতে গেলে উনিশ শতকের শেষে বাংলার তালুকদারি প্রথা ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থারই অনুবর্তী। এই তালুকদারি এত উন্নত ছিল যে তা ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার যেকোনো পরিবর্তনের সঙ্গে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারত। জমিদাররা জমির মালিক, এই মর্যাদার অধিকারী আর রইলেন না।[৯০] মর্যাদার এই অবলুপ্তিকরণ মূলত হয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রসার ও জমিদারদের এই নতুন ব্যবস্থার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার দরুন, গ্রামাঞ্চলে বিরোধীগোষ্ঠীর উদ্ভবের জন্য নয়।

৩.৩ খাসমহল পরিচালন ব্যবস্থা ঃ কুজাঙ, কটক

কুজাঙ ও সুজামুতা এই দুই খাসমহলের পরিচালন ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা পত্তনি ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবনে সমর্থ হব, এর ওপর বর্ধমান রাজপরিবারের খাজনা আদায়ের বিষয়টি ভীষণভাবে নির্ভর করত।

কুজাঙের প্রকৃত রাজারা ছিলেন ধোবাইগড়-এর মহারাজা মালিক সেন্ধ-এর বংশধর। তালুক পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বতন অধিকর্তাদের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। যদিও ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষকে এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে খাজনাকৃত আয়ের পরিমাণ ৬৪,০০০ টাকা থেকে কমে ২৬,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ফলস্বরূপ ১৮৬৮ সালে এই তালুকটি কটকের অধস্তন জজ কোর্ট দ্বারা নিলামে বিক্রিত হয় এবং বর্ধমান রাজ ছিলেন এই তালুকটির ক্রেতা।[৯১]

৩.৩.১ কৃষিকাজ

কুজাঙ তালুকের দুটি অংশ। প্রথম অঞ্চলটি ছিল সমুদ্রতট সংলগ্ন সরু এবং বসবাসের

অযোগ্য ভূখন্ড, আর দ্বিতীয় অঞ্চলটি ছিল সমুদ্রতটের অনতিদূরের নীচু কর্ষণযোগ্য জমি যেখান দিয়ে বেশ কিছু নদী প্রবাহিত হত ও জোয়ারের জলে এই অঞ্চল প্লাবিত হত, এই জোয়ারের জলই শীতকালে সেচকার্যে ব্যবহৃত হত।[৪২] ১৮৯০-এর গোড়ার দিকে এই অঞ্চলের জনঘণত্ব ছিল খুব সামান্য, প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১৫৮ জন।[৪৩] ১৮৯১-৯২ সালে মোট জমির মাত্র ৫৪.৩ শতাংশতেই চাষাবাদ হত। স্বল্প জনবসতি এবং কম কৃষিজমি ছিল এই তালুকের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। মূলত ভূ-প্রকৃতির জন্য এই তালুকের কৃষি পদ্ধতিও ছিল প্রথাগত।[৪৪] আমন ধান ছিল প্রধান কৃষিজাত শস্য। গুরু সরধ ও লঘু সরধ এই দুই ধরনের আমন ধান এই তালুকে উৎপাদিত হত। দীর্ঘ কাণ্ডযুক্ত আমন ধানের গাছকে বলা হত গুরু আমন যা উৎপাদিত হত মূলত লঘু আমন ধানের থেকে নীচু জমিতে। গুরু আমন ধানের বীজ বপন বা রোপণ কার্য চলত মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত এবং নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে ধান কাটা হত, আর লঘু আমন ধান ঐ একই সময়ে বপন করা হলেও কাটা হত আগেই, সাধারণত অকটোবর মাসে।[৪৫] অর্থকরী শস্য পাট এ-অঞ্চলে উৎপাদিত হত না। গোবর সার ছাড়া আর কোনো সার কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হত না।[৪৬] পুরো তালুকের মধ্যে শুধু পালণ্ড অঞ্চলই প্লাবিত হত না। নদীর পলি দিয়ে তৈরি পালণ্ড অঞ্চলগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু। পালন্ড অঞ্চল আবার দু'ধরনের হত। যথা বিলিচর ও উঠিয়াচর। বিলিচর পালণ্ড অঞ্চলগুলি প্রতি তিনবছর অন্তর একবার করে পরিমাপ করা হত। এই বিলিচর পালণ্ড অঞ্চলগুলি কৃষিকাজের জন্য রায়তদের দেওয়া হত, আর তাদের নাম খাজনা প্রদানকারী রায়তের তালিকা বা উঠবন্দী নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হত। উঠিয়াচর পালন্ড অঞ্চলগুলি নীলামে বিক্রী করা হত। নিলামে সবচেয়ে বেশি দাম যে দিতে পারত সেই এই অঞ্চলগুলির ইজারা পেত এবং তারা সেই ভূখণ্ডগুলি রায়তদের খাজনার বিনিময়ে চাষ করার জন্য দিত। এই ধরনের ভূখণ্ডগুলি গোচারণ ও কৃষিকাজ উভয় কাজেই ব্যবহৃত হত।[৪৭] পালণ্ড অঞ্চলের কৃষিকাজ প্রকৃতপক্ষে ছিল অনিশ্চিত। কারণ, কোনো এক বছরে যদি পালণ্ড অঞ্চলের কোনো ভূখণ্ড নদীর পলির ফলে উর্বর হত তো পরের বছর বালির জন্য সেই ভূখণ্ডই অনুর্বর ও কৃষিকাজে অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকত। ফলস্বরূপ, পালণ্ড অঞ্চলের ভূভাগকে কেউই নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ বছরের জন্য লীজ নিত না।[৪৮] এজন্যই এই তালুকে ভোগদখলকারী প্রজাদের সংখ্যা ছিল কম। একমাত্র শস্য আমন ধানের উৎপাদনও শর্তায়িত ছিল ভূপ্রকৃতিগত কারণে, এছাড়াও সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাতো ছিলই।

৩.৩.২ খাজনা সংগ্রহ ব্যবস্থা ঃ তালুক ও রায়তদের সম্পর্ক

এই তালুকের রায়তরা তিনভাগে ন্যস্ত ছিল। যথা থানি, পাহি এবং চাঁদনা। থানিদের সাধারণত খাজনামুক্ত বাসভূমি ছিল, তবে অনেককেই বাসভূমির জন্য স্বল্প পরিমাণ খাজনা দিতে হত, এছাড়া তারা যে পরিমাণ জমি চাষ করত তার জন্য খাজনা দিত। পাহিরা যে গ্রামে কৃষিকাজ করত সে গ্রামে তাদের নিজস্ব কোনো খাজনামুক্ত বাসভূমি ছিল না। তারা থানি রায়তদের মত সুযোগসুবিধা যেমন ভোগ করত না, তেমনই ইজারাদারদের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। পরিযায়ী কৃষক হওয়ার দরুণ তারা

কম হারে খাজনার ভিত্তিতে জমি পেলেও তারা কোনো তালুকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। যে গ্রামে তারা চাষাবাদ করছে সে গ্রামে যে তাদের বাসস্থান বা বাসভূমি থাকবে না এই ঘটনাটা যেন স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েগেছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনকালের সূচনালগ্ন থেকে যে গ্রামে তারা কৃষিকাজ করত সে গ্রামে স্থায়ী বাসস্থান নির্মান ধীরে ধীরে শুরু করেছিল। স্থায়ীভাবে এক গ্রামে অনেক দিন বাস করার ফলে তারা অন্যান্য গ্রামবাসীদের মত সম মর্যাদা পেলেও থানিদের সমতুল্য তারা ছিল না। কারণ, বাসভূমির জন্য যথাযথ খাজনা তাদের দিতে হত, যা কিন্তু থানিদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল না। এক গ্রামে বসবাস করে অন্য গ্রামে কৃষিকাজ করত এই ধরনের রায়তদেরকেও পাহি বলা হত। তৃতীয় ধরনের রায়ত অর্থাৎ চাঁদনা বলা হত তাদের যারা গ্রামে বাস করত এবং বাসভূমির জন্য নির্দিষ্ট খাজনা দিত কিন্তু তাদের চাষবাষের জন্য জমি ছিল না। চাঁদনারা মূলত ছিল তেলি বা ওই ধরনের ব্যবসায়ী জাতির মানুষ।[৯৯] কৃষিকাজের জন্য সেই সময় নতুন জমির লভ্যতার দরুন বেশ কিছু পরিযায়ী কৃষক সেই জমিগুলি চাষাবাদে আগ্রহী ছিলেন। জমিদাররা সম্ভবত তাদের উৎসাহ প্রদান করত দীর্ঘমেয়াদী কৃষিকাজের জন্য। জমিদারদের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোনে এই উৎসাহ প্রদানের মূল কারণ ছিল ভ্রাম্যমান কৃষকদের কাছ থেকে বিশেষ করে পাহিদের কাছ থেকে খাজনা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা।[১০০] থানি ও পাহিদের মধ্যে বাসভূমির জন্য প্রদেয় খাজনার যে বিস্তর ফারাক ছিল তার মূল কারণ ছিল জমিদারদের স্থায়ী কৃষকদের প্রতি আগ্রহ। বস্তুতঃ স্থায়ী কৃষক হলে জমিদারদের পক্ষে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটি অনেক সহজ হত ভ্রাম্যমান কৃষকদের তুলনায়।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সব থানি রায়ত (যারা ন্যুনতম নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিন বছর কৃষিকাজ করেছে) ও পাহি রায়তদের (যারা এক নাগাড়ে ছয় বছরের বেশি কৃষিকাজ করেছে) ভোগদখলকারী রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[১০১] মোট রায়তদের মাত্র ৬৯ শতাংশ। এই স্বল্পতার মূল কারণ ছিল পাহি রায়তদের অবস্থিতি। এছাড়া এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মূলতঃ পালগু জমির উদ্ভব[১০২] এই স্বল্পতার জন্য দায়ী ছিল।

খাজনা সংগ্রহের পদ্ধতিটিও ছিল লক্ষ্যনীয়। জমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণ ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বাবধি এই তালুকের খাজনা আদায় ব্যবস্থা ছিল পূর্বতন রাজার রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। জিম্বাদারি ব্যবস্থাটি ছিল মোটামুটি এরকম ঃ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কৃষিযোগ্য সমস্ত জমি তিন বছরের জন্য লীজ দেওয়া হত স্থানীয় মানুষদের যাদের বলা হত জিম্বাদার। এই জিম্বাদারি লীজ ছিল মোটামুটি দু'ধরনের, যথা — পালগু ও মৌজাওয়ারি। পালগু লীজ-এর ক্ষেত্রে জমি নিলামে বিক্রি করা হত এবং ইজারাদাররা যেমন খুশি হারে খাজনা ধার্য করতে পারত বা ইজারাকৃত জমি থেকে যে কোনো সময় রায়তদের বিতারিত করতে পারত, এব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। মৌজাওয়ারি লীজের ক্ষেত্রে জিম্বাদারদের খাজনা ধার্যের ব্যাপারটি শর্তাধীন ছিল। লীজ নেওয়ার সময় যে জমি রায়তরা চাষ করত, তাদের সকলের নাম ও দেয় খাজনার পরিমাণের তালিকা বা জমাবন্দীভুক্ত থাকত। এই জমাবন্দী জিম্বাদারদের বাধ্যতামূলকভাবে মান্য করতে হত। অবশ্য লীজকৃত সময়ের ব্যবধানে জিম্বাদাররা যদি কোনো পোড়ো জমিতে

কৃষিকাজ করতে সক্ষম হত, তাহলে সেই জমির ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্বের ওপর কোনো বাধা নিষেধ আরোপিত হত না। লীজের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো পতিত জমিও এই জিম্বাদাররা যেমনভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারত। সাধারণত তারা এই পতিত জমিকে পুনরায় ইজারা দিত, আর যদি তাতে অসমর্থ হত তাহলে সেই গ্রামের মানুষদের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করত বা তালুকের স্বার্থের হানি ঘটাতে সচেষ্ট হত।[১০৩] জমি জরিপ ও রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হওয়ার পূর্বে কুজাঙ তালুকটিতে ৩৪৭ জন জিম্বাদার ছিলেন। তারা তিন বছরের মেয়াদে নেওয়া গ্রামগুলির লীজ বাবদ বকেয়া জমা অর্থ মিটিয়ে দিতেন। তালুকের সার্বিক সংগৃহীত আয়ে তাদের অবদান ছিল ৭ শতাংশ।[১০৪] ১৮৮৮-৯১-এ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি বলবৎ হওয়ার সময় এই তালুকে মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৬১টি। সুতরাং প্রত্যেক জিম্বাদারের উপর গড়ে ১.৩ করে গ্রামের দায়িত্ব থাকত। বস্তুত গ্রাম প্রধানের[১০৫] দায়িত্বও এই জিম্বাদাররাই পালন করত। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে এই তালুকে খাসমহলের জন্য নতুন পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্বতন দ্বিবিধ রায়তি ব্যবস্থা থানি ও পাহিরূপে বাতিল হয়। এই তথ্য নতুন খাসমহল পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কুজাঙ সেটেলমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই জিম্বাদারি ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই ব্যবস্থার নিজস্ব আয়ের সংস্থান বৃদ্ধিতে অক্ষমতা। রায়তের বকেয়া খাজনা আদায়েও এব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল আর এসবই 'সার্টিফিকেট প্রথার'-র প্রয়োজনীয়তাকে এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কমিয়ে এনেছিল। এই রিপোর্ট আরও বলে যে নিরক্ষরতার দরুন জিম্বাদাররা নথি-পত্র ঠিকমতো গুছিয়ে রাখতে পারত না।[১০৬]

পত্তনি ব্যবস্থার প্রাধান্য বর্ধমান অঞ্চলে থাকা সত্ত্বেও কেমনভাবে এই তালুকে খাস মহল ব্যবস্থাপনা চালু হল এবং এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা বর্ধমান তালুকের রাজস্ব সংক্রান্ত আয়ে কিরকম প্রভাব ফেলেছিল, তা আলোচনার দাবি রাখে। অস্থির ও কম কৃষিজাত উৎপাদন এবং প্রচুর পোড়ো ও পালন্ড জমির কৃষিকাজের ভান্ডারে আনা সম্ভব এরকম পরিস্থিতিতে খাসমহল ব্যবস্থাপনাই ছিল খাজনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কৃষিজাত আয় সংগ্রহ করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কৃষি উৎপাদনে মন্দা দেখা দিলে মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারাও রায়তদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনা আদায় করা জমিদারদের পক্ষে সম্ভব হত না। জিম্বাদারদের সুনির্দিষ্ট কোনো বেতন ছিল না। বস্তুত তাদের আয় নির্ভর করত তারা যে পরিমাণ খাজনা সংগ্রহ করতে পারত তার উপর। তাদের প্রাপ্য ছিল মোট সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৭ টাকা। এর থেকে এটাও প্রমানিত হয় যে জিম্মাদাররা কখনই নির্ধরিত খাজনা জমা করতে পারত না। যে সকল জমিদারি ব্যবস্থা সরাসরি নিজের তালুকি ব্যবস্থা পরিচালনা করত তারা কৃষিকাজের আওতাধীন যে কোনো জমির উপর কর ধার্য করতে পারত। কুজাঙ তালুকটি ক্রয় করার সময় থেকে বর্ধমান রাজপরিবার জিম্মাদারী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল, কারণ সেই সময়ে বর্ধমান রাজ-তালুকের কাছে (১৮৯০ সালে জমি জরিপ ও রাজস্ব ধার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিসমাপ্তির পূর্ববিধি) জমির সত্ত্ব বা খাজনার হার সংক্রান্ত কোনো সুষ্ঠু তত্ত্ব ছিল না। এই তালুককে তাই খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে জিম্মাদারদের উপরে নির্ভর করতে হত।[১০৭] দ্বিতায়ত, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির[১০৮] সাথে সাথে ভ্রাম্যমান কৃষকরা অর্থাৎ পাহি রায়তরা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়। এর ফলে রায়তদের উপর

তালুকের কর্তৃত্ব স্থাপনে সুবিধা হয়েছিল। তৃতীয়ত, বর্ধমান রাজপরিবার বহিরাগত হওয়ায় স্থানীয় ভূস্বামীদের রায়তদের উপর পিতৃসুলভ আচরণ দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়নি।

এই রাজ পরিবারের সবচেয়ে পুরানো সম্পত্তি যা শুধু বর্ধমান অঞ্চলটুকু নিয়ে পরিব্যপ্ত ছিল, সেই অঞ্চলে প্রচলিত পত্তনি ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তিনটি কারণের পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে।

৩.৩.৩ কুজাঙ কার্যালয় ও তহশিলদারি প্রতিষ্ঠান

কুজাঙ তালুকের মোট জমির পরিমাণ ছিল ২৩৬,৮৭৮ একর, যার ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১৪৬, ৮৫৬ একর পরিমাণ জমির জরিপ ১৮৮৮-৯০ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়। আর জমিগুলি ছিল জঙ্গল না হয় নদী সংলগ্ন এলাকা। এই জরীপিকৃত জমির খাজনা নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে।[১০৯] খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে কুজাঙ কার্যালয় ও তহশিলদারি প্রতিষ্ঠান বিন্যস্ত হয়েছিল জমি জরিপের খতিয়ান (জমিস্বত্বের অধিকার সংক্রান্ত নথিপত্র) অনুসারে। এই রকম আয়োজন শুধু জরীপিকৃত ভূভাগের জন্যই করা হয়েছিল, আর তাছাড়া অন্য কোনো অধিগৃহীত জমির খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই আয়োজন প্রযোজ্য হত। খাজনা সংক্রান্ত আয়ের বৃদ্ধি নির্ভর করততহশিলদারি ব্যবস্থার এই আয়োজনের ফলে অধিগৃহীত নতুন জমির (যা পূর্বে লীজ দেওয়া হয়নি) পরিমাণের উপর। বর্ধমান- স্থিত ম্যানেজার কুজাঙ এর সাব- ম্যানেজারকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল নিম্নরূপঃ

> "যদি কোনো ব্যক্তি লীজ না নেওয়া অন্য কোনো জমি দখল করেন বা কোনোভাবে তা অধিকার করেন তাহলে সেই ব্যক্তিকে উক্ত জমির জন্য স্বাভাবিক খাজনার তুলনায় তিনগুণ অধিক হারে খাজনা দিতে হবে।"[১১০]

কুজাঙ কার্যালয়ের মূল বিভাগগুলি ছিল হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, তথ্য সংরক্ষণ ও মুন্সী বিভাগ। জঙ্গল সংক্রান্ত সম্পত্তির দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল জঙ্গল বিভাগের।[১১১]

সাব-ম্যানেজার জমির পাট্টা সংক্রান্ত তথ্যাদির সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহসিল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন। আইন দ্বারা নির্দেশিত বিভিন্ন তথ্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ প্রস্তুতিকরণের[১১২] জন্য সময়মতো তালুকগুলির হিসাব ও মাসিক তদন্ত রিপোর্টগুলি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। বলা হয়, এগুলির উপরই নির্ভর করত তালুক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা। তার আবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল তহশিলদারের দায়িত্ব ও তথ্য সংরক্ষণ-এর দায়িত্বের পৃথকীকরণের দাবি। তিনি আরও আবেদন করেছিলেন যে তহশিলদারের অধীনে আরেকটি বিভাগ খোলার। এই বিভাগ আমিন (পরিদর্শক) ও শেকলদার এমন কিছু কর্মচারীদের নিয়ে জমি জরিপ সংক্রান্ত তথ্যাদির সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। বস্তুত নির্দিষ্ট সময় অন্তর জমি জরিপ সংক্রান্ত এই সকল তথ্যাদির প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে ভীষণভাবেই অনুভূত হচ্ছিল।

৩.৩.৪ কুজাঙ তালুকের খাজনাকৃত আয়ের সঞ্চালন

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই তালুকের আয় পূর্বতন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের চেয়েও বেশি আয় সূচিত

করেছিল। পরিবর্ধিত খাজনাকৃত আয়ের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮০০ টাকা। যদিও ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৯ সময়কাল পর্যন্ত এই তালুকের আয় কমে গিয়েছিল কারণ, এই সময়ে দোয়াগের মহারাণী ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের মধ্যেকার কর্তৃত্বের সংঘর্ষের দরুন রায়তরা তাদের প্রদেয় খাজনা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। খাজনাকৃত আয়ের এই ব্যাপক তারতম্য খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের নিয়ন্ত্রণকেই সূচিত করেছে। এই বিষয়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তক্ষেপের সময়কার একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে রাজস্ব পর্ষদের কাছে খবর আসে যে দোয়াগের মহারাণী কুজাঙ তালুকের ম্যানেজার ও নায়েবদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছেন। রাজপরিবারের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে রাজস্ব পর্ষদের কাছে খাজনা প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ও খাজনা মকুবের প্রার্থনা জানায়। যদিও কিছু রায়ত এব্যাপারে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল এবং অল্প কয়েকজন সরাসরি মহারাণীর পক্ষ নিয়েছিল।[১১৩] বলা বাহুল্য, এসবের ফলস্বরূপই ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৯ সাল এই সময়কাল পর্যন্ত খাজনাকৃত আয়ের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। ১৮৮৭-৮৮ সালে খাজনাকৃত আয়ে যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি হয়েছিল, তা ঘটেছিল মূলত জিম্বাদারদের পরিবর্তে সার্টিফিকেট পদ্ধতি প্রণয়নের ফলে। ১৮৮৭-৮৮-এর পরবর্তী সময়কালে সার্টিফিকেট মূলত বকেয়া খাজনা ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত এবং এগুলি বেশীরভাগই অসম্পূর্ণতার জন্য বাতিল হয়ে যেত।[১১৪] অবশ্য খাজনাকৃত আয়ের তারতম্য অন্যত্র কোথাও যদি এসবের জন্য না হত তাহলে সে ক্ষেত্রে আয়ের তারতম্যতার মূল কারণ ছিল কৃষি কাজের অস্থির প্রকৃতি এবং কৃষিপণ্যের কম উৎপাদন।

খাজনাকৃত আয়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই পরিমাণ, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মন্দা সত্ত্বেও, বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২১৪,৪০৫ টাকায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কুজাঙ তালুকটির মোট আয় ছিল মোট সংগৃহীত খাজনাকৃত আয়ের ৬০.৬ শতাংশ। এই আয় ছিল সেই সময়ে বর্ধমান রাজপরিবারের অধীন সমস্ত জমিদারির মধ্যে সর্বোচ্চ। ব্রিটিশ সরকারের নির্ধারিত রাজস্বের হার ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যে কোনো তালুকের আয় বৃদ্ধি নির্ভর করত মোট সংগ্রহের উপর। ১৯৩২-৩৩ সালে কুজাঙ তালুক ১১৬,০৯৮ টাকা বাকি রেখে ১৮০,৪৯৯ টাকা খাজনাকৃত আয় হিসাবে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এই আয়ের পরিমাণ সরকারি রাজস্বের প্রায় ২৫ গুণ বেশী ছিল। এরফলে কুজাঙ প্রদেশের বৈভব নিঃসন্দেহে অনেক বেড়ে গিয়েছিল।[১১৫]

৩.৪ খাসজমির ব্যবস্থাপনা ঃ সুজামুতা, মেদিনীপুর

সুজামুতা পরগণাটি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই পরগণার আয়তন ছিল ৪৫ বর্গ মাইল। প্রাচীন সূত্র অনুযায়ী হিজলীর অধিকর্তা বাহাদুর খানের দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার ব্যক্তিগত পরিচারক ও দেহরক্ষী গোবর্ধন রঞ্জাকে সুজামুতা পরগণাটি দান করেন, ঠিক যেভাবে তিনি দান করেছিলেন মগ্নমুঠা অঞ্চল ও জলমুঠা অঞ্চলগুলি যথাক্রমে তার কেরানি ঈশ্বরী পাটনায়েক ও পাচক কৃষ্ণপদকে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই তালুকটি দেওয়ানি আদালতের নির্দেশে আয়োজিত নীলামে মহারাজা মহতাব চাঁদ ৫.২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেন।[১১৬]

৩.৪.১ কৃষিকাজ

সুজামুতা তালুকের ভূভাগ ছিল সমতল পলিমাটির। এই অঞ্চল দিয়ে নৌযাত্রার উপযোগী দুটি নদী যথা হুগলি ও রসুলপুর প্রবাহিত ছিল। এছাড়াও ছিল জোয়ারের জলে পুষ্ট বেশ কিছু খাল যেগুলির বেশিরভাগ উক্ত নদী দু'টিতে মিশেছিল। এই সমতল ভূমি খুব উর্বর ও ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, বাঁধ নির্মাণ কার্য এই অঞ্চলের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে বিবেচিত হত। সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ারের জল থেকে কৃষিকাজ সুরক্ষিত রাখার জন্য বড় বড় সামুদ্রিক বাঁধ বা ছোট বাঁধ প্রয়োজনীয় হত এবং সেগুলি নিয়মিত নির্মিতও হয়েছিল। এছাড়া বন্যার জল রুখতে বা স্বল্প বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করা হত। বিশেষত সুজামুতা তালুকে এরকম অনেক খাল এবং ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করা হত। ছোট ছোট খালগুলিকে সাধারণত গ্রামাঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থার মতো ব্যবহার করা হত যা যুক্ত থাকত কলাবেরিয়া খালের সাথে। ছোট ছোট খালগুলিকে আবার বাঁধ দিয়ে ঘেরা থাকত, এরফলে খালের দুধারের কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বন্যার প্রকোপ থেকে বাঁচানো যেত। আর গ্রামভেড়িগুলো আসলে ছিল ছোট বাঁধ যেগুলি ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলের (যা বৎসরে অন্তত একবার হতই) থেকে কৃষিজমিগুলিকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যবহৃত হত। ভেড়ির বাঁধগুলি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের কৃষিজমি পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হত, আর জনগণ এই বাঁধগুলি বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগের রাস্তা হিসাবে ব্যবহৃত করত।[১১৭] সুজামুতা তালুকের ভূভাগ উর্বর হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কৃষিকাজ মূলত নির্ভর করত এই জটিল খাল ও বাঁধ নির্মাণ কার্য-সম্বলিত সেচ ব্যবস্থার উপর। নিয়মিত বাঁধ নির্মাণ কার্যের ফলে স্বাভাবিকভাবেই নদীগুলিতে পলি জমা হওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি হয়েছিল, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল আরও ছোট ছোট খালের। এসবের ফলে বাঁধগুলিতে মাঝে মাঝেই ফাটল দেখা দিত এবং পরিণতিস্বরূপ এই অঞ্চলে মাঝে মাঝেই বন্যার প্রকোপ পরিলক্ষিত হত। এই তালুকের সমুদ্রের জোয়ার প্রভাবান্বিত এলাকায় জোয়ার ও ভাঁটার ফলে আগত পলি ক্রমশ সঞ্চিত হতে হতে নদী ও বাঁধ-এর মধ্যবর্তী নিচু ভূমিকে ও নদীতীরগুলিকে উঁচু করে দিচ্ছিল, জমির প্রাকৃতিক উপরিতল ক্রমশ তার সামঞ্জস্য হারাচ্ছিল এবং বাঁধ দিয়ে ঘেরা অঞ্চলের জমি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় ক্রমশ নীচু হয়ে যাচ্ছিল।[১১৮] এই অঞ্চলের জলনিকাশী ও সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভীষণ দুরুহ এক কাজ, যা পালন করা থেকে সরকার এবং জমিদার উভয়ই নিবৃত্ত থাকত।[১১৯] এই অঞ্চলের রায়তরা তাই নিয়মিতভাবে জোয়ার ও ভারী বর্ষণের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত।[১২০] তৃতীয়ত, নতুনভাবে কৃষিকাজ সম্ভব হত বিশেষত বিংশ শতকের গোড়ার দিকে শুধুমাত্র নতুন জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে। যা জলপাই (তৈলাক্ত জমি) নামে পরিচিত ছিল।[১২১] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৭১০ জন। নতুন অধিগৃহীত জমিগুলিতে কৃষকদের সমাগমের ফলে জনসংখ্যা ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে শতকরা ১০.৬ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১২২]

১৯০৩-১১ সালের সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী এই অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত পণ্য ছিল ধান যা এই অঞ্চলের মোট কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ৯১ শতাংশ অঞ্চলে উৎপাদিত

হত। মোট ধান উৎপাদিত অঞ্চলের ৮৫ শতাংশ অঞ্চলে শুধুই আমন ধান উৎপাদিত হত। পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী শস্য হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে কদাচিৎ উৎপাদিত হত, যদিও পূর্ববঙ্গের কিছু জেলায় বা অন্যান্য অঞ্চলে সেই সময় পাট চাষ হত।

৩.৪.২ তালুকদারি

বর্ধমান রাজের ম্যানেজার কাপুরের মত অনুযায়ী সুজামুতা তালুকের রায়তরা ছিল ভীষণই মামলা-মোকদ্দমা প্রিয়।[১২৩] তার কমপ্লিশন রিপোর্টে (১৯০২) তিনি নির্দিষ্ট করে মন্তব্য করেছেন যে, বর্ধমান রাজ ও রায়তদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক। ব্যতিক্রম ছিল সুজামুতা তালুকটি। এই তালুকের রায়তরা বেশিরভাগই ছিল 'অবাধ্য ও মামলাবাজ'।[১২৪] বস্তুত এই তালুকের রায়তদের এই মামলামোকদ্দমা প্রিয়তার কারণ লুকিয়ে ছিল এই অঞ্চলের কৃষিকাজের প্রকৃতির মধ্যে। দুরূহ সেচ ও নিকাশি ব্যবস্থানির্ভর কৃষিকাজ অনিশ্চিত কৃষি উৎপাদনের জন্য দায়ী ছিল, ফলে কৃষি উৎপাদনে মন্দা দেখা দিলে বর্ধমান রাজকে রায়তদের প্রদেয় খাজনা মকুব করে দিতে হত। বকেয়া খাজনা মকুব করার ঘটনা এই অঞ্চলে মোটামুটি একটি প্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণত হয়েছিল, পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হলে রায়তরা প্রায়ই তাদের দেয় খাজনার পরিমাণে যুক্তিগ্রাহ্য ছাড়ের জন্য আর্জি জানাত। সুজামুতা তালুকের ৬৬টি গ্রামকে পাকি মহল ও কাঁচি মহল এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পাকি মহল অঞ্চল ছিল তুলনামূলক উচ্চভূমি সম্বলিত, ফলে সাধারণত এই অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ দেখা দিত না। এই অঞ্চল প্রধাণত সুজামুতা তালুকের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলের রায়তদের প্রদেয় খাজনার পরিমাণ ছিল নির্দিষ্ট। এরা প্রদেয় খাজনা মকুবের জন্য দাবি জানাতে পারত না। অপরপক্ষে সুজামুতা তালুকের দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগের অপেক্ষা নীচু ভূভাগে অবস্থিত ছিল কাঁচি মহলগুলি। খালগুলি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে এই অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যেত। এই কারণে এই অঞ্চলের রায়তদের খাজনা নির্দিষ্ট ছিল না এবং প্রকৃতিগত কোনো কারণে জমি অনাবাদি অবস্থায় ফেলে রাখার পরিস্থিতি হলে রায়তদের খাজনা মকুব করে দেওয়া হত। যেহেতু খাজনা মকুব ঘটনাটি একটি প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল, সেহেতু ১৮৮৯-১৮৯১-এর জমি জরিপ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সময়কালে সোলেনামা[১২৫] (লিখিত চুক্তিপত্র) খাজনা মকুবের ব্যাপারটি নিয়মের সংকলন করা হয়।

সুজামুতা তালুক পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৮৮৯-৯১ সালে জমি জরিপ ও কর ধার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির গুরুত্ব নিম্নরূপঃ

(১) বর্ধমান রাজ এই ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে জমি সংক্রান্ত সঠিক মানচিত্র, নির্ভরযোগ্য জমিস্বত্বের তথ্য এবং রায়তদের সঠিক পরিসংখ্যান প্রাপ্ত হয়।[১২৬]

(২) ধান উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে পাকি ও কাঁচিমহল এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কাঁচি মহল অঞ্চলে বর্ধমান রাজ সোলেনামা অনুযায়ী রায়তদের খাজনা মকুবের শর্তাদিতে সহমত পোষণ করে।

(৩) বেশ কিছু সংখ্যক আবওয়াব-এর নাম বাদ দেওয়া হয়।

(৪) খাজনা প্রদায়ী রায়তদের নথি তৈরির ব্যাপারটি আপোষে মীমাংসিত হয়।

এর ফলস্বরূপ বর্ধমান রাজ রায়তদের খাজনা প্রদান করার ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং নতুন খাজনার হারের নথি অনুযায়ী রায়তদের খাজনা প্রদানে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা সুজামুতা তালুক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি প্রাপ্তির সমতুল্য ছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে তালুক পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে সুজামুতা তালুকের কৃষিব্যবস্থার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সাযুজ্যতা প্রাপ্ত হয়েছিল। সুজামুতা তালুকের পরিচালনা সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই তালুকের খাজনাকৃত আয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাপুর ১৮৯১ সালে মন্তব্য করেছেনঃ

"এটা আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, এই তালুকের বাৎসরিক জমা-খরচের হিসাব দেখে লাভের অঙ্ক নিরূপণ করা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। কারণ এই তালুকের খাজনাকৃত আয় ভীষণই অস্থির প্রকৃতির। তা মূলত নির্ভর করে উৎপাদনের সম্ভাবনার ওপর সোলেনামার (খাজনা সংক্রান্ত লিখিত চুক্তিপত্র) ৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে মকুবিকৃত খাজনার পরিমাণের উপর। একই রকমভাবে, এই প্রদেশের সুষ্ঠু জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নির্মান ও সংস্কার কার্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণেরও তারতম্য ঘটত।"[১২৭]

১৮৯১ সালে জোয়ারের জলে কৃষিকাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন এই তালুকের খাজনাকৃত আয় ছিল মোট সংগৃহীত আয়ের ১৮.৪ শতাংশ, যদিও সাধারণ পরিস্থিতিতে বর্ধমান রাজের এই তালুক থেকে যে কোনো বৎসরের আয়ের তুলনায় এর পরিমাণ কম ছিল। ১৮৮৯-৯১ সালে জমি জরিপ ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হওয়ার পরে নতুন হারে নির্ধারিত খাজনার ভিত্তিতে তৈরী করা খাজনা-তালিকা অনুযায়ী এই তালুকের খাজনাকৃত আয় হওয়ার কথা ছিল ৮১,২৩৫ টাকা পুরানো খাজনা-তালিকা অনুযায়ী এই আয়ের পরিমাণ ছিল ৯২,৬০৩ টাকা। বেশ কিছু সংখ্যক আবওয়াব-এর নাম বাদ যাওয়া এবং বর্ধমান রাজের জমি সংক্রান্ত সঠিক নথিপত্রের দরুন খাজনা-তালিকা অনুযায়ী প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ কম হয়েছিল। এই নতুন খাজনা-তালিকা বর্ধমান রাজ- পরিবারকে তার প্রাপ্য খাজনা আদায়ে সক্ষম করেছিল। এই ঘটনা ছিল পূর্বতন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ব্যাপার। পূর্বে যে পরিমাণ খাজনা ধার্য করা হত (যা বর্তমানের তুলনায় অনেক উচ্চ হারে নির্ধারিত হত) তা বাস্তবে আদায় করা সম্ভব হত না।[১২৮]

খাজনা সংগ্রহ

১৮৮০-র দশকের শেষভাগে সুজামুতা তালুকের জন্য যে খরচ করা হয়েছিল তা মূলত (অর্ধেকের বেশী) করা হয় মফস্বল সংগ্রহশালার তহবিল থেকে। এই সময়কালে মফস্বলের খাজনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৯৪০-এর দশকে ২১ জন তহশিলদার ৬৪টি মৌজার খাজনা সংগ্রহ করত। তহশিলদারের ৬ অংশ পরিমাণ টাকা। তহশিলদার সংগৃহীত খাজনার পরিমাণ প্রাপ্য খাজনার তুলনায় কম হলে তাদের আয়ের হার শতকরা ৩ টাকা হত, যদি তারা প্রাপ্য খাজনার শতকরা ১০০ ভাগই সংগ্রহ করতে পারত তাহলে তাদের আয়ের হার হত শতকরা ৪ টাকা, যদি সংগৃহীত খাজনার পরিমাণ প্রাপ্য খাজনার ১০০ থেকে ১২৫ ভাগ হয়.তাহলে তাদের আয়ের হার হত শতকরা ৫ টাকা, আর যদি

খাজনা সংগ্রহের পরিমাণ প্রাপ্যের তুলনায় শতকরা ১২৫ ভাগের বেশী হয় তাহলে তাদের আয়ের হার হত শতকরা ৬ টাকা। তহশিলদার-এর অধীনস্থ মৌজার পরিমাণ অনির্দিষ্ট হলেও তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকারে সাধারণত ৫ থেকে ২০ বিঘার (২ বিঘা - ১একর) সম্পত্তি থাকত। তবে একদিন তহশিলদারের ২০০ বিঘা জমি ছিল, তার পদটি বংশানুক্রমিক।[১২৯]

খাজনাকৃত আয়ের সঞ্চালন

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এই তালুকের খাজনাকৃত আয়ের পরিমাণ ছিল ৮১,২৩৫ টাকা যা ছিল মোট আয়ের ৯২ শতাংশ। সরকারি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৪,০৯৫ টাকা, যা ছিল এই তালুকের জন্য মোট খরচকৃত অর্থের ৬১ শতাংশ। ১৯৪০-এর দশকে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল মোটামুটি এক লক্ষ টাকা আর সরকারি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা।[১৩০] কুজাঙ তালুকের তুলনায় এই তালুকটি ছিল কম লাভজনক। এর কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) খাজনাকৃত আয় নির্ভর করত মূলত কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের পরিস্থিতির উপর; খাজনা আদায় বৃদ্ধির সম্ভাব্য সব ব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে গিয়েছিল, (খ) খাজনাকৃত আয়ের ব্যাপক তারতম্যতা নির্ভর করত অস্থির প্রকৃতির কৃষিকাজ ও স্বল্পোৎপাদনের উপর যা মূলত দুরূহ নিকাশি ও সেচ ব্যবস্থার জন্যই হত। ১৮৯০-এর দশকে সুজামুতা তালুকের জন-ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭১০ জন। কুজাঙ-এর মত এই তালুক নতুন অধিগৃহীত জমি থেকে খাজনাকৃত আয় সংগ্রহ করতে পারত না।

পত্তনি ব্যবস্থা সুজামুতা ও কুজাঙ কোনো প্রদেশেই বলবৎ হয়নি। ১৮৮০-র দশকে নতুন পত্তনিদার সৃষ্টির সিদ্ধান্ত কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃপক্ষ লাভজনক বলে মনে করেনি। বরং কোর্ট অব ওয়ার্ড বড় বড় তালুকগুলি সরাসরি নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেষ্ট ছিল। কারণ কোর্ট অব ওয়ার্ডের লক্ষ্য ছিল এইভাবে সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং জমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির প্রয়োগ করা। দ্বিতীয়ত, যেখানে আদায়ের জন্য তালুক ব্যবস্থাপনা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের ওপর নির্ভর করতে পারত সেখানে নতুন পত্তনিদের নিযুক্তি নিঃসন্দেহে কোনো লাভজনক সিদ্ধান্ত হতে পারে না।[১৩১] এছাড়াও পত্তনি ব্যবস্থায় সার্থকতার একটি পূর্বশর্ত হল স্থায়ী কৃষি হতে উৎপাদন যা পত্তনিদারকে অতিরিক্ত কৃষিজাত আয় সংগ্রহে সমর্থ করবে।

৩.৫ পত্তনি ব্যবস্থা

বর্ধমান রাজের খাসমহল তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ (১) বর্ধমান অঞ্চল, (২) কুজাঙ এবং (৩) সুজামুতা। কুজাঙ ও সুজামুতার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল দুইজন সাব- ম্যানেজারের, এই তালুকদ্বয় আবার কিছুদিনের জন্য কটক ও মেদিনীপুরের কালেক্টরেরও অধীনে ছিল। বর্ধমান সম্পত্তি কলকাতা, দার্জ্জিলিং, বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, হাওড়া এবং বীরভূম জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। দার্জ্জিলিং এবং কলকাতাস্থিত অঞ্চলের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল দুজন প্রতিনিধির আর বাকি জেলাস্থিত সম্পত্তিকে পুনরায় পাঁচটি চক্রে /সার্কেলে বিভক্ত পাঁচজন চক্র অধিকারিক/সার্কেল অফিসারের দায়িত্বে অর্পন করা হয়।[১৩২] বর্ধমান

অঞ্চলের খাসমহলগুলির দায়িত্ব প্রথমে দুইজন জয়েন্ট-ম্যানেজারের ওপর দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে একজন অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারের ওপর দেওয়া হয়। চক্র অধিকারিক বা সার্কেল অফিসারের দায়িত্ব ছিল খাসমহলগুলিকে প্রতি তিনমাস অন্তর নিরীক্ষণ করা, তহশিলদারদের হিসাবপত্র দেখাশোনা করা, খাসমহল ও নতুন জমি অধিকার (যে সমস্ত জমি বাতিল বা ফেরত দেওয়া হয়েছে) সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করা। এছাড়াও তারা জমির সীমা নির্ধারকগুলির নিয়মিত পরিদর্শন করত এবং খাজনা মকুবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়ে তারা মন্তব্য পেশ করত। তারা তহশিলদারদের সমস্ত হিসাবপত্রের নথিগুলির বার্ষিক পরীক্ষার (যাকে বলা হত জুমাস মোকাবিলা) মাধ্যমে তহশিলদারদের নিয়ন্ত্রণ করত। জমির স্বত্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত আমিনরা খাসজমি তৎক্ষনাৎ প্রত্যায়িত করতে পারত, সেটেলমেন্ট খতিয়ানে তা নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত ও এই পরিবর্তনের কথা বিবৃতও করে দিত। খাসমহলের দায়িত্বে নিযুক্ত অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার সমস্ত মহলগুলি বৎসরে একবার পরিদর্শন করত, আমিন ও চক্র অধিকারিক/সার্কেল অফিসারদের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করত, এবং তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা সে বিষয়ে বিবৃতিও জমা দিত।[১৩৩] এই খাসমহলগুলিতে তালুক ব্যবস্থাপনা শুধু সেই রায়তদেরই কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারত যারা নিজেরা চাষাবাদ করত।[১৩৪] তালুকের বাকি জমিগুলি পত্তনিদের লীজ দেওয়া হত। সুতরাং, তালুক ব্যবস্থাপনা মূলত পত্তনিদের ও কিছু কৃষকদের নিয়েই পরিব্যপ্ত ছিল।

সরকারি তথ্য আইন বিভাগের স্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির পরিমাণকে সূচিত করে।[১৩৫] এই বিশেষ বিভাগের স্থাপনা করা হয়েছিল দেওয়ানি আদালতের দুরূহ বিষয়াদি নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে যাতেকরে খাজনা আদায়ের ব্যাপারটিকে সময়ানুগ করা যায়। ব্রিটিশ প্রশাসনের উন্নয়নের (বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ) পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান রাজ তার সামরিক ব্যয় অনেকটা কমিয়ে এনেছিল। পূর্বে খাজনা আদায়ের জন্য এই সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে হত। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা জমিদারদের সামরিক শক্তি খর্ব করলেও তার ক্ষতিপূরণ করারও ব্যবস্থা করে, বস্তুত বেসামরিকীকরণের ফলে যে খাজনা আদায় কার্য আরও জটিল এবং কষ্টসাধ্য হয়েছিল এমন কিন্তু নয়। সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্তে দেওয়ানি আদালতে মামলা রুজু করতে ও অন্যান্য আইনি মামলাদির নিষ্পত্তির জন্য বেশ কিছু সংখ্যক আইনজীবীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বস্তুত এই আইন বিভাগই বর্ধমান রাজের খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৩৬] খাজনা সংক্রান্ত মামলা নির্বাহের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই সময়ের তালুক ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১৩৭] সুতরাং, বর্ধমান রাজ কীভাবে পত্তনি ব্যবস্থা নির্বাহ করত বা পত্তনি ব্যবস্থা কীভাবে তালুক পরিচালনার বিষয়টিকে, বিশেষত খাজনা সংগ্রহের বিষয়টিকে আরও নিয়মানুগ ও মিত্যব্যায়ি করে তুলেছিল তা আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমরা এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হব।

৩.৫.১ পত্তনি ব্যবস্থা-নির্ভর তালুক ব্যবস্থাপনা ও তার গুরুত্ব

বর্ধমান রাজ কর্তৃক একত্রিত তালুক ব্যবস্থার মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, এই

ব্যবস্থা বর্ধমান অঞ্চলে, যা ছিল এই তালুকের সবচেয়ে পুরানো সম্পত্তি সবচেয়ে সফল ভাবে বলবৎ হয়েছিল। নতুন অধিগৃহীত কুজাঙ (১৮৬৮) ও সুজামুতা (১৮৬৭) তালুকদ্বয় সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে অধিগ্রহণের সময় প্রায় পুরো বর্ধমান অঞ্চলটিই ছিল পত্তনি ব্যবস্থার অন্তর্গত। নির্ধারিত খাজনার অনুপাতে পত্তনি লীজের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। খাসমহল অঞ্চলগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমান অঞ্চলে খাসমহলের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৭৬.৯ শতাংশ। কুজাঙে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫২.৪ শতাংশ এবং সুজামুতার ক্ষেত্রে ৪.২ শতাংশ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান রাজ-তালুকের ১০.৬ শতাংশ পরিমাণ জমি খাজনার দাবি হিসাবে খাস মহলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয় ১৫.৭ শতাংশ। তৃতীয়ত, ১৮৮৫ থেকে ১৯০২-র মধ্যে মহলের সংখ্যা ২,৯৬৩ থেকে দাঁড়ায় ৬,৮৭০টিতে। মহলের সংখ্যা বৃদ্ধির এই ঘটনা ঘটেছিল মূলত নতুন জমি সংযুক্তির ফলে। এই সময়ে বর্ধমান রাজ-তালুকে চৌকিদার চাকরান[১৩৮] নামক জমি হস্তান্তরিত হয় আর তাছাড়া ঘাটওয়ালি[১৩৯] জমির সমস্যাদিও নিষ্পত্তি হয়।[১৪০] পত্তনিদার অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় এমন সকল জমিকে বাতিল করে শুধু লাভজনক জমিগুলিই রাখত এবং এরফলে পত্তনি খাসমহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরফলে পত্তনি মহলগুলির মধ্যে প্রকারন্তরও করতে হয়েছিল। যেসকল অঞ্চল পত্তনিদারদের পরিচালনা করতে অসুবিধা হয়েছিল সেগুলি খাস অধিগ্রহণের আওতায় আসে। এই সমস্ত অঞ্চলগুলি কেনা হয়েছিল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৮ নং ধারা অনুযায়ী আয়োজিত অষ্টম নীলামে।[১৪১] পত্তনিদাররা এই অঞ্চলের ভূভাগের অনুর্বরতা ও রায়তদের অনিয়মিত খাজনা দানের জন্য এই অঞ্চলগুলি ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল। এই অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ প্রতি বছর দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদীর জলে প্লাবিত হয়ে যেত এবং বন্যার পর বালি দ্বারা এই অঞ্চলের ভূভাগ কৃষির অনুপযুক্ত হয়ে যেত। অল্প কয়েকটি মহল্লার পুকুর-বিলগুলিই শুকিয়ে যেত।[১৪২] এককথায় খাসমহলগুলি সাধারনত খুব বেশী লাভজনক ছিল না।[১৪৩]

এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়ে (১৮৮৫-১৯০২) পত্তনি প্রথায় জমি লীজ দেওয়া ছিল তালুক ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে লাভজনক। শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা লাভজনক ছিল না যেখানে পত্তনিদাররা (যারা জমিদারদের চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী ছিল) উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে সমর্থ হত না। বস্তুত খাজনা আদায়ের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণের আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ তুলনা করি তাহলে আমরা মোটামুটি কাঙ্খিত একটি অনুপাত পেতে পারি। এই বক্তব্যকে প্রমাণ করার জন্য আমাদের পত্তনিদারদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র দেখতে হবে। যদিও মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বর্ধমান রাজ-তালুক তার পত্তনিদারদের নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ছিল এবং খাসমহলের খাজনা আদায়ের (১৮৮৫-১৯০২ কালীন পরিস্থিতিতে) জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণের তুলনায় কম পরিমাণ অর্থ বর্ধমান রাজ লভ্যাংশরূপে পত্তনিদারদের দিত এবং তাদেরকে দিয়েই তালুকের খাজনা আদায়ের কর্ম সম্পাদন করাত। বর্ধমান মহারাজ কিন্তু তার সভাসদদের ক্রীড়নক ছিলেন না।[১৪৪] তালুক ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করত তালুকের শক্তির উপর ও জমিদারদের ক্ষমতা ও নিপুনতার ওপর।[১৪৫]

এছাড়াও বর্ধমান রাজপরিবার যে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনাটি বাস্তবে জমিদারদের ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বর্ধমান অঞ্চলের পত্তনি ব্যবস্থা আর কুজাঙ ও সুজামুতা তালুকের খাসমহল ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ব্যবস্থা ঃ (১) কুজাঙ ও সুজামুতা ছিল কৃষিকাজের দিক দিয়ে বর্ধমান অঞ্চলের তুলনায় অনুন্নত। সুতরাং খাসমহল বন্দোবস্তই ছিল এই তালুকদারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, যারদ্বারা কৃষিকাজ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে খাজনা আদায়ের প্রকল্পটি অব্যাহত রাখা যায়; (২) কুজাঙ বা সুজামুতা এই নতুন দুটি তালুকের কোনটিতেই তালুক ব্যবস্থাপনার সাথে মধ্যস্বত্বাকারীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না; (৩) কুজাঙে জমি জরিপ ও কর ধার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা জমির জমিস্বত্ত্ব নথির যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল তুলনামূলক উন্নত ও কার্যকর।

বর্ধমান রাজ কীভাবে পত্তনিদের সেই সময় নিয়ন্ত্রণ করত সে সংক্রান্ত তথ্য আগে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধের এই অংশে আমরা বর্ধমান রাজ ও ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক যা আইনি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা ব্যাখ্যা করব বর্ধমান রাজের পত্তনিদারদের নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার কারণগুলিকে এবং সাথে ১৮৮৫ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত সময়কাল পরিব্যপ্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্যকলাপ। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ এই সময়কালে কোর্ট অব ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয়বার প্রযোজ্য হওয়ার সময় বর্ধমান রাজের পত্তনিদারদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল পত্তনিদারদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং পত্তনি আইনের সংশোধন। পরিবেশিত তথ্যে এই ঘটনাটির সত্যতা প্রতিভাত হয়। এই তথ্যে দেখানো হয়েছে যে পত্তনিদারদের আদায়ীকৃত খাজনা জমা দেওয়ার পূর্বেই সময়মত সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্ধমান রাজ-তালুক বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রেখে দিত। বস্তুত এই গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কম হলেই এই তালুক রাজস্ব দিতে সক্ষম হত না। কোর্ট অব ওয়ার্ড ব্যবস্থার দ্বিতীয় দফায় প্রযুক্ত হওয়ার সময় এই সংরক্ষিত তহবিলে অর্থ সংকট হয় এবং যারফলে এই তালুককে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বস্তুত জমিদারি ব্যবস্থার ক্ষমতার পতনের চরিত্র বুঝতে হলে আমাদের জমিদারি ক্ষমতার বিকাশের কথা জানতে হবে।[১৪৬]

৩.৫.২ সংরক্ষিত তহবিল এবং ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল

বর্ধমান রাজ-তালুকের তিন ধরনের কোষাগার ছিল[১৪৭] যথাঃ (ক) জুমুল – যা চলতি ব্যয়ের সংকুলান করত, (খ) হুর্ওজ - গোপন তোষাখানা, (গ) রোকুব – যা ছিল সংরক্ষিত তোষাখানা।

(ক) জুমুল ঃ জুমুল কোষাগারে সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ গচ্ছিত রাখা যেত। অর্থের পরিমাণ এর চেয়ে বেশী হলে তা রোকুর কোষাগারে চলে যেত। আবার যখন জুমুল কোষাগারে অর্থের পরিমাণ কাঙ্খিত অর্থের পরিমাণের তুলনায় কমে যেত তখন এই অবস্থার উন্নতিকল্পে রোকুর কোষাগার থেকে অর্থ নেওয়া হত।

(খ) হর্ওজ ঃ ১৯০২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণ মুক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত এই কোষাগার বন্ধ ছিল। যদিও কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগৃহীত সময়কালে এই কোষাগারের বিষয়াদির হিসাব রাখা হত, কিন্তু তা কখনই জনসমক্ষে তুলে ধরা হত না। সাধারনত বর্ধমান রাজার সাশ্রয়কৃত অর্থরাশিই এই ধন ভাণ্ডারে মজুত থাকত।[১৪৮]

(গ) রোকুর ঃ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত মহারাজ আফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সময়কাল থেকে এই কোষাগারে একটি সংরক্ষিত তহবিলের ব্যবস্থা করা হয় যাতে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ থাকত ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। মার্চ মাসে রাজস্বের ভারী কিস্তি জমা দেওয়ার পূর্বে অর্থ সংকোচন ঘটলে এই কোষাগার থেকে অর্থ নেওয়া হত। যদিও এই অর্থ ফেরত দেওয়া হত প্রদেয় খাজনা দেয়নি এমন সব পত্তনিদারদের বকেয়া টাকা (১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৮ নং ধারার অন্তর্গত অষ্টম ব্যবস্থা লাগু করে) আদায় করে। আমরা দেখেছি, বর্ধমান রাজের বেশীরভাগ জমিই পত্তনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। সরকারি রাজস্ব প্রদানের নির্ধারিত শেষ তারিখের মাত্র এক মাসের মধ্যেই অষ্টম ব্যবস্থা প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে, রায়তদের ষান্মাসিক খাজনা জমা করতে বাধ্য করা হত।[১৪৯] ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের ৮ নং ধারানুযায়ী প্রযুক্ত পত্তনি ব্যবস্থার ভাণ্ডারে জমিদারদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনরাশি সম্বলিত একটি তহবিলের ব্যবস্থা করতে হত।

জমিদাররা তাঁদের খাজনাকৃত অতিরিক্ত আয়কে সরকারি জামিন ও রেলবিভাগের ঋণপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার করত এবং এই কার্যে অর্থের প্রয়োজন পড়লে জমিদাররা এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ঋণ করত।[১৫০] প্রয়াত মহারাজা সরকারি জামিনগুলির জন্য মোট ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।[১৫১] এবং রাজস্ব প্রদান কালে এই জামিনগুলির জন্য ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল থেকে টাকা নেন। পত্তনিদাররা তাদের খাজনা জমা করে দিলে তাদের ব্যাঙ্কের লোন আর পরিশোধ করতে হত না এবং তাদের জামিনগুলি মকুব করে দেওয়া হত। এইভাবে তালুকের আগ্রহ এইসব জামিন, ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে মোটামুটি আড়াই মাসখানেক স্থায়ী হত, যতদিন পত্তনিদাররা তাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দিত। ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কাছ থেকে টাকা ধার করার এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে বা অন্য কোনভাবে আপত্তিজনক ছিল না। রাজস্ব পর্ষদও এব্যবস্থা প্রচলিত রাখার পক্ষপাতি ছিল।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থা প্রথম দফায় বলবৎ হওয়ার সময়কালে তালুক ব্যবস্থাপনা সফল হয়েছিল। বর্ধমান রাজ ধীরে ধীরে এর বকেয়া টাকার পরিমাণ কমিয়ে এনেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই টাকার পরিমাণ ৮৫৫,১১৭ টাকা থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৮৪,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ১৮৯৪ সালের পর থেকে এই তালুকের সরকারি রাজস্ব হিসাবে দেওয়ার জন্য কোনো বকেয়া অর্থ থাকত না। এর কারণ ছিল বর্ধমান রাজের সঞ্চয়ের প্রবণতা। কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগৃহীত ১৭ বছর সময়কালে এই তালুকের প্রতি বৎসরে গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা।

সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য মূলত পত্তনি ব্যবস্থা এবং জমিদারি আমলাতান্ত্রিক তালুক ব্যবস্থা দায়ী ছিল।

৩.৬ খাজনাকৃত আয়ের সঞ্চালন – ১৮৮৫-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে তালুক ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার

এই সময়কালে বর্ধমান রাজ পরিবার খাজনা সংগ্রহের ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু এবং আমলাতান্ত্রিকভাবে দক্ষ করে তুলতে পেরেছিল। এই ব্যাপারটি প্রতিফলিত হয়েছিল আদায়কৃত খাজনার সুস্থির পরিমাণের উপর যা নির্মিত হত ধার্যকৃত ও আদায়কৃত খাজনার অনুপাতের উপর। সরকারি তথ্য থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ ধার্যকৃত খাজনার পরিমাণের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, আদায়ীকৃত ও ধার্যকৃত খাজনার এই অনুপাত কোনো তালুকের ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতাকে চিহ্নিত করত, এই উর্ধগামী ধারা তখন থেকে। বস্তুত ১৮৯০-৯১ সময়কাল ছিল বর্ধমান রাজ-তালুক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। কুজাঙ এবং সুজামুতা তালুক দুটিতে জমি জরিপ ও খাজনা ধার্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের কাজ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। জমি জরিপ ও জমিস্বত্বের নথিপত্র প্রস্তুত করার ফলে এই তালুকের খাজনা সংগ্রহের বিষয়টি অনেক উন্নত হয়। এই দুটি খাস সম্পত্তি বাদে অন্যান্য অঞ্চলে বর্ধমান রাজ পত্তনি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এই পত্তনি ব্যবস্থার মূল অবদান ছিল দুটি ঃ

(ক) খাজনাকৃত আয়ের বিষয়টিকে সুদৃঢ় করা,

(খ) তালুক পরিচালনা ব্যবস্থার ব্যয়ভার হ্রাস করা।

১৮৯০-৯১ সালে আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ হয় মোট আয়ের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ।

১৯০২ সালের ১৯শে অক্টোবর কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণ থেকে এই তালুকটি মুক্তি পায়। কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা কালে বর্ধমান রাজ-তালুকের অর্থনৈতিক অবস্থা যে অনেকটাই উন্নত হয়েছিল তা বোঝা যায়, কোর্ট অব ওয়ার্ড স্বত্ব ত্যাগের সময় বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুরকে ভূসম্পত্তি ছাড়াও আর কী কী সম্পদ হস্তান্তর করেছিল, তার বিবরণ দেখে।

(ক) সরকারি জামিনপত্র যার বাজার মূল্য ছিল ১৩,৫৬,৩৯৯ টাকা,

(খ) নগদ অর্থ, পরিমাণ ১১,৫৭,৬৫৫ টাকা,

(গ) গোপন কোষাগারে অবশ্য দত্তক সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য ১৩ লক্ষ টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়,

(ঘ) গয়নাগাঁটি,

(ঙ) পুকুর দিঘি এবং বাগান প্রভৃতি (ভাল অবস্থায় আছে এমন) এছাড়াও কোর্ট অব ওয়ার্ডের সময়কালে যেসব পুকুর খনন করা হয়েছিল সেগুলি,

(চ) সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত তথ্য এবং নথিপত্র।

সূত্র নির্দেশ

১ ইসলাম, এস., *দ্য পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল*, ১৯৭৯, পৃ. ২৫১।

২ এ. আর. (বর্ধমান) (২)।

৩ ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

৪ এই বর্ণনার উৎসগুলি নিম্নরূপ। এ. আর. (বর্ধমান) ডব্লু ৭২৪ - ১৯০৩ (৩)। "দ্য বর্ধমান রাজ", *ক্যালকাটা রিভিউ*, এপ্রিল ১৮৭২। মুখার্জী ডি. কে., "দ্য অ্যানালস অফ দ্য বর্ধমান রাজ", *ক্যালকাটা রিভিউ*, জানুয়ারি ১৯১০। পিটারসন, জে. সি. কে., *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ঃ বর্ধমান*, ১৯১০, পৃ. ২৬-৩৯। এস. আর. (বর্ধমান), পৃ. ১৮-২৬। গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, "সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অফ দ্য বর্ধমান রাজ অ্যাণ্ড সার্টেন আদার এস্টেটস ইন ডিস্ট্রিকটস অফ বর্ধমান, হুগলি, অ্যাণ্ড বাঁকুড়া ইন ১৮৯১-৯৬", অনুচ্ছেদ ১৬০-১৬৫। হান্টার, ডব্লু. ডব্লু., *এ স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৩৯-১৪৩।

হান্টার উল্লেখ করেছেন যে তিনি, "দ্য বর্ধমান রাজ", *ক্যালকাটা রিভিউ*, ১৮৭২ সংখ্যা থেকে, যতটা সম্ভব অর্থ অপরিবর্তিত রেখে একটু সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পৃ. ১৩৯। কুমার জ্ঞানেন্দ্র নাথ, "এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য বর্ধমান রাজ", *দ্য জিনিওলজিকাল হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া*, অংশ ৫, পৃ. ১-৭৪। "দ্য বর্ধমান রাজ" পূর্বোক্ত, অংশ ১, পৃ. ১-১২। সিন্‌হা এন. কে., *দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল*, খণ্ড ২, পৃ. ১১৯-২০, "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিজয় চাঁদ মহতাব, থার্ড অফ বর্ধমান", *গ্লিমসেস অফ বেঙ্গল*, ১৯০৭, পৃ. ৪৬এ-বি। *দ্য ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া*, খণ্ড ৪, ১৯০৮, পৃ. ১০১-২।

৫ যদিও এর উদ্ভবের ইতিহাস সঠিক জানা যায় না। আবু ছিলেন পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ ভূভাগের একজন উদ্যোগপতি ক্ষত্রি, পাঞ্জাবে ক্ষত্রিয় জাতির মর্যাদার দাবিদার এক ব্যবসায়ী জাতি। তিনি চাকলা বর্ধমানের ফৌজদারকে এক সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্য ও পরিবহনে সাহায্য দান করেছিলেন এবং ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কয়েকটি মহলে চৌধুরী হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি বাণিজ্য এবং সুদের কারবার করতেন। আর. রায়, *চেঞ্জ ইন বেঙ্গল অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি*, উদ্ধৃত পৃ. ৯১।

৬ "দ্য বর্ধমান রাজ", *ক্যালকাটা রিভিউ*, এপ্রিল ১৮৭২, পৃ. ১৮০।

৭ মেটকাফ, টি. আর., "ফ্রম রাজা টু ল্যাণ্ডলর্ড : দ্য ঔধ তালুকদারস, ১৮৫০-১৮৭০", ফ্রাইকেনবার্গ, আর. ই. (সম্পাদিত), *ল্যাণ্ড কন্ট্রোল অ্যাণ্ড সোসাল স্ট্রাকচার ইন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি*, ভারতীয় সংকলন, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৮। আরও দেখুন, চৌধুরী, বি. বি. "দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ রুরাল প্রোটেস্ট ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া ১৭৫৭-১৯৩০", পৃ. ৭।

৮ সিনহা, পূর্বে উল্লিখিত, খণ্ড ২, পৃ. ১৪০। জমি নিয়ন্ত্রণের গুণগত স্বরূপটি বোঝা যেতে পারে জমিদার কর্তৃক সংগৃহীত কৃষিজাত উদ্বৃত্ত থেকে। রায় এর অভিমত ছিল যে, এই বিশাল অঞ্চল বর্ধমান রাজপরিবারের কর্তৃত্বের অধীনে চলে এলেও গ্রামাঞ্চলের সামাজিক সংগঠনের বিন্যাস অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি দাপটশালী ছিল, তার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল কিনা সেটা ছিল তর্কের বিষয়। রায়, পূর্বে উল্লিখিত।

৯ "দ্য অ্যানালস অফ দ্য বর্ধমান রাজ", *ক্যালকাটা রিভিউ*, জানুয়ারি ১৯১০, পৃ. ১২৫। এ. আর. (বর্ধমান) (৩)।

১০ রায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৭।

১১ "দ্য অ্যানালস অফ দ্য বর্ধমান রাজ", পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ১২৬।

১২ ডি. জি. (বর্ধমান), পৃ. ৩৫। সামরিক শক্তির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ। ম্যাকলেন, জে. আর., "রেভেনিউ ফার্মিং অ্যাণ্ড দ্য জমিদারি সিস্টেম ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরী বেঙ্গল", ফ্রাইকেনবার্গ, আর . ই. (সম্পাদিত), *ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড পেজ্যান্ট ইন সাউথ এশিয়া*, ১৯৭৭, পৃ. ২১।

১৩ এস. আর. (বর্ধমান), পৃ. ২৫। এ. আর. (বর্ধমান) (৫০)।

১৪ ম্যাকলেন, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০।

১৫ ইয়াং, এ. এ., "অ্যান ইনস্টিটিউশনাল শেল্টার ঃ দ্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ইন লেট নাইনটিনথ সেঞ্চুরী বিহার", এম. এ. এস. ১৩-২, ১৯৭৯, পৃ. ২৫৯।

১৬ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, *রিপোর্ট বাই দ্য ডিরেকটর অফ এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট অন ম্যানেজমেন্ট*

অফ গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্ডস, এস্টেটস অ্যাণ্ড ক্রিয়েশন অফ অ্যান এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট ফর দ্য লোয়ার প্রভিন্সেস, ১৮৮৬ (৩৭)।

১৭ রায়তদের আইনানুগ সুরক্ষার সরকারি সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র চাষীদের জমি স্বত্বের অধিকার সুনিশ্চিতকরণ ও যুক্তিযুক্ত খাজনার হার নির্ধারণের মাধ্যমে একটি কার্যকরী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রণয়ন করা। চৌধুরী, বি. বি., "দ্য অ্যাগ্রেরিয়ান কোশ্চেন ইন বেঙ্গল অ্যাণ্ড দ্য গভর্নমেন্ট ১৮৮৫-১৯০০", *দ্য ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল জার্নাল,* ১-১, ১৯৭৬, পৃ. ৮০। একই লেখককৃত পূর্বে উল্লিখিত, "অ্যাগ্রেরিয়ান ইকনমি অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস ইন বেঙ্গল, ১৮৫৯ - ১৮৮৫", সিনহা, এন. কে. (সম্পাদিত), *দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল,* ১৭৫৭-১৯০৫, ১৯৬৭, পৃ. ৩০৫।

১৮ দ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রম ১৮৭১ টু ১৮৭৪।

১৯ প্রদেশ প্রশাসন ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে সঞ্জীবিত করার এই ব্যবস্থা আমাদের নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ক্যাম্পবেল নিয়েছিলেন। কটন., এইচ., *ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড হোম মেমোরিজ,* ১৯১১, পৃ. ৭৭। এই প্রদেশ-প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সময় ও শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪। এছাড়া আরও দেখুন ইয়াং, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৪৭। জয়কৃষ্ণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই মত পোষণ করেছিলেন যে, জমিদার শ্রেণী ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক, বিশেষ করে ক্যাম্পবেলের সময়ে, বিশেষ সৌজন্যমূলক ছিল না, মুখার্জী, এন., *এ বেঙ্গল জমিন্দার,* ১৯৭৫, পৃ. ৩৫০।

২০ ডব্লু. ই. (৮১/২), প্রস্তাব (৯,১০)।

২১ চৌধুরী, বি. বি., "দ্য অ্যাগ্রেরিয়ান কোশ্চেন ....", পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮০।

২২ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, *দ্য বেঙ্গল সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল,* ১৯৩৫, পৃ. ১।

২৩ "নোটস বাই দ্য অনারেবল এইচ. এল. ড্যাম্পিয়ার ফর রিপোর্ট টু গভর্নমেন্ট অন ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে অব বিহার", গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল, *রিপোর্ট বাই দ্য ডিরেকটর অফ এগ্রিকালচার* ...., পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৭।

২৪ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, *রিপোর্ট বাই দ্য ডিরেকটর অব এগ্রিকালচার* ...., পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. (৩, ৯, ২৭, ৩১, ৩৭)। রেসোলিউশান এল আর .... (গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড ওয়ার্ডস এস্টেটস) তারিখ ১/৮/৮৭, ডব্লু. ১৪৬ - ১৮৮৭। রিভার্স থম্পসন মহাশয় বাঙলার কৃষি উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে জমি স্বত্বের সমস্ত অধিকার (সংযোজিত ও লেখক কর্তৃক) সম্বলিত নথিপত্রের প্রস্তুতিকরণের ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না, ডব্লু. ই. (৮২/৩), প্রস্তাব (৯)। যদিও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের আইন জমিহীন রায়তদের সুরক্ষার বিষয়ে নীরব, চৌধুরী, বি. বি., "দ্য অ্যাগ্রেরিয়ান কোশ্চেন ....", পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮০।

২৫ ডব্লু. ই. (৮৩/৪), প্রস্তাব (৪)।

২৬ এল আর সি, খণ্ড ১, পৃ. ১৬২, সার্টিফিকেট পদ্ধতির বিশদ বিবরণের জন্য মূল প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১০২ নং নোট দেখুন।

২৭ 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট' ব্যবস্থাদির গুরুত্বের জন্য মূল প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'সার্ভে ও সেটেলমেন্ট' ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করার উপযুক্ত তালুক খুঁজে বের করা সব সময় সহজসাধ্য ছিল না। প্রয়োজনীয় তালুকটির বা তালুকগুলোর আকার সুবৃহৎ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; আর এইরকম তালুকগুলির উক্ত ব্যবস্থাদিসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বেশ কিছু বছর কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে থাকাও জরুরী ছিল। ডব্লু. ই. (৮১/২)। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ব্যাণ্ডেন পাওয়েল, *দ্য ল্যান্ড সিস্টেমস অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া,* খণ্ড ১, ১৮৯২, পুনর্মুদ্রিত সংকলন, পৃ. ৬৯৬।

২৯ ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫।

৩০ কমিশনার (বর্ধমান) টু সেক্রেটারি বি আর, তারিখ বর্ধমান ২৮/৩/৮৫, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫ (৩)।

৩১ কালেক্টর (বর্ধমান) টু কমিশনার (বর্ধমান), তারিখ বর্ধমান ২৮/৩/৮৫, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫(১)।

৩২ পূর্বোক্ত, (২)।

৩৩ কমিশনার (বর্ধমান) টু সেক্রেটারি বি আর, তারিখ বর্ধমান ২৮/৩/৮৩, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫ (৩, ৪, ৫, ৭)।

৩৪ সেক্রেটারি বি আর টু কমিশনার (বর্ধমান), তারিখ কলকাতা ৩১/৩/৮৫, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫। অর্ডার ল্যাণ্ড রেভেনিউ, ওয়ার্ডস অ্যাণ্ড অ্যাটাচড এস্টেটস, এফ বি পীকক। মহারাণী শ্রীমতি বেনদায়ী প্রয়াত মহারাজার সম্পত্তি বর্ধমান তালুক অধিকার করে রেখেছিলেন.... কোর্ট অফ ওয়ার্ড ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের নবম বেঙ্গল অ্যাক্টের ২৭নং ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করে যে, এই আইনে ৬(বি) নং ধারা অনুযায়ী উক্ত বিধবার উক্ত সম্পত্তির উপর অধিকার বাতিল বলে গণ্য হল এবং এই সম্পত্তির দায়িত্ব এখন থেকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডের। আরও ঘোষণা করা হয় যে, এই অধিগ্রহণের ঘটনাটি যেন কোর্ট অব ওয়ার্ডের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়। ৩১শে মার্চ রাজস্ব পর্ষদ, এল পি-র আদেশানুসারে, ১৮৮৫। এইচ. জে. এস. কটন (সেক্রেটারি)।

৩৫ তালুকের সমস্ত সম্পত্তির মালিক নিজেদের সম্পত্তি পরিচালনার অধিকারী হবেন যদি - ৬নং উপধারার ক্লজ (বি) ঃ উক্ত সম্পত্তির অধিকারী আদালত দ্বারা নাবালক হিসাবে বিবেচিত হয়। *দ্য বেঙ্গল ওয়ার্ডস ম্যানুয়াল*, ১৯৩৯, পৃ. ৯। পরবর্তী সময়ে কোর্ট অফ ওয়ার্ড কর্তৃক ৬ নং উপধারার ক্লজ (ই) অনুসারে অধিগৃহীত তালুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৬ নং উপধারার ক্লজ (ই)-র বক্তব্য হল ঃ কোর্টের আদেশানুসারে যে সকল ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার বাতিলকৃত বলে ঘোষণা হয়েছিল, কোর্ট অফ ওয়ার্ডের উচিৎ জনস্বার্থেই সেইসব তালুকগুলির পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেওয়া। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় দফায় বর্ধমান রাজ-তালুকটির অধিগ্রহণ বা কৃতবাজার রাজ তালুকটির অধিগ্রহণের বিশদ বিবরণের জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদের ২ নং অংশ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৪.১ নং অংশ দেখুন।

৩৬ কমিশনার (বর্ধমান) টু সেক্রেটারি বি আর, তারিখ বর্ধমান ২৯/৪/৮৬, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫(৪৫), ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৪)- এ উল্লেখিত।

৩৭ *দ্য বেঙ্গল ইনহেরিটেন্স রেগুলেশন*, ১৮০০।

৩৮ এই দ্বন্দ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে আদালতের কিছু নির্দেশনামা মহারাণীর পক্ষে ছিল। ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৮)। উড়িষ্যার কমিশনার মন্তব্য করেছেন যে ঃ যেহেতু হাইকোর্ট স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের কোর্ট অব ওয়ার্ডের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছে, তাই বর্ধমানের কালেক্টরের উচিৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি পক্ষের উকিলকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাতে বকেয়া খাজনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষীর ব্যবস্থা মহারাণী করেন...., কমিশনার (উড়িষ্যা) টু সেক্রেটারি বি আর, তারিখ বর্ধমান ১৪/৭/৮৬, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫(৪)।

৩৯ সেক্রেটারি বি আর টু সুপারিনটেণ্ডেন্ট...., তারিখ কলকাতা ২১/১১/৮৫, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫ (৬)।

৪০ পূর্বোক্ত (৮)।

৪১ অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি বি আর টু কমিশনার (বর্ধমান), তারিখ ১৩/৮/৮৫, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫ (১, ২)।

৪২ খাজনা সংগ্রহের জন্য জমিদারের প্রতিষ্ঠান।

৪৩ সবচেয়ে নীচুতলার সিভিল জজ / দেওয়ানি বিচারক।

৪৪ মিলার, বর্ধমানের কালেক্টরের ম্যানেজার তারিখ ২৫/৮/৮৫,ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫।

৪৫ সেক্রেটারি বি আর টু সেক্রেটারি গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, তারিখ কলকাতা ৫/৫/৮৬, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫ (১০, ১১)।

৪৬ পূর্বোক্ত (১৫, ১৬)।

৪৭ সেক্রেটারি বি আর টু কমিশনার (বর্ধমান), তারিখ কলকাতা ২১/৩/৮৭, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫(৪)।

৪৮ এ. আর. (বর্ধমান) (১০), ডব্লু. ই. (৮৭/৮) (৩২)।

৪৯ এ. আর. (বর্ধমান) (১০)।

৫০ ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৮)।

৫১ ডব্লু. ই. (৮৭/৮) (৪৪)। এই পরিচ্ছেদের ৩.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫২ এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নবম বেঙ্গল অ্যাক্ট অনুযায়ী লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর সম্মতি অপরিহার্য ছিল।

৫৩ ডব্লু. ই. (৮৫/৬), এই দত্তক গ্রহণের ঘটনার অস্বীকৃতির বিষয়ে বিষদ বিবরণের জন্য দেখুন এন আর প্রসিডিংস, জুন ১৮৮৬, নংএ৫০-১ এবং সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, এ১০০-৪।

৫৪ ডব্লু. ই. (৮৭/৮) (৩৫)। এই দত্তক গ্রহণের ঘটনা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই দত্তক পুত্রই তালুকের একমাত্র অধিকর্তায় পরিণত হয়েছিল এবং যেহেতু সে নাবালক ছিল তাই তার কর্তৃত্বকে অস্বীকৃতি জানিয়ে কোর্ট অফ ওয়ার্ড এই তালুকের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিয়েছিল। কোর্ট অফ ওয়ার্ড পূর্ব থেকেই নাবালিকা মহারাণীর তালুকের ব্যবস্থাপনায় দায়ভার নির্বাহ করত, এবং তার নাবালক দত্তকপুত্র আসার পরও এই ব্যবস্থাপনা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনেই থেকে যায় এবং পূর্বতন ম্যানেজাররা তাদের কার্যালয়ে আগের মতই মোতাবেক থাকেন। ডব্লু. ই. (৮৬/৭) (৩৩)।

৫৫ এ. আর . (বর্ধমান) (১২)।

৫৬ এ. আর . (বর্ধমান) (১৩)।

৫৭ বীমের স্মারকলিপি তারিখ ২৭/৫/৮৭, বাক্ল্যাণ্ডের অনুমোদন, তারিখ ১৭/৬/৮৭, দ্য গভর্মেন্ট রেজোলিউশন, তারিখ ৩১/৭/৮৭. এনক্লোসার, সেক্রেটারী বি আর টু সেক্রেটারি গভর্মেন্ট অয বেঙ্গল, রেভেনিউ, তারিখ ১৭/৭/৮৭, ডব্লু. ২৪০-১৮৮৫।

৫৮ এনক্লোসার, পূর্বে উল্লেখিত।

৫৯ বাকল্যাণ্ডের রিপোর্ট তারিখ ১৭/৬/৮৭, ডব্লু. ২৪০-১৮৮৫, (১৩)।

৬০ পূর্বোক্ত (১৪)।
আশ্চর্যের বিষয় হল, দোয়াগের মহারাণী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে মার্চ ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরিত এক পত্রে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে লেখেন যেঃ 'আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে আমাদের পরিবার যে পাঞ্জাবের রীতিনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা প্রমাণ করার যে ভীষণ চক্রান্ত চলছে তা বস্তুত আমাদের হিন্দু মানসিকতার উপর আঘাত হানার সমতুল্য। যদি এই প্রয়াস সফল হয় তাহলে বলতে হয় একটি পরিবারের অহিন্দুকরণ হল.... আমি এই প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছি কারণ, এই প্রয়াস বাংলার এক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের সামাজিক এবং ধর্মীয় মর্যাদার উপর আঘাত হেনেছে.... বলাই বাহুল্য যে এই দত্তক নেওয়ার ঘটনা, যা আইনের চোখে অন্যায্য ছিল, এই রাজপরিবারকে অযথা অনেক সমস্যা এবং মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে ফেলে পতনোম্মুখ করে তুলবে।' সেক্রেটারি বি আর টু সেক্রেটারি গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল, রেভেনিউ, তারিখ ১৭/৬/৮৭, ডব্লু. ২৪০-১৮৮৫, (৬)। এই চিঠি প্রমাণ করে যে, দত্তক এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত, ব্যাপারে আইনি সমস্যাবলীর মধ্যেও কীভাবে ধর্মীয় দিকটি প্রতিফলিত হয়েছিল। এই বিষয়ে বিষদ বিবরণের জন্য দেখুন নন্দী, এস. সি., *লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস্ অফ কান্ত বাবু*, খণ্ড ২, ১৯৮১, পৃ. ৩০৫-৭।

৬১ বাক্ল্যাণ্ডের রিপোর্ট, (৩৪)।

৬৬ পূর্বোক্ত, (৩৬)।

৬৩ পূর্বোক্ত, (৩)।

৬৪ পূর্বোক্ত, (৩৭)।

৬৫ বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুম, হুগলি, হাওড়া, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, নদীয়া, যশোহর, নয়া দুমকা, মুঙ্গের, দার্জ্জিলিং, মুত্তরা, কানপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, পাবনা এবং কটক। এ .আর (বর্ধমান) (৫)।

৬৬ খাজনা অথবা খাজনার হার চিরতরে নিধারিত হয়েছিল।

৬৭ এ . আর. (বর্ধমান) (৫)।

৬৮ এক ধরনের খাজনা-হীন বা রাজস্ব-হীন সম্পত্তি, যা ছিল সাধারনত চিরস্থায়ী এবং হস্তান্তরযোগ্য। এই ধরনের সত্বগুলি দান করা হত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে।

৬৯ ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৭)। এই তথ্য সরকারি তথ্য থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা।

৭০ এই সম্পত্তি প্রদত্ত হত দেবদেবীর পূজার্চনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার নির্বাহ করতে।

৭১ ডব্লু .ই .(৮৫/৬) (২৭)। বর্ধমান, কালনা, বেনারস, পুরী, বৃন্দাবন এবং দার্জ্জিলিং এই সকল অঞ্চলে এই রাজপরিবারের প্রদেয় ধর্মীয় ভাতার পরিমাণ ছিল প্রচুর। ৩২ মন্দির এবং ধর্মীয় পীঠস্থান ছাড়াও ছোট ছোট মন্দির এই তালুকের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এছাড়াও বেশ কিছু দিঘি ও নদীঘাটের তত্ত্বাবধান ধর্মীয় কার্যাবলীর অন্তর্গত ছিল এবং দেবোত্তর বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এইসব মন্দির ও দেবস্থানগুলির জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ ধর্মীয় ভাতা হিসাব ব্যয়িত হত এবং ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠানগুলি পালনের জন্য বাৎসরিক খরচের পরিমাণও ছিল প্রচুর। মন্দিরস্থিত দেবদেবীরা বহু মূল্যবান গয়নাগাটি পরিহিত থাকতেন। বৃন্দাবন, বেনারস, পুরী এই সকল স্থানে ধনী জমিদারেরা বৃদ্ধ বয়সে এসে বসবাস করতেন। সিন্‌হা, এন.কে., *দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল,* খণ্ড ৩, ১৯৭০, পৃ. ১০০। বাজি/বাজে-জমি (বিবিধ উদ্দেশ্য ব্যবহৃত জমি যা খাজনা ব্যবস্থার আওতায় ছিল না) ধীরে ধীরে রাজস্ব বিভাগ অধিকার করে নেয়। ১৭৬৩-৬৪ সালে এই বাজি/বাজে -জমির পরিমাণ ছিল ৫৬৮,৭৩৬ বিঘা, যা ছিল এই রাজপরিবারের কৃষিযোগ্য সমস্ত জমির প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এইসব জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনার পরিমাণ ছিল ১১,৩৭,৪৭২ টাকা। ডি.জি. (বর্ধমান), পৃ. ১৪৬। এই জমির কিছু অংশ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে অধিগৃহীত হয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২। যদিও লক্ষনীয় বিষয় ছিল যে, কোর্ট অব ওয়ার্ড মন্দার পরিস্থিতির আগে পর্যন্ত জমিদারদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। বস্তুত রাজস্ব পর্ষদ গ্রামীণ সমাজে জমিদারদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যয়ের গুরুত্বের কথা বুঝতে পেরেছিল। "…. আমাদের সরকারকে স্থানীয় মানুষদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য, বিশেষত সেই সমস্ত তালুকগুলিতে দেখানোর ব্যবস্থাপনা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে নাবালক উত্তরাধিকারী দিয়ে চলত, নাবালক মহারাজ বা তার পরিবারের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। বলা বাহুল্য নিরপেক্ষ স্থানীয় মানুষরাও আমাদের এই নীতির ভুয়সী প্রশংসা করেছে। কর্ণেল জে. বার্ন টু জে. ক্রাফর্ড, তারিখ ১১/১/৭৩, উল্লেখিত আছে ঝা, জে. এস., *বায়োগ্রাফি অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়ট ঃ লক্ষ্মীশ্বর সিং অয দারভাঙ্গা,* ১৯৭২, পৃ. ২২৪।

৭২ বর্তমান নিবন্ধের অনুচ্ছেদ ১।

৭৩ রায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৯৪।

৭৪ ডি. জি. (বর্ধমান) পৃ. ৩৮।

৭৫ ম্যাকলেন, পূর্বে উল্লেখিত। 'জমিদারদের বেসামরিকীকরণের প্রক্রিয়া'-র স্বরূপ অনুধাবনের জন্য দেখুন, পৃ.২০। তার আলোচনায় গ্রামীণ পুলিশ-এর ভূমিকায় যে পরিচয় ছিল তা ছিল অসন্তোষজনক। চ্যাটার্জী, বি., "দ্য দারোগা অ্যাণ্ড দ্য কান্ট্রি-সাইড ঃ দ্য ইম্পোজিশন অফ পুলিশ কন্ট্রোল ইন *বেঙ্গল* অ্যাণ্ড ইটস্ ইমপ্যাক্ট (১৭৯৩-১৮৩৭)", *আই.ই.এস.এইচ.আর.,* ১৮-১, ১৯৮১, পৃ. ৩৭, ৪২। বাংলায় বৃটিশ প্রশাসনের সংহতিকরণের মূখ্য বৈশিষ্ট্যই ছিল পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই নতুন ব্যবস্থা জমিদারদের পূর্বতন সৈন্যবাহিনী রাখার ব্যবস্থার অবসান হয়। পূর্বে এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই জমিদাররা খাজনা আদায় করত। এখন থেকে জমিদাররা ব্রিটিশ প্রণীত আইন ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করেছিল। ম্যাকলেন, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩১। সুতরাং বর্ধমানরাজ এই নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার আইন বিভাগের সহায়তায় কীভাবে খাজনা আদায় করত তা আমাদের দৃষ্টিকোন থেকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে, ইণ্ডিয়ান পুলিশ কমিশনের (১৮৬০) অনুমোদন প্রাপ্তির পর গ্রামীণ পুলিশের ভূমিকার বিষয়টিরও পর্যালোচনা প্রয়োজন। চ্যাটার্জী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৭।

৭৬ একটি রাজস্বের হিসাব যাতে মোট রাজস্বের পরিমাণ, প্রকৃত প্রদেয় রাজস্ব এবং বকেয়া রাজস্বের হিসাব থাকত।

৭৭ ডব্লু. ই. (৮৫(৬) (২৭)।

৭৮ 'আমলাতন্ত্রে'র স্বরূপের জন্য দেখুন ওয়েবার, ডব্লু., *ইকনমি অ্যাণ্ড সোসাইটি,* রথ, জি. এবং উইটিচ, সি. (সম্পাদিত), খণ্ড, ১৯৭৮, পৃ. ৯৫৬-৮।

৭৯ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে 'তালুক স্তরের প্রশাসন এবং বংশানুক্রমিক আধিকারিকদের পরিবর্তে লোকসেবা আয়োগের দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আধিকারিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।' স্টোকস্, ই., *দ্য পীজ্যান্ট অ্যাণ্ড দ্য রাজ*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪৪।

৮০ গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্য দারভাঙ্গা রাজ বাই দ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস্, ফ্রম নভেম্বর ১৮৬০ টু সেপ্টেম্বর* ১৮৭৯, ১৮৮০(১০), পৃ. ২।

৮১ পূর্বোক্ত, (৭), কমিশনার (পাটনা) টু সেক্রেটারি বি আর তারিখ ১২/২/৮০।

৮২ ঝা, জে. এস., পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১১২।

৮৩ কমিশনার (পাটনা) টু সেক্রেটারি বি আর, পূর্বে উল্লেখিত, (৮)।

৮৪ পূর্বোক্ত, (৮)।

৮৫ দারভাঙ্গার জেনারেল এবং অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজাররা সকলেই ব্রিটিশ ছিলেন। তারা হয় সামরিক নয় সরকারি কর্মচারী, না হয় নীলকর সাহেব ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণ মুক্ত হওয়ায় পরও এই তালুকে কিছু ইউরোপীয় কর্মচারী থেকে গিয়েছিল। ইয়াং, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৫৫। '.... এই পেশাদার আধিকারিকরা বাঙালিই হউন বা ইউরোপীয় হউন, তারা কিন্তু সনাতনী কর্মচারীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ম্যানেজারদের থেকে পৃথক ছিল যারা বেশীরভাগ সময়ে নিজেব ক্ষমতাবলে কার্য পরিচালনা করত। এই নতুন কর্মচারীরা স্থানীয় সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা মালিকবর্গের সাথেই বেশি জড়িত থাকত।' ইয়াং, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৫৬। এই সময়কালে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনার ভূমিকা ছিল সন্তোষজনক। গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য দারভাঙ্গা রাজ* ...., পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪০। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এই তালুকের মোট খাজনার পরিমাণ ছিল ১৬,৩৯,৩৫৭ টাকা এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধিগ্রহণ মুক্ত হওয়ার সময় এই পরিমাণ ছিল ২১,৬১, ৮৮৫ টাকা। কোর্ট অব ওয়ার্ড এই তালুকের ৭২ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করে এবং মহারাজকে বকেয়া ২,৭৫,৭৩৩ টাকা এবং ৩৮,৫৪,৫০০ টাকা মূল্যের সরকারি জামিনপত্র প্রদান করে। কমিশনার (পাটনা) টু সেক্রেটারি বি আর পূর্বে উল্লেখিত, (৫১,৫৮)। ১৮৭৫-৭৬ সালে মোট সংগৃহীত খাজনার পরিমাণ ছিল ১৪,৭৫,৪৯০ টাকা যার মধ্যে ৯,০৬,৯৩২ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল তহশিলদারি ব্যবস্থা (যার জন্য ব্যয় হয়েছিল ৪৭,৫৩২ টাকা) এবং ৫,৬৮,৯৫৪ টাকা ঠিকাদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে। নতুন ব্যবস্থা খাজনা সংগ্রহের ব্যয়ভার কমিয়ে এনেছিল। অফিশিয়েটিং ম্যানেজার (দারভাঙ্গা) টু কমিশনার (পাটনা), তারিখ ১০/৩/৭৭, বি আর প্রসিডিংস, এপ্রিল ১৮৭৭, (৪,৬)। তালুক পরিচালনার আমলাতান্ত্রিক প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধির জন্য দেখুন, "ব্যুরোক্রাসি অ্যাণ্ড কন্ট্রোল ইন ইণ্ডিয়াজ গ্রেট ল্যানডেড এস্টেটস্ঃ দ্য রাজ দারভাঙ্গা অফ বিহার, ১৮৭৯ টু ১৯৫০", *এম.এ.এস.*, ১৭-১, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫-৩৭। এই মতামতের জবাবি বক্তব্যের জন্য দেখুন, মাসগ্রেভ, পি.জে., "এ রিপ্লাই", *এম.এ.এস.*, ১৭-১, পৃ. ৫৬-৭। আরও দেখুন, হেনিংহাম, এস., "দ্য রাজ দারভাঙ্গা অ্যান্ড দ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ১৮৬০-১৮৭৯ঃ ম্যানেজারিয়াল রিঅর্গানাইজেশন অ্যাণ্ড এলিট এডুকেশন", *আই ই.এস. এইচ. আর.*, ১৯-৩ এবং ৪, ১৯৮২, পৃ. ৩৪৭-৬৩।

৮৬ রেজোলিউশন, ওয়ার্ডস অ্যাণ্ড অ্যাটাচড্ এস্টেটস, তারিখ ৭/৫/৮৬, ডব্লু. ৭৩- ১৮৮৫,(২)।

৮৭ কমিশানার (বর্ধমান) টু সেক্রেটারি, বি আর, তারিখ ২৯/৪/৮৬, অ্যাপেনডিক্স সি, ডব্লু. ৭৩-১৮৮৫।

৮৮ ডব্লু. ই. (৮৭/৮) (৪২)।

৮৯ এ. আর. (বর্ধমান) (১৪)।

৯০ মাসগ্রেভ, পি.জে. "ল্যাণ্ডলর্ডস্ অ্যাণ্ড লর্ডস্ অফ দ্যা ল্যাণ্ড", *এম. এ. এস.*, ৬-৩, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৭০।

৯১ ডি.জি. (কটক), ১৯০৬, পৃ. ২১৯-২০; এস. আর. (কুজাঙ) (২৮)।

৯২ ডি. জি. (কটক), পৃ. ২১৯।

৯৩ এস. আর. (কুজাঙ) (২৪)। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ মাইলে ৫৩৮ জন। ডি. জি. (বর্ধমান), বি. ভল্যুম, ১৯৩৩, পৃ. ৯।

৯৪ এস. আর. (কুজাঙ) (২৭)। 'যারা নিম্নবঙ্গের কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল বা যাদের উড়িষ্যার গ্রাম ও কৃষিজমিগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল তারা সকলেই জানত যে উড়িয়া চাষীরা বাঙালি চাষীদের থেকে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল।' ব্যানার্জ্জী, এন. এন., *রিপোর্ট অন দ্য এগ্রিকালচার অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ কটক*, ১৮৯৩, পৃ. ২৫। 'বর্ধমান জেলা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত গোবর সারের সাহায্যে কৃষিকাজ করার ব্যবস্থা কটকে প্রচলিত ছিল না', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

৯৫ এস. আর. (কুজাঙ) (১১), ব্যানার্জ্জী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৬৬-৭।

৯৬ এস. আর. (কুজাঙ) (১২, ১৩)।

৯৭ এস. আর. (কুজাঙ) (১১)।

৯৮ ডিরেক্টর, ল্যাণ্ড রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট টু সেক্রেটারি, বি আর, তারিখ কলকাতা, ১৫/৮/৯৪, এল. আর, প্রসিডিংস, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, নম্বর এ১১২-৩।

৯৯ এস. আর. (কুজাঙ) (২১)। ব্যানার্জ্জী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১৪৪-৭।

১০০ পাহিচাষের স্থায়িত্ব জমিদারদের পাহি খাজনা সাহায্য করেছিল। 'পাহি খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধির ঘটনা পাহি চাষে স্থায়িত্ব ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল।' বি. বি. চৌধুরী ''মুভমেন্ট অব রেন্ট ইন ইর্স্টান ইণ্ডিয়া, ১৭৯৩-১৯৩০'', *আই.এইচ.আর.*, ৩-১, পৃ. ৩৪৭।

১০১ এস. আর. (কুজাঙ) (২১)।

১০২ পূর্বোক্ত।

১০৩ এস. আর (কুজাঙ) (২৩)। কুজাঙের জিম্বাদারি ব্যবস্থা ছিল বস্তুত খামার ব্যবস্থা এবং তহশিলদারি ব্যবস্থার এক মধ্যবর্তী ব্যবস্থা। এই মধ্যবর্তী ব্যবস্থার শর্ত ছিল জমিদারদের জিম্বাদারদের উপর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা। পালগু জিম্বাদাররা নিজ ক্ষমতাবলে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে অক্ষম ছিল। মৌজাওয়ারি জিম্বাদাররা জমিদারদের কঠোর নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল যারা জমাবন্দি হিসাবের মাধ্যমে এই জিম্বাদারদের নিয়ন্ত্রণ করত। বাকরগঞ্জের জিম্বাদারি ব্যবস্থা অবশ্য এর থেকে আলাদা ছিল। বাকরগঞ্জের জিম্বাদারি ব্যবস্থা ছিল অত্যাচারী জমিদারের অধীনস্থ রায়তদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারের সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে সহায়ককারী এক ব্যবস্থা। বস্তুত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই জমিদাররা রায়তদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করত তখনই যখন তার সাথে সেই জমিদারের, যার কর্তৃত্ব তার রায়তরা অস্বীকার করেছে, সম্পর্ক বিদ্বেষমূলক থাকত। এস. আর. (বাকরগঞ্জ), ১৯০০-০৮, (১৩৯)। জ্যাক উল্লেখ করেছেন যে, প্রশাসন ব্যবস্থায় উন্নতি এবং দেওয়ানি ন্যায় বিচার ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও জিম্বাদারি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উঠে যায়নি, যতদিন না পর্যন্ত জমিস্বত্ত্ব অধিকার নথীকরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, পূর্বোক্ত (১৪১)।

১০৪ এস. আর. (কুজাঙ) (৩০)।

১০৫ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের আগে গ্রামগুলি ছিল তালুকগুলির অর্থনৈতিক একক। এই গ্রামের দায়িত্বে থাকত প্রধান। এই প্রধান-এর দায়িত্ব ছিল, গ্রামবাসীদের মধ্যে জমি বন্টন, খাজনা বন্টন করা। এবং গ্রামের সমস্ত জমির রাজস্বের দায়িত্ব তার ওপরই থাকত। তিনি প্রত্যেক গ্রামবাসীকে বা থানি চাষীদের মধ্যে সমস্ত জমি বন্টন করতেন এবং যদি অবশিষ্ট জমি কিছু থাকত তাহলে সেগুলি তিনি পাহি বা ভ্রাম্যমান চাষীদের মধ্যেও বন্টন করে দিতেন।' ব্যানার্জ্জী, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪১।

১০৬ এস. আর. (কুজাঙ) (৩০)। সার্টিফিকেট পদ্ধতির বর্ণনার জন্য তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১০১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০৭ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দোয়াগের মহারাণী সম্পত্তির দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়ার অব্যবহিত পরই রাজার পর্ষদ বর্ধমান রাজের দুই ম্যানেজারের একজনকে অর্থাৎ, মিলারকে এই তালুককে কোর্ট অব ওয়ার্ড ব্যবস্থার অধিগ্রহণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। তিনি কুজাঙ প্রদেশের জিম্বাদারদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের বলেন যে, তারা যেন কোর্ট কর্তৃক স্বীকৃত কোনো ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাউকে খাজনা না দেয় এবং এতদিন তারা যে আধিকারিকদের খাজনা দিয়ে আসছিল তারা সকলে সেই স্বীকৃতি প্রাপ্ত ছিল। মিলার টু কালেক্টর (বর্ধমান), তারিখ, ২৫/৮/৮৫, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫।

এই ঘটনা সুস্পষ্ট করে যে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই তালুকের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে জিম্বাদারদের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

১০৮ পুরো কটক জেলার ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬ শতাংশ এবং ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এই সময়কালে জনসংখ্যা ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ম্যাডকস, এস. এল., *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অফ দ্যা প্রভিন্স অফ উড়িষ্যা, ১৮৯০-১৯০০*, খণ্ড ১, পৃ. ৪। বর্ধমান রাজ কুজাঙ তালুকটি ক্রয় করার সময়কাল থেকে এই তালুকের কৃষিকাজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, জঙ্গলের পরিমাণ কমেছিল এবং মুঘলবন্দী অঞ্চল থেকে জনগণের আগমন ঘটায় জনসংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এস. আর (কুজাঙ) (২১)।

১০৯ ম্যাকপারসন, দ্য ডিরেক্টর অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ টু সেক্রেটারি বি আর তারিখ, কলকাতা, ২৯/৩/৯৭, ডব্লু. ৭৪-১৮৯৬ (২)।

১১০ ম্যানেজার টু কালেক্টর (কটক), তারিখ, বর্ধমান, ১০/৮/৯৪, ডব্লু. ৭৪-১৮৯৬।

১১১ কাঠ এবং জঙ্গলের খাজনা (বাস্তুকার) থেকে আগত আয়ের পরিমাণ উপেক্ষণীয় ছিল না। অ্যানুয়াল রিটার্ন নম্বর ৩১ ১৯৩২-৩৩, এর ২.৩ নং সারণি দেখুন। জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের চামড়া সংগ্রহের লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল এই তালুক। অ্যাডিশনাল ম্যানেজার টু কালেক্টর (বর্ধমান), তারিখ বর্ধমান, ১৭/৬/৩১, ডব্লু. ৫৫৩-১৯৩১।

১১২ 'সার্ভে রেকর্ডের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি অনুসারে, পোড়ো জমি অধিগ্রহণের কোনো ঘটনা যদি আমার নজরে আসে বা বন্যার সময় কোনো তহশিলদারের নজরেও আসে তাহলে ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট-এর দশ নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত খাজনা সংক্রান্ত নথী প্রস্তুতির ১নং এবং ২নং নিয়ম অনুযায়ী অনুসন্ধান করা হবে। স্কেচ, খসড়া এবং খতিয়ান প্রস্তুত করা হবে। এই ঘটনা বর্ধমান রাজ-তালুকের ম্যানেজারকে জানানো হয় এবং অনুমোদন পাওয়ার পর নথীগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। যদিও, কোনো ব্যক্তির পোড়ো জমির ওপর দাবি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান আমার কার্যালয়স্থিত মুহুরীদের দ্বারা করা হয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে মুহুরীরাই একাজ করতেন, অন্যথা তহশিলদারদেব দ্বারা এই কাজ করানো হয়। স্কেচ ম্যাপ, খসড়া এবং খতিয়ান প্রস্তুত করে ম্যানেজারের অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়ার পর এই বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটত এবং রেজিস্টার ১,২ এবং ৫-এ পর্যদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তি ও সংশোধন করা হত। এই দুই ধরনের পরিস্থিতিতেই তহশিলদারদের এ-ব্যাপারে জানানো হত যাতে তারা তাদের নথীপত্রগুলোকে সংশোধিত করে নিতে পারে।' সাব-ম্যানেজার টু কালেক্টর (কটক), তারিখ, কুজাঙ, ৩-৪/৩/৯৬, ডব্লু. ৭৪-১৮৯৬(১)। এই সেটেলমেন্ট খতিয়ান অনুযায়ী তহশিলদাররা খাজনা তালিকা প্রস্তুত করত। ম্যাকপারসন টু-সেক্রেটারি, বি আর, পূর্বে উল্লেখিত (২)।

১১৩ ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৮)।

১১৪ ডব্লু. ই. (৪৭/৮) (৪৪)।

১১৫ এই অংশটি কুজাঙরাজের এক বংশধর শ্রী এন. বি. সামন্তের সাথে লেখকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উদ্ধৃত। তার সাথে লেখকের সাক্ষাৎ হয় পারাদ্বীপ গড়-এ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২।

১১৬ ডি. জি. (মেদিনীপুর), ১৯১১, পৃ. ২১৯। ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৮)। রায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১৬৬-৭।

১১৭ ডি. জি. (মেদিনীপুর), পৃ. ১৭৬-৭। এস. আর. (সুজামুগ) (৩৩)।

১১৮ ডি. জি (মেদিনীপুর), পৃ. ১০২-৩।

১১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০। নদীগুলির ভাঙ্গনের কারণের জন্য দ্রষ্টব্য চৌধুরী, বি.বি., "এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন ইন বেঙ্গল, ১৮৫০-১৯০০ কো-এক্সিসটেন্স অব ডিকলাইন অ্যাণ্ড গ্রোথ", *বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট*, নং ১৬৬, ১৯৬৯, পৃ. ১৫২-৯।

১২০ কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ব্যবস্থাপনাকালে তালুকটি জোয়ারের জলে অথবা ভারী বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিম্নলিখিত বৎসরগুলিতে : ১৮৯২, ১৮৯৪-৫, ১৮৯৮-৯,১৮৯৯-১৯০০, ১৯০১-২, এ. আর. (বর্ধমান) (৫১)।

১২১ লবন প্রস্তুতের সময় সমুদ্রের নোনাজলকে ফোটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানীর সরবরাহ করত জলপাইগুড়ি। ডি. জি. (মেদিনীপুর), পৃ. ১৭৭।

১২২ ডি. জি. (মেদিনীপুর), পৃ.১৭৭।

১২৩ ডব্লু. ই. (৮৬/৭) (২৬), এস. আর. (সুজামুতা) (২৪)।

১২৪ এ. আর. (বর্ধমান) (৫১)।

১২৫ সুলানামার ৮ নং অনুচ্ছেদ ঃ
'ভারি বর্ষণের সময় রায়তরা কৃষিকাজ বন্ধ করে কৃষিযোগ্য জমিগুলিকে পতিত করে রেখে দিত, এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটত, ফলস্বরূপ জমিদাররা রায়তদের খাজনার কিছু অংশ মকুব করে দিত। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কাঁচি মহলের কোনো রায়ত যদি তাদের কৃষিযোগ্য জমি অনাবাদী রেখে দেয় বা তাদের জমির এক অংশ চাষ না করে, তাহলে তাদের খাজনা, (এমনকী এক অংশ) মকুব করা হবে না, কিন্তু যদি তারা প্রাকৃতিক কোনো কারণে (যা তাদের আয়ত্তের বাইরে) যেমন অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন তাদের জমির কোনো অংশেই চাষ-আবাদ না করতে পারে, তাহলে তাদের খাজনা মকুব করা হত নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে। প্রথম বৎসর তাদের ৮ আনা খাজনা কম দিতে হত অর্থাৎ প্রদেয় খাজনার অর্ধেক। দ্বিতীয় বৎসর .... ১২ আনা কম দিতে হত অর্থাৎ প্রদেয় খাজনার ৩/৪ অংশ কম। তৃতীয় বৎসর ১৪ আনা কম অর্থাৎ ৭/৮ অংশ কম, চতুর্থ বৎসর ১৫ আনা কম অর্থাৎ ১৫/১৬ অংশ কম। পঞ্চম বৎসর জমিদার জমিগুলিকে খাসমহলের অন্তর্ভূক্ত করে পুনরায় নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করত। অধিক বা কম বর্ষণের জন্য কৃষিকাজ স্থগিত রাখার বিষয়টি জমিদারকে সেই বছরই ১৫ই আশ্বিন থেকে ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে জানাতে হত লিখিত আবেদনের মাধ্যমে। এই লিখিত আবেদনে যেসব তথ্য দিতে হত, তা হল - (সম্প্রতি সম্পন্ন সার্ভের নথীপত্র অনুযায়ী) রায়তদের কৃষিযোগ্য জমিসমূহের প্লট নাম্বার এবং সেই পতিত বৎসর ছিল এমন জমিগুলির প্লট নাম্বার। জমিদারের দায়িত্ব ছিল এইসব তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করার।' এস. আর. (সুজামুতা) (৮)।

১২৬ অফিসিয়োটিং ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ড টু সেটেলমেন্ট অফিসার অব সুজামুতা, তারিখ ৩/৭/৯২, ডব্লু. ১৪৬-১৮৮৭, (২২)।

১২৭ এস. আর. (সুজামুতা) (৩৫)।

১২৮ বাৎসরিক খাজনাকৃত আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮১,০০০ টাকা। জমি জরীপ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির সময় এই পরিমাণ ছিল ৩,১০,০০০ টাকা যা চার বছরের খাজনাকৃত আয়ের প্রায় সমান। অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ড, পূর্বে উল্লেখিত, (২২)। রায়তদের ক্ষমতার বিচার না করে উচ্চহারে নির্ধারিত খাজনার ভিত্তিতে প্রস্তুত কৃত খাজনা তালিকা বজায় রাখা ছিল তালুক পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রধান কৃষকদের (যেমন, কৈবর্ত) ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করেছে। 'বর্ধমান রাজ সুজামুতা তালুকটি ক্রয় করার পর খাজনার হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়, কিছু কৈবর্ত রায়ত বর্ধমান রাজকে পুরানো খাজনার হার মোতাবেক রাখতে বাধ্য করেন।' রায়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১৭২।

১২৯ বি. বি. সামন্তের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার কাকুবাড়িতে, তারিখ ৯/২/৮১। তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমান রাজের কাজলগর কাছারির একজন পোদ্দার ছিলেন, এরপর ১৯৫৪ সালে কাছারির অবসানের সময় পর্যন্ত তিনি ক্যাশিয়ার ছিলেন।

১৩০ শ্রীসামন্তের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

১৩১ সাইদপুর ট্রাস্ট এস্টেট পত্তনি রায়ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেই সময়ে অতটা উন্নত হয়নি, যতটা ১৮৮০-র দশকে হয়েছিল। চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩২ সোনামুখি সার্কেল অফিসের সংগঠন মোটামুটি এরকম ছিল ঃ ১জন সার্কেল অফিসার, ৪জন করণিক, ১ বা ২ জন আমিন, ১ জন পিওন, ১ জন বেয়ারা, ১ জন পাচক এবং ১ জন ভৃত্য। একজন সার্কেল অফিসারের অধীনে ২০ থেকে ২২ জন তহশিলদার থাকত। সার্কেল অফিস বাঁকুড়াস্থিত সাব-ম্যানেজারের অফিসের অধস্তন ছিল, যা ছয়টি সার্কেল অফিসকে নিয়ন্ত্রণ করত। গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীগুলি ছিল তহশিলদারদের হিসাব-সংক্রান্ত নথীগুলির পরীক্ষণ করা এবং জমিসত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাদির মীমাংসা করা। সোনামুখিতে শ্রী শরদিন্দু ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকার, তারিখ ৪/১২/৮২।

তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বর্ধমান রাজার অধীনস্থ একজন সার্কেল অফিসার ছিলেন।

১৩৩ এ. আর. (বর্ধমান) (২৫)।

১৩৪ ডব্লু. ই. (৮৬/৭) (২৬)।

১৩৫ আইন সংক্রান্ত ব্যয় এই সরকারি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৩৬ কোর্ট অব ওয়ার্ড ব্যবস্থাদি (১৮৮৫-৬) গৃহীত হওয়ার প্রথম বৎসরে বিবৃত্তি দেওয়া হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের পরিমাণ ছিল চলনসই। কমিশনার (বর্ধমান) টু সেক্রেটারি বি আর, তারিখ ২৯/৪/৮৬, পূর্বে উল্লেখিত (২), ডব্লু. ই. (১৫/৬) (২৭)।

১৩৭ তালুকের আইনজীবীদের দ্বারা বলতে মাসগ্রেভ বুঝিয়েছিলেন যে, আইনজীবীরা একটি গোষ্ঠী তৈরী করে ফেলেছিল যা পুরোপুরি জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না, এবং এই গোষ্ঠী তালুক পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। মাসগ্রেভ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৬৮। এই বিষয়ে লেখকের মন্তব্যের জন্য দেখুন, লেখক রচিত "দ্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ইন দ্য নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, এ কেস স্টাডি অফ দ্য বর্ধমান রাজ", *আজিয়া ফেনকিউ*, ৩১-৪, ১৯৮৫, পৃ. ৪৬-৮৭।

১৩৮ গ্রামের প্রহরীরা জীবিকাসূত্রে জমিসত্ত্ব পেত।

১৩৯ সীমান্ত গিরিপথগুলির একজন রক্ষক ছিলেন।

১৪০ এ. আর. (বর্ধমান) (২৮)।

১৪১ এ. আর. (বর্ধমান) (২৫)। অষ্টম নীলামের জন্য এই প্রবন্ধের ৩.১ নং অনুচ্ছেদ ২ নং অংশ দ্রষ্টব্য।

১৪২ এ. আর. (বর্ধমান) (২৫)।

১৪৩ ডব্লু. ই. (৮৫/৬) (২৭)।

১৪৪ "ভারতীয় সমাজের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা সভাসদদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে যাচ্ছিলেন এই ধরনের ব্যাখ্যার রীতি সম্প্রতি চালু হয়েছে ...." মেটকাফ্, টি. আর., *ল্যাণ্ড, ল্যাণ্ডলর্ডস্ অ্যাণ্ড দ্য ব্রিটিশ রাজ*, ১৯৭৯, পৃ. ২৭০।

১৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩-৪। সার্থক পরিচালন ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব ছিল নিম্নোক্ত দুটি উপায়ে : (১) জয়কৃষ্ণের স্বার্থে আঘাত হানবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পারবে এই উদ্দেশ্যে অনবরত নিজের প্রতিনিধির পরিবর্তন, এবং (২) জমিদারি সংক্রান্ত তথ্যগুলির সুসজ্জিতভাবে সংরক্ষণ করা। মুখার্জী, এন., পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০৬।

১৪৬ "যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতি কিছুদিন আগে পর্যন্ত একই সাথে হয়েছিল সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ এবং বে-উপনিবেশায়ন-এর প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করা উচিত এক এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি প্রক্রিয়া হিসাবে। এই প্রক্রিয়ার একটি বিষয়ের আলোচনাকে অপর বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা উচিত। সুতরাং, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর্যালোচনার জন্য এর উত্থানের কাহিনীরও আলোচনা প্রয়োজন।" থমলিনসন, বি. আর., *দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য রাজ, ১৯১৪-১৯৪৭ : দ্য ইকনমিস অব ডিকোলোনাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া*, ১৯৭৯।

১৪৭ ডব্লু. ই. (১৬/৭), এ. আর. (বর্ধমান) (১৮)। এইসব প্রধান কোষাগার ছাড়া আরও কোষাগার ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড কর্তৃক কিছু কোষাগার একত্রিত হওয়ার আগে যে সকল কোষাগার এই তালুকের ছিল সে সম্পর্কে সরকারি তথ্য পরিবেশন করেছে।

১৪৮ এ. আর. (বর্ধমান) (১৮)।

১৪৯ ডব্লু. ই. (৮৬/৭) (৩২), এ. আর. (বর্ধমান) (১৯), ম্যানেজার টু কালেক্টর (বর্ধমান), তারিখ, বর্ধমান, ২৪/২/৮৭, ডব্লু. ২৭০-১৮৮৫।

১৫০ ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল বিভিন্ন জমিদারদের টাকা ঋণ দিত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফৈজাবাদের মেহেদোনা তালুকটি তার ঋণীকৃত অর্থ ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলকে ফেরত দিয়ে দেয়। এই ঋণের পরিমাণ ছিল সেই তালুকের এক বছরের আয়ের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি পরিমাণ টাকা। মেটকাফ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪০৯।

১৫১ সরকারি জামিনপত্রগুলি সাধারণত দোয়াগের মহারাণীর নামে হত। বর্ধমান রাজ তালুকের প্রতি তার অধিকার বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তির শর্ত হিসাবে এই জামিন পত্রগুলি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল (বর্ধমান দত্তক মামলা অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অধিগ্রহণের পর রেলওয়ে ডিবেঞ্চারগুলি ও সরকারি জামিন পত্রগুলি কম্পট্রোলার জেনারেলের কাছে অর্পণ করা হয়। এই জামিন পত্রগুলি ক্রয় করা হয়েছিল অংশত পত্তনিদার এবং আমলাদের নগদ বন্ধকীকৃত অর্থের দ্বারা এবং অংশত জয়েন্ট ম্যানেজারদের কাছে তালুকের গচ্ছিত অর্থের দ্বারা।

অনুবাদ ঃ সজল বসু
স্বতঃসিদ্ধ সরকার

৩

দক্ষিণ বাংলাদেশে এক তালুকদারি গ্রামের ঐতিহাসিক বিবর্তন

মাসাইয়ুকি উসুদা

প্রথম ভাগ ঃ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের কোনো আলোচনা বা সমীক্ষায় একটি গ্রাম নির্বাচন করা হয় সে অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে সেই গ্রামটি কি কারণে বিশিষ্ট, এই কথা মনে রেখে। আমাদের এই সমীক্ষায় গ্রাম-নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত ধারণার অনেকটাই বাইরে। যদি আমাদের লক্ষ্য হতো গ্রামের কৃষিনীতির রূপায়নের স্বরূপ সন্ধান, সেক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, সমীক্ষাক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল ওয়াজিরপুর উপজেলা যা-কিনা পূর্বতন থানা, বা খুলনা জেলা সংলগ্ন পশ্চিমের উপজেলা— কেননা এই অঞ্চল রবি মরসুমের উচ্চফলনশীল চাষের সঙ্গে জড়িত।[১] এই নির্দিষ্ট গ্রামটির নির্বাচনে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বই বিচার করা হয়েছে, সম্পূর্ণত উপেক্ষা করা হয়েছে অঞ্চলটির কৃষি সামাজিক চরিত্রলক্ষণ। স্বদেশি বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা 'মহাত্মা' অশ্বিনীকুমার দত্তের (১৮৫৬ - ১৯২৩) পৈতৃকভিটা এই গ্রাম। আমার গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় ছিল অশ্বিনীকুমারের জীবন ও সাধনা। ফলে সমীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বরিশাল জেলার কোনো একটি গ্রাম নির্বাচনের প্রস্তাব যখন দেওয়া হল, খুব সঙ্গত কারণেই হরহর গ্রাম নির্বাচনের উত্তেজনা গোপন রাখতে পারিনি।

১. ভূমিকা

ইতিহাসকেন্দ্রিক বিবরণই বর্তমান প্রতিবেদনের মূল বিষয়; সময়কাল ঃ বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে বা কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময় — যখন বাংলার সমাজ জীবনে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার আসছে। সমকালীন গ্রামসমাজের স্বরূপ বোঝা যায় 'হকিয়তের খেওয়াত' (স্বত্ব সাব্যস্তের বা নির্ণয়ের মামলার কাগজপত্র), 'রায়তি খতিয়ান' (ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত নথিপত্র), পত্তনি পঞ্জিকা বা এস্‌টেট ক্যালেন্ডার, গ্রামবিষয়ক বিচিত্র কাগজপত্র-দলিলগুচ্ছ বা বিরেজ বাণ্ডিল থেকে। বরিশাল মহাফেজখানায় রক্ষিত এই সমস্ত কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ থেকে সামাজিক সম্পর্কের বিশদ ইতিহাস জানা যায়, বিশেষত জমিস্বত্ব ও খাজনা বিষয়ে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষিজ প্রক্রিয়া ও গ্রামজীবনের সমাজ-সংস্কৃতির বিষয়ে এইসব নথিপত্র একেবারেই নীরব।[২] এই গ্রামে

তিন মাস বসবাসের দরুণ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকরণ বিশ্লেষণের সূত্র সন্ধান করতে পারি।[৩]

বর্তমান সমীক্ষা-প্রতিবেদনের তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অংশে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম-সমীক্ষার মধ্য দিয়ে অঞ্চলটির সাধারণ পরিচয়; দ্বিতীয় পর্বে মূল আলোচ্য বিষয় ঃ জরিপের দরুণ যে সমস্ত পরিবর্তন হয়েছে, এবং তৃতীয় পর্বে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। গ্রামে থাকার সুবাদে সংগৃহীত অভিজ্ঞতায় কয়েকটি ধরনের পর্যালোচনা করা যেতে পারে যা-কিনা গ্রামবাসীদের জনসংখ্যাজনিত সমস্যার সমাধান করবার একটি দিশা দেখাতেও পারে।

এই সমীক্ষা-প্রতিবেদনটি জাপান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের গবেষণা অনুদানের আর্থিক সহায়তায় ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ল্যাংগুয়েজেস অ্যাণ্ড কালচার অফ এশিয়া অ্যাণ্ড আফ্রিকার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন' শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্পের অংশবিশেষ। অক্টোবর ১৯৮৫ থেকে মার্চ ১৯৮৬ সময়কালে এই সমীক্ষা করা হয়।

২. বরিশাল জেলা

সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত গ্রাম, হরহর, বরিশাল জেলার অন্তর্গত। ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বরিশাল জেলার সীমানার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, পিরোজপুর মহকুমার দুটি থানা নিয়ে পটুয়াখালি মহকুমাটি ১৯৬৯ সালে বরিশাল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে খুলনা বিভাগে পউখালি নাম নিয়ে নতুন জেলা হয়।[৪] দ্বিতীয়ত, ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্র ও সীমানার খোলনলচে বদল হলে পূর্বেকার জেলা চিহ্নিত হল প্রশাসনিক ক্ষেত্র বা অঞ্চল হিসাবে, জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গিয়ে দাঁড়াল ৬৪ (এই সমীক্ষার সময় পর্যন্ত)। ফলে কমে গেল পূর্বেকার আয়তন। বরিশাল প্রশাসনিক অঞ্চল বা ক্ষেত্র তৈরি হল বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা এই চারটি জেলা নিয়ে। বরিশাল আগে ছিল ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত, এবার তার অন্তর্ভুক্তি হল খুলনা বিভাগে।

সারণি ঃ ১.১-এ বরিশাল অঞ্চলের চারটি জেলার মূল পরিসংখ্যানের নির্বাচিত তথ্য পরিবেশিত হল। বাংলাদেশের জনবিন্যাসে লক্ষ্য করা যায় শহরের আয়তনের বিভিন্নতায় — আয়তন অনুসারে মাঝারি, বড় ও বৃহত্তর — জনঘনত্ব গড়ে ওঠে। ফলে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে জনসংখ্যা হাজার কি তার বেশি হলে স্বাভাবিক প্রবণতা হল, অন্য কোথাও নয়, ঢাকা অঞ্চল কেন্দ্র করে একীভূত হওয়া; এই জনকেন্দ্রিকতার ঝোঁক কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় বৃহত্তর জনঘনত্ব লক্ষ্য করা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চল কেন্দ্র করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর চট্টগ্রাম। বরিশাল জেলার কোতয়ারি উপজেলা জেলাসদর অঞ্চলগুলিসহ জনঘনত্বে প্রধান অঞ্চল, প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ১২১০ জন। গৌরনদী উপজেলা যার অন্তর্গত আমাদের এই সমীক্ষার গ্রাম সেখানেও জনঘনত্ব বেশ বেশি, প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৯৮৩ জন। প্রকৃতপক্ষে যমুনা ও প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর বরাবর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাতেই বাংলাদেশের জনবসতির বিন্যাস সবচেয়ে বেশি।[৫]

পলিমাটি বহন ও ধারণক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায় যে, জনঘনত্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কৃষিজ উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ভূমিরূপ গঠনের দিক থেকে বরিশাল জেলার অধিকাংশই গঙ্গাবিধৌত অঞ্চল। উত্তর-পূর্বের মেঘনামুখি প্রান্তসীমাও এই গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলের অন্তর্গত; উত্তর-পশ্চিমের মেঘনার প্রাচীন মোহনাপথের বন্যাবিধৌত অঞ্চল অংশত বরিশাল-ফরিদপুর সীমানা ছুঁয়ে গেছে। জেলার পশ্চিমতম-প্রান্ত 'ফরিদপুর নিম্নচাপ' অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত।

সারণি ঃ ১.১ বরিশাল জেলার উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান ১৯৮১-র জনগণনার ভিত্তিতে

১. অঞ্চল	ক) নদী অঞ্চলসহ		৭,২৯৯ বর্গকিমি	(১৪৪০০০ বর্গকিমি)	৫.১%
	খ) নদী অঞ্চলবাদে		৫,৮৭৩ বর্গকিমি	(১৩৬১৭০ বর্গকিমি)	৪.৩%
২. জনসংখ্যা	ক) মোট		৪,৬৬৬,৭৩৪	(৮৭১১৯৯৬৫)	৫.৪%
	খ) শহরাঞ্চলে		৫৫৮,৩৬৩	(১৩২২৭৬২৫)	৪.২%
	গ) গ্রামাঞ্চলে		৪,১০৮,৩৭১	(৭৩৮৯২৩৪০)	৫.৬%
	ঘ) শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব		১২.০%	(১৫.২%)	
৩. জনঘনত্ব	ক) নদী অঞ্চলসহ		৬৩৯	(৬০৫)	
	খ) নদী অঞ্চলবাদে		৭৯৫	(৬৪০)	
৪. পরিবার ('খানা')-এর সংখ্যা					
	ক) 'খানা' / পরিবারের সংখ্যা	ক) মোট	৮৩৮,৩৫০	(১৫০৭৫৮৮৭)	৫.৬%
		খ) শহরাঞ্চলে	৯০,৯৯৫	(২১৯৮৬৫৪)	৪.১%
		গ) গ্রামাঞ্চলে	৭৪৭,৩৫	(১২৮৭৭২৩৩)	৫.৮%
	খ) 'খানা' / পরিবারের মাপ	ক) মোট	৫.৫ জন	(৫.৭ জন)	
		খ) শহবাঞ্চলে	৫.৯ জন	(৫.৯ জন)	
		গ) গ্রামাঞ্চলে	৫.৫ জন	(৫.৭ জন)	
৫. শিক্ষার হার	ক) মোট		৩৩.৭%	(২৩.৮%)	
	খ) শহরাঞ্চলে		৪৬.৮%	(৪০.৭%)	
	গ) গ্রামাঞ্চলে		৩১.৮%	(২০.৬%)	
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান					
	বিশ্ববিদ্যালয়		০	(৭)	
	মেডিকেল কলেজ		১	(৯)	১১.১%
	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ		০	(৩)	
	কলেজ		৩৯	(৬০০)	৬.৫%
	উচ্চ ও জুনিয়ার হাই স্কুল		৬৯৫	(৯০০০)	৭.৭%
	প্রাথমিক বিদ্যালয়		৩,০০৯	(৪৪০০০)	৬.৮%
	মাদ্রাসা		৫২৯	(৬৬২৮)	৮.০%
৭. প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ		মহকুমা	৫	(৭১)	৭.০%
		থানা	২৭	(৪৭৮)	৫.৬%
		ইউনিয়ন	২২৪	(৪৩৫৪)	৫.১%
		মৌজা	২,২৩৫	(৫৫৬৩৫)	৪.০%
		গ্রাম	২,৭৪৯	(৮৬৬৬২)	৩.২%
		মিউনিসিপ্যালিটি	৪	(৭৭)	৫.২%
		উপজেলা	২৮		

মোটামুটিভাবে বলা যায়, গঙ্গাবিধৌত অঞ্চল চুনামাটিতে পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে গঙ্গা ও মেঘনার পুরানো মোহানা পথবাহিত অঞ্চল চুনাযুক্ত নয়। 'ফরিদপুর নিম্নচাপ'-

এর দরুণ জেলাটি অঙ্গারীভূত উদ্ভিজ্জ পদার্থে পূর্ণ।

পটুয়াখালির মতো বরিশাল জেলা নদী বিভাজ্য নয়, যদিও অসংখ্য নদী, খাঁড়ি, খাল সমৃদ্ধ। যেমন, হরহর গ্রাম বরিশাল থেকে মাত্র ১৮ মাইল দূরে, মাঝে দুটি নদী শিকরপুর আর দ্বারিকাদন — যাদের স্থানীয় নাম সন্ধ্যা নদী। নদী দুটি ফেরিতে পার হয়ে বরিশাল শহর থেকে বাসে দু-ঘন্টার বেশি পথ। ছোট ছোট খাল সংযুক্ত নদীগুলি শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যই নয়, কৃষি ও উন্নয়নের কারণেও গুরুত্বপূর্ণ।

বরিশালের গড় তাপমাত্রা ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মে মাসে; সর্বনিম্ন ডিসেম্বর মাসে ১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৭৯-৮০ থেকে পরবর্তী তিন বছরের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২,১৮২.৫ মিলিমিটার — জুন থেকে অক্টোবর বর্ষাকালীণ মরসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমান ১,৬৪৩.৪ মিলিমিটার, নভেম্বর - ফেব্রুয়ারির শুখা মরসুমে ৯০.৮ এবং মার্চ থেকে মে সময়কালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৪৮.৩ মিলিমিটার। যদিও চাষবাসে বৃষ্টিপাতজনিত জলসিঞ্চনের তুলনায় বন্যার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা বর্ষার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গী। মূলত দুই মরসুমে সাইক্লোন দেখা যায়— এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর। বিশেষত উপকূলবর্তী অঞ্চলে সাইক্লোন বিধ্বংসী রূপ নেয়। আর, এই গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ পান, যা যে-কোনো ধরনের ঝোড়ো বাতাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বরিশালের কৃষি অর্থনীতি এই প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর। বাখরগঞ্জ ছিল 'বঙ্গের শস্যভাণ্ডার'। বিশ শতকের গোড়ায় সমগ্র বঙ্গ প্রদেশের সাংসরিক মোট শস্যের ৩০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ মণ ধান রপ্তানি করত বরিশাল জেলা।[৬] জেলার দক্ষিণাংশ, এখনকার পটুয়াখালি অঞ্চল, ছিল 'বঙ্গের শস্যভাণ্ডার'-এর ধান উৎপাদনের মূলকেন্দ্র; এখন যে-অঞ্চল আমন ধানের একফসলি নতুন ক্ষেত্র। অন্যদিকে জেলার উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ বরিশাল অঞ্চল, সুদুর অতীত থেকে ধান উৎপাদন ক্ষেত্র হলেও দক্ষিণাংশের 'শস্যভাণ্ডার'-এর মতো সমৃদ্ধ ছিল না। ১৯০০-০৮ এর 'সেটলমেন্ট অপারেশন'-এ উত্তর ও দক্ষিণের কৃষিনির্ভর পরিবারের গড় আয়ে এই পার্থক্য স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। যেমন শাহবাজপুর মহকুমায় কৃষিপরিবারপিছু আয় (১৯০০-০৮) ছিল ২৩৩ টাকা, পটুয়াখালি মহকুমায় সেখানে ২৪৪ টাকা, সদর মহকুমায় ১৮৩ টাকা আর ১৩৩ টাকা পিরোজপুর মহকুমা অঞ্চলে।[৭] এমনকি ১৯৭৭-৭৮ সালেও পটুয়াখালি খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর যেখানে বরিশালের ঘাটতি ১৫ শতাংশ।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, জেলার দক্ষিণে আমন ও উত্তরে আউশ ধানের চাষের গুরুত্বের উৎসে আছে ঐতিহ্য পরম্পরাগত।[৮] 'সেটেল্‌মেন্ট অপারেশন'(১৯০০-০৮)-এর কালে বোরোচাষ ছিল অপাংক্তেয়, আর আমনের তুলনায় আউশের চাষ ছিল ১ঃ৯। বর্তমানে (১৯৮১-৮২) বরিশাল অঞ্চলে আমন ঃ আউশ ঃ বোরো ধানচাষের তুলনা-মূলক অনুপাত ৫১ ঃ ২২ঃ ২৭।[৯]

৩. গৌরনদী উপজেলা (থানা)

উচ্চফলনশীল বীজ প্রবর্তনের ফলে চাষের রীতিনীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। চাষের

ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সমীক্ষা-অঞ্চলের সবিশেষ আলোচনা জরুরি। গৌরনদী উপজেলার তিন ধরনের ধানচাষের অনুপাত, আমন ঃ ৫৩, আউশ ঃ ৩৬, বোরো ঃ ১১; ধান উৎপাদনের অনুপাত আমন ঃ ৫২, আউশ ঃ ২২, বোরো ঃ ২৬।[১০] কিন্তু *বেসিক স্ট্যাটিসটিকস অফ বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল সিরিজ* ২এ অনুপাত দেখানো হয়েছে আমন ঃ ৪১, আউশ ঃ ৫২, বোরো ঃ ৮। গৌরনদীকে একটি বিচ্ছিন্ন থানা হিসাবে বিচার করে দেখানো হয়েছে এই অঞ্চলের প্রবণতা হচ্ছে আউশচাষে; যদিও পরিপার্শ্বিক অন্যান্য অঞ্চলে মূল চাষ আমন ধানের।[১১] অন্যদিকে *ঈশাক কমিশনের রিপোর্ট*, ১৯৪৪-৪৫-এ প্রকাশিত তথ্যানুসারে এই অনুপাত আমন ঃ ৭৬, আউশ ঃ ২৪, বোরো ঃ ০।[১২] তথ্যের পূর্বাপরতার বিচারে দেখা যায় গৌরনদীর মূল ধানচাষ আমন, *বেসিক স্ট্যাটিসটিকস* সংকলন ও সম্পাদনার সময়ে নিশ্চিতভাবে কোনো ভুল হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমনচাষের ক্ষেত্র, গৌরনদী উপজেলা খুব সঙ্গতভাবেই সে অঞ্চলের অন্তর্গত। উপজেলার ৭৪ হাজার একর জমির মধ্যে ১০০০ একর জমি সাময়িকভাবে অকর্ষিত এবং ৫০ হাজার একর জমি চাষের আওতাভুক্ত। এই ৫০ হাজার একর আদত কৃষিজমি তিনভাগে বিভক্ত ঃ ২৬,০০০ একর একফসলি জমি, দো-ফসলি ১৫,০০০ একর, ৯,০০০ একর জমি তিন ফসলি। ফলনশীল মোট এলাকা ৮৩ হাজার একর, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৬।[১৩]

সারণি ঃ ১.২ গৌরনদী উপজেলার আমন, আউশ ও বোরো ধানের অঞ্চল ও উৎপাদন ঃ ১৯৭৯-৮০

শস্য	অ =১০০ একরে উ =১০০ মণের হিসাবে		আঞ্চলিক	উচ্চফলনশীল	পাজাম	মোট
আমন	অ	রোলন করা	১১২	২০	-	৩৯০
		ছিটানো	২৫৮			
	উ	রোলন করা	১,১৫৬	৩৮৬	-	৪,০২৯
		ছিটানো	২,৪৮৭			
আউশ	অ		২০৯	১৬	-	২২৫
	উ		২,৭৬০	৪০৪	-	৩,১৬৪
বোরো	অ		১৬	৯৭	-	১১৩
	উ		২১৯	২,৬৩৭	-	২,৮৫৬

সূত্র ঃ *উপজেলা স্ট্যাটিসটিকস*, খণ্ড ২

কর্ষণযোগ্য ৮৩ হাজার একর জমির মধ্যে ৭৩ হাজার একর ধান উৎপাদন অঞ্চল। প্রচলিত ধানচাষ হল আমন। প্রকৃতপক্ষে *বেসিক স্ট্যাটিসটিকস*, ১৯৭৯-৮০-এর পরিসংখ্যান রীতিমতো ব্যতিক্রমী। 'ঈশাক কমিশন রিপোর্ট'-এর হিসাব অনুযায়ী ধানজমির ক্ষেত্রে আমন খেতের পরিমাপ ৪৫,৫৩৬.৮৯ একর, আউশের ক্ষেত্রে ১৪,৬০৩.৬৫ একর এবং ২৬.৮৯ একর জমি বোরো ধানের। এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি ১৯৮২-৮৩ সালের 'উপজেলা স্ট্যাটিসটিকস'-এ দেখানো হয়েছে আমন জমি ৪৫,৬০০ একর, ২২,৫০০ একর আউশ জমি, ১০,৬০০ একর বোরো ধানজমি। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে

তিন বছরে বীজ ছড়িয়ে আমনচাষ ও রোয়াচাষে আমন জমির সাকুল্যে পরিমাপ হল যথাক্রমে ৩৪,০০০ ও ১০,৮০০ একর। গৌরনদীতে আমন ও আউশ দু-ফসলি। রোয়াচাষ ও বীজ ছড়িয়ে আমনচাষের অনুপাত ৩ ঃ ১।

শুধুমাত্র ধান নয়, গৌরনদী বিভিন্ন শস্যচাষের ক্ষেত্র। ১৯৮১-৮২-তে পাটচাষ হয় ২,৬৬০ একর জমিতে যা-কিনা মোট কর্ষিতক্ষেত্রের শতকরা ৫.৩ অংশ, ৪০০ একর বা ০.৮ শতাংশ অঞ্চলে আখচাষ এবং ০.৪ শতাংশ অর্থাৎ ২০০ একর জমিতে গমচাষ হয়। ৩০০ একরেরও বেশি মুগ, মুসুর, খেসারি, কলাই, তিল ও সরষেচাষের জমি, এই ফসলই মূল রবিশস্য। এছাড়া লঙ্কা (৫৩০ একর), রসুন (১৯০ একর), মুলো (১৫০ একর) এবং আলু (১০০ একর)-র চাষ ব্যাপক। জেলার অর্থনীতিতে ফলের চাষের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারকেল-তাল-সুপারি-আম-কাঁঠাল গাছে ঘেরা চাষিদের ঘরবাড়ি। পান-সুপারি বাংলার গ্রামীণ জীবনে সাংস্কৃতিক চিহ্ন যেমন, সেভাবেই গ্রামীণ মানুষের নিত্যকার অভ্যাস; গৌরনদী উপজেলাতেও পান, সুপারির চাষ লক্ষণীয় স্থান অধিকার করে।

সারণি ঃ ১.৩ গৌরনদী-র লোকসংখ্যা ঃ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৮১
মুসলমান	১১৪১৭৬	৯৮৮২২	৬১৯৭৫	৭০১৭৮	-	৯২৩০২	১১৬৪৩২	১৯৫১০৫
	৪৮%	-	৪১%	৪২%	-	-	৫৬%	৬৫%
হিন্দু	১২১০৪৮	১২০৭৭৩	৮৬৮১৭	৯৩৪৮৩	-	৭২৫৭২	৮৬৫৭৭	৯৯০১০
	৫১%		৫৭%	৫৬%		-	৪২%	৩৩%
খ্রিস্টান	৩৭১০	৪০৯২	৩৩০২	৩৯০৬	-	-	-	৬০৯০
	১%	-	২%	২%	-	-	-	২%
মোট	২৩৮৯৩৪	-	১৫২০৯৪	১৬৭৫৬৭	-	-	২০৮০৮৭	৩০০৩৫৯
মন্তব্য		মুলাদি বাদে						

১৯০১-এর জনগণনায় গৌরনদী ছিল অন্যতম থানা-অঞ্চল যেখানে হিন্দু সম্প্রদায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ— জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ মুসলমানদের ক্ষেত্রে, হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৫১ শতাংশ। ধর্মাশ্রয়ীগোষ্ঠী হিসাবে জনসংখ্যার এই অনুপাত ১৯৪৭ পর্যন্ত একই ছিল; ১৯৩১-এর জনগণনা অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৩,৪৮৩ জন অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ এবং ৭০,১৭৮ জন অর্থাৎ ৪২ শতাংশ। ১৯৫১-র জনগণনায় চিত্রটি ঠিক বিপরীত হয়ে যায়, মুসলমান ৯২,৩০২ জন, এবং হিন্দু জনসংখ্যা কমে এসে দাঁড়ায় ৭২,৫৭২ জন-এ। দেশভাগের কারণে বৃহদ্‌সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশান্তরী হয়ে যাওয়াই এর অন্যতম কারণ। বর্তমান জনগোষ্ঠীর ৬৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৯৫,১০৫ জন মুসলমান, ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ ৯৯,০১০ জন হিন্দু এবং ৬,০৯০ জন অর্থাৎ ২ শতাংশ খ্রিস্টান।

৩০৩ বর্গ-কিলোমিটার বিস্তৃত গৌরনদী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,০০,৩৫৯ জন, জনঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৯৯১ জন। এই সংখ্যা সমগ্র জেলার নিরিখে (৬৪৫ জন) অনেক বেশি।

বরিশাল, স্বরূপকাঠি, আড়িয়ল খান তিন নদীর মধ্যবর্তী গৌরনদীর সম্পর্কে ১৮৭০ সালে শিক্ষাবিভাগের জনৈক পরিদর্শক জানিয়েছিলেন ঃ এই অঞ্চলটি পূর্ববঙ্গের শিক্ষা

সম্পর্কে 'অত্যন্ত অগ্রসর'।[১৪] যদিও সমগ্রভাবে দেখলে সমস্ত পূর্ববঙ্গ পিছিয়ে ছিল, সাধারণত বলা হয় শিক্ষার উচ্চমানের সঙ্গে 'ভদ্রলোক'-এর শুধু সম্পর্ক। ১৯০১-এর জনগণনানুযায়ী বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি থানা অঞ্চলে শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রসার লক্ষ্য করা যায়। গৌরনদী ছিল ঠিক তারপরেই। এই সময়কালে গৌরনদীতে শিক্ষিত হিন্দু ১৪.২ শতাংশ, মুসলমানদের মধ্যে ৫.৬ শতাংশ — এই পরিসংখ্যান জেলার গড়, অর্থাৎ ১৩.৫ শতাংশ হিন্দু ও ৭.৭ শতাংশ মুসলমান, থেকে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে একটু ভালো। ১৯৩১-এর জনগণনায়ও এই অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি, পরিসংখ্যানে দেখা যায় শিক্ষিত হিন্দু ২৭.১ শতাংশ এবং শিক্ষিত মুসলমান ৭.৭ শতাংশ। উল্লেখ করার, ১৯৩১-এ জেলার শিক্ষিত জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ২৪.৬ ও

সারণি ঃ ১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ গৌরনদী, ১৯৮৫

কলেজ	২
কলেজ (চারুশিল্প)	১
সরকারি স্কুল	১
সেকেণ্ডারি স্কুল	
সহশিক্ষা	২৫
মেয়েদের	২
লোয়ার সেকেণ্ডারি স্কুল	
সহশিক্ষা	১
মেয়েদের	২
মাদ্রাসা আলিম (হায়ার সেকেণ্ডারি)	১
দাখিল (সেকেণ্ডারি)	৩
ইবতেদায়ী (প্রাথমিক)	২৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮০
শিক্ষকের সংখ্যা	২৪৭
শিক্ষিকার সংখ্যা	৭৪
ছাত্রসংখ্যা	

শ্রেণী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
প্রথম	৬১৯৫	৫২৭৪	১০৬৪৯
দ্বিতীয়	১৭২৫	১৬০৩	৩৩২৮
তৃতীয়	১২০৮	১৩৩০	২৮৩৮
চতুর্থ	১১৩৩	১২৪২	২৩৭৫
পঞ্চম	১০৩৬	৯৫৫	১৯৯৭
মোট	১০৪৭৭	১০৪০৪	২০৮৮১

** ৫ -১০ বছর বয়সের প্রায় ৩,০০০ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না।

সূত্র ঃ উপজেলা অফিস-প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই সারণি তৈরি করা হয়েছে।

৬.৯ শতাংশ। এমনকি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশেও গৌরনদীর শিক্ষিতের হার জেলার সামগ্রিক শিক্ষিত জনসংখ্যার হারের প্রায় কাছাকাছিই। সামান্য কম হলেও ১৯৭৪ সালে জেলার শিক্ষিত জনসংখ্যার গড় ২৫.১ শতাংশের তুলনায় গৌরনদীতে ছিল ২৪.৯ শতাংশ যা ১৯৮১-র পরিসংখ্যানে গিয়ে দাঁড়ায় ২৮.৩ শতাংশে, যখন জেলার শিক্ষিতের হার কিন্তু ২৮.০ শতাংশ। সারণি ঃ ১.৪-এ গৌরনদী উপজেলার বর্তমান শিক্ষাচিত্র দেওয়া হল।

মুসলমান 'খানা'র সংখ্যা ২,০৪০ ও হিন্দু 'খানা' ১,৪৬০। এছাড়া, খ্রিস্টান 'খানা' ১৩টি। এককথায়, প্রতি দশজনে ৬ জন মুসলমান, হিন্দু ৪ জন। কিন্তু এই পরিসংখ্যানও সবত্র একভাবে নেহ ঃ জনসংখ্যার মাপকাঠতে পাচাট গ্রাম হিন্দুপ্রধান, বাক চোদ্দোটতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু। উল্লেখ করার, ইউনিয়নের উত্তরদিকে, ৩ নম্বর ওয়ার্ড, কোনও হিন্দুগ্রাম নেই।

সারণি ঃ ১.৫ ধর্মীয়গোষ্ঠী অনুযায়ী 'খানা' / পরিবার

গ্রামের নাম	মুসলমান	হিন্দু	মোট
ওয়ার্ড ঃ ১			
১. লক্ষ্মণকাঠি	৩৫৭	১৫	৩৭২
২. খেয়াঘাট	১০৭	৬৯	১৭৬
৩. জয়সিরকাঠি	৪৭	৫৭	১০৪
৪. উত্তর-পশ্চিম চন্দ্রহার	৭	৪২	৪৯
৫. দেওপাড়া	৭৬	১০৩	১৭৯
৬. দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়া	৫৮	৩৬	৯৪
ওয়ার্ড ঃ ২			
১. হরহর	৩৩	১০৬	১৩৯
২. বাটাজোর	১৭৩	৭৫	২৪৮
৩. বাছার	১৩	৯৯	১১২
৪. পশ্চিম চন্দ্রহার	৪৭	৪১	৮৮
৫. চন্দ্রহার	৬৭	৮৯	১৫৬
৬. সৌলাকর	৯৭	৫৫	১৫২
৭. সিংগা	১৩৩	২৭	১৬০
ওয়ার্ড ঃ ৩			
১. বাসুদেব পাড়া	২৪৬	৮০	৩২৬
২. বাহাদুরপুর	২২৬	৪	২৩০
৩. খিফাহতনগর	৩৫	৫০	৮৫
৪. নোয়াপাড়া	১৪৪	১২	১৫৬
৫. বাঁকুড়া	১৩৮	১৪	১৫২
৬. পূর্ব চন্দ্রহার	৩৬	২৯	১৬০

ইউনিয়ন পরিষদের গঠনগত বিন্যাস থেকেও হিন্দু-মুসলমান অনুপাত মানানসই নয়। বারো জন সদস্যের পরিষদে তিন জন হিন্দু ও তিন জন মহিলা। বিগত নির্বাচনে ৯টি আসনের মধ্যে দুটিতে হিন্দু সদস্য জয়লাভ করেন। স্বাভাবিকই, ২ ঃ ৯ অনুপাতে (০.২২ শতাংশ) গ্রামের মোট সংখ্যার (৫ ঃ ১৯/০.২৬ শতাংশ) মধ্যে হিন্দুপ্রধান গ্রামের সংখ্যার খুব কাছাকাছি হলেও মোট জনসংখ্যার হিন্দু অনুপাত ০.৪২ শতাংশ থেকে কম। নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটির দরুন এই বৈষম্য খানিকটা সংশোধন করা হয় ওয়ার্ড ১-এ জনৈকা হিন্দু মহিলার মনোনয়নে, ফলে ইউনিয়ন পরিষদে হিন্দু সদস্যদের অনুপাত ০.২৫ বৃদ্ধি পায়।

মূলত, এইভাবে দেখাই বোধহয় সঠিক যে, বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদের
১ সম্প্রদায়গত বিবেচনাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার

এও বিচার্য যে ১৯৮৪-র নির্বাচনে মুসলমান প্রার্থীর কাছে পরাজিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ১১ বছর জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন পরিষদ সভাপতি। আমাদের আলোচনার তৃতীয় অংশে দেখব যে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাটাজোর ছিল মুক্তাঞ্চল এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র অঞ্চল আওয়ামি লিগের ক্ষমতাধীন ছিল। তাঁর কার্যকালের শেষদিকে ব্রাহ্মণ সভাপতির ঔদ্ধত্য ও ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা চরমে পৌছায়, এই পরিবর্তন তাঁর পরাজয়ের কারণরূপে গণ্য করা যেতে পারে। একই সময়ে দেশব্যাপী মুসলমান চেতনার বিকাশ সমান্তরালে মিলিয়ে দেখা যায়। সাক্ষ্যস্বরূপ বলা যায় এই সময়কালের শেষ পাঁচ বছর ইউনিয়ন অঞ্চলের যত্রতত্র মসজিদ নির্মাণ দ্রুতহারে বেড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই গ্রামীণ মসজিদগুলি কিন্তু সুদৃশ্য পাথরখোচিত মসজিদশৈলীর তুল্য নয়। আকারে ছোট অতি সাধারণ কুটিরের মতো ঢেউখেলানো টিনের বা পাতার ছাউনি দেওয়া

সারণি ঃ ১.৬ বাটাজোর ইউনিয়নে মসজিদের সংখ্যা

ওয়ার্ড	গ্রাম	মসজিদের সংখ্যা ১৯৮৫ - তে	মসজিদের সংখ্যা ১৯৮০ - তে
১	লক্ষ্মণকাঠি	১২	৮
	খেয়াঘাট	৬	৩
	জয়সিরকাঠি	৩	২
	উত্তর-পশ্চিম চন্দ্রহার	০	০
	দেওপাড়া	২	২
	দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়া	১	১
২	হরহর	১	১
	বাটাজোর	৩	২
	বাছার	১	১
	পশ্চিম চন্দ্রহার	২	১
	চন্দ্রহার	২	২
	সৌলাকর	২	২
	সিংগা	৫	৪
৩	বাসুদেব পাড়া	৩	২
	বাহাদুরপুর	৫	৩
	খিফাহতনগর	১	১
	নোয়াপাড়া	৫	৩
	বাঁকুড়া	৩	২
	পূর্ব চন্দ্রহার	২	২
	মসজিদের মোট সংখ্যা	৫৯	৪২

কাঠের তৈরি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের মনে সম্পূর্ণ অন্য ভাবনা জন্ম নিচ্ছিল। দ্রুত বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছিল প্রাক্তন 'মাতব্বর' গোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদে স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তুলনায় সচেতন, ওয়াকিবহাল এক নতুন প্রজন্মের মানুষ। এমনকি 'ফড়ে' ধরনের মানুষজনও যদি জনকার্যের জন্য তহবিল তুলে দিতে পারে তাহলে তাদের সামাজিক অবস্থান বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হতো না। সাধারণ মানুষের ধারণায় সভাপতি বলতে এমন একজন, যিনি কাজের মানুষ — ভালো মুসলমান না সম্ভ্রান্ত 'ভদ্রলোক' তা ততটা বিচার্য নয়।

সত্যি বটে 'মাতব্বর'দের পুরানো জমি সরে যাচ্ছিল, যদিও অঞ্চলের জীবনে এখনও পর্যন্ত তাঁদের কথা মান্য এমনকি ভোটের প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা আছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডে মুসলমান সম্প্রদায় দুটি দলে বিভক্ত ঃ 'গিরস্ত' ও 'কারিকর'। 'গিরস্ত' স্পষ্টতই গৃহস্থ শব্দজাত। জমি-সম্পন্ন 'গিরস্ত' চাষি, লক্ষ্মণকাঠি ও ঘেইয়াকাঠির 'কারিকর'-তাঁতিগোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় গণ্য। বর্তমানে কৃষিজমিকেন্দ্রিক অর্থনীতি দ্রুত হারে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার কারণে আর্থিক উপার্জনের সম্ভাব্য উপায় 'বাজার' নির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য। এদিক থেকে দেখতে গেলে 'কারিকর'-সমাজ তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবমুখী চলতি পথের পথিক। ফলস্বরূপ সামাজিক পদমর্যাদায় ঐতিহ্যগত পার্থক্য-রেখা ক্রমশ মিলিয়ে আসছে। বয়সে প্রবীণ, ন্যায়বাদী, আচার-আচরণে মুক্তমনা, বৈষয়িক জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 'মাতব্বর' ব্যক্তিরা দুই সমাজেরই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন বিশেষ করে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধকৃত্যাদিতে, উরস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে। এঁরা কোনও অর্থেই প্রতিক্রিয়াশীল নন, জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এঁরা জানেন গ্রামজীবনে সম্প্রদায়গত ঐক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বয়ধর্মী সুফি ধর্মমতা-বলম্বী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

বাটাজোর ইউনিয়নের পশ্চিম বরাবর বরিশাল-ফরিদপুর পাকা সড়ক দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জীবনযাত্রায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। গৌরনদী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত বাজারগুলি হয় এই সড়ক বরাবর, নয় আড়িয়ল খান নদীর পার বরাবর। সাপ্তাহিক হাট বসে উত্তর-দক্ষিণের সড়ক জুড়ে। শিকরপুর, বামরাইল, বাটাজোর অঞ্চলে হাটবার হল বৃহস্পতিবার ও রবিবার; মহিলারা বুধ ও শনি; বৃহস্পতিবার কসবায়; মঙ্গল ও শুক্রবার তারকিতে। প্রতিদিনের বাজার থাকায় গৌরনদীতে কোনও হাট নেই। জেলার মানুষের কাছে গৌরনদী বাজার মিষ্টির জন্য জনপ্রিয়। উত্তর বরিশালের কসবার হাট গবাদি পশু কেনাবেচার হাট হিসাবে খ্যাত।

সারণি ঃ ১.৭ মুসলমান গ্রামবাসীর সমাজভুক্তির বিবরণ

সমাজের নাম		'খানা' / পরিবার -এর সংখ্যা
বাটাজোর 'সমাজ'		৮
চন্দ্রহার 'সমাজ'		১০
সিংগা 'সমাজ'		১
লক্ষ্মণকাঠি 'সমাজ'		২
আসোকাঠি 'সমাজ' (মাহিলারা ইউনিয়ন)		২
শিকরপুর 'সমাজ'		৩
আটক 'সমাজ'	(উজিরপুর উপজেলা)	১
দামোদরকাঠি 'সমাজ'		১
মূল সমাজের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন যারা		৬
বহিরাগত		১
মোট		৩৫

বাটাজোর আর তারকির দৈনিক বাজার পান ব্যবসার বাজার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। আড়িয়ল খানের শাখানদী তারকি-নদীনামেই অঞ্চলের নাম; নদীপারেই তারকির রমরমা বাজারশহর। এখান থেকেই ঢাকার লঞ্চ ছাড়ে। তারকির হাট 'পানের হাট' নামে পরিচিত।

বৃহস্পতিবার ও রবিবারের হাট বাদে মঙ্গল ও শনিবারের আলাদাভাবে পানের হাট বসে বাটাজোরে। বাটাজোরের বাজার থেকে পান চাষিরা তারকির হাটে নিয়ে আসে, এই পানের হাট থেকে ঢাকা, চাঁদপুর ও সারা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় লঞ্চযোগে চালান যায়।

সারণী ঃ ১.৮ ১১ নম্বর বাটাজোর ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদ-এর অফিস বাজেট, ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছর

	আয়	টাকা		খরচ	টাকা
১.	খাজনা	৩০,০০০.০০	১.	সেরেস্তা	৫,৫০০.০০
২.	বকেয়া খাজনা	৩২,০০০.০০	২.	সদস্যদের-এর সম্মান অর্থ	১০,৮০০.০০
৩.	সরকার কর্তৃক দেয় চেয়ারম্যান-এর সম্মান অর্থ	১,২০০.০০	৩.	চেয়ারম্যান-এর সম্মান অর্থ	৩,৬০০.০০
			৪.	সম্পাদকদের বেতন	১১,৪০০.০০
৪.	সরকার কর্তৃক দেয় সদস্যদের-এর সম্মান অর্থ	৫,৪০০ ০০	৫.	ঝাড়ুদার/মেথরদের বেতন	৩,৬০০.০০
৫.	সরকার কর্তৃক দেয় সম্পাদকের বেতন	৩,০০০.০০	৬.	খাজনা বাবদে কমিশন (১০ শতাংশ)	৭.০০০
৬.	ঘাটতি বাজেট থেকে প্রাপ্য	৪,০০০.০০	৭.	বকেয়া খাজনা আদায় বাবদে কমিশন	৩,২০০.০০
৭.	উন্নয়ন খাতে বর্ধিত প্রাপ্য	৩,৫০০.০০	৮.	বকেয়া বেতন ও সম্মান অর্থ (সহ-সভাপতি)	২৫,০০০ ০০
৮.	অন্যান্য খাতে প্রাপ্য	৩,০০০.০০			
৯.	সরকার কর্তৃক দেয় গ্রাম পুলিশের বেতন	১৪,৭৬০.০০	৯.	বিচারকমণ্ডলীর সম্মান অর্থ	৩,০০০.০০
			১০.	বিদ্যুৎ-এর বিল	১,৮০০.০০
১০.	মেলা বাবদে খাজনা	৫০০.০০	১১.	গ্রাম পুলিশের বেতন	২৯,৫২০
১১.	রিক্সা লাইসেন্স বাবদ (মালিক ও চালকদের থেকে)	১,৫০০.০০	১২.	ট্রানজিস্টার, রেডিও, টেলিভিশন লাইসেন্স বাবদ	৫০০.০০
১২.	ট্রেড লাইসেন্স	২,০০০.০০	১৩.	দরিদ্রদের সাহায্য	৫০০.০০
১৩.	গবাদি পশু বাবদে কর	৭৫০.০০	১৪.	সাফাই খরচ	১,০০০.০০
১৪.	খাস-পুকুর লীজ বাবদ	১,০০০.০০	১৫.	উন্নয়ণমূলক খাতে ব্যয়	৫,৮৫০.০০
১৫.	খাস জমি লীজ বাবদ	১,০০০.০০	১৬.	উন্নয়ন খাতে	১,০০০.০০
১৬.	মামলা-মোকদ্দমার ফি বাবদ	৫০০.০০	১৭.	শিক্ষা খাতে	২,০০০.০০
১৭.	দরিদ্রদের সাহায্য বাবদ	৫০০.০০	১৮.	গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর খাতে	১,০০০.০০
১৮.	অন্যান্য	৭,৬৬০.০০			
	মোট আয়	১,১২,২৭০.০০		মোট ব্যয়	১,১২,২৭০.০০

বরিশাল - ফরিদপুর বড় সড়কের দু-পাশেই বাটাজোর বাজার। বাটাজোর, হরহর, দেওপাড়া তিনটি গ্রাম মিলে একসঙ্গে বলা হয় বাটাজোর। বাণিজ্যিক সুবিধার পাশাপাশি প্রশাসনিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শস্থান বাটাজোর। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের অফিস আছে, রয়েছে একটি ডাকঘর-সহ টেলিগ্রাফ অফিস, ডিসপেনসারি, পশুচিকিৎসাকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, মসজিদ, মন্দির। দক্ষিণের একেবারে শেষপ্রান্তে খাল পেরিয়ে দুটো স্কুল — একটি প্রাথমিক, অন্যটি হাইস্কুল। স্কুল দুটি একই প্রাঙ্গণে। সময়ে সময়ে এই স্কুল চত্বরেই যাত্রাপালা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বাজারের কাছে আছে 'ঝংকার ক্লাব' ও 'হারুন স্মৃতি সংঘ' নামে দুটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনাদের হাতে হারুন হাওলাদার শহিদ হন, এঁরই নামে নামাঙ্কিত হারুন স্মৃতি সংঘ। সরকারি তরফে এ-দুটি ক্লাবকে টেলিভিশন

দেওয়া হয়েছে। একটি টেলিভিশন আছে ইউনিয়ন পরিষদের ঘরে; এছাড়া ব্যক্তিগত টেলিভিশন রাখেন এমন তিনজন হলেন — জনৈক মেডিকেল অফিসার, একজন পশুচিকিৎসক, আর একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী যাঁর স্বামী চাকরি করেন মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে। এই তিন মধ্যবিত্তের বাড়ি বাজার অঞ্চলের কাছেই।

বাজার-চৌহদ্দির বাইরে একটিই মাত্র জনপ্রতিষ্ঠান ওয়ার্ড নম্বর ২-এর আওতায় শৌলকার গ্রামের একটি বেসরকারি মকতব। এখানকার ও ইউনিয়ন অঞ্চলের বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি গণনা করা হয়নি।

বাটাজোর ইউনিয়ন পরিষদের ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরের বাজেট সারণি ঃ ১.৮-এ দেখানো হল। মনে রাখা প্রয়োজন, এই হিসাব-বিবরণ উপজেলা আধিকারিকের কাছে অনুসন্ধানের জন্য পেশ করা তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত, ফলে প্রকৃত বাজেটের সঙ্গে অমিল রয়েছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইউনিয়নের আর্থিক চিত্র সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি চিত্র এই বাজেট থেকে পাওয়া যায়।

১. ধার্য করের তুলনায় বকেয়া করের পরিমাণ বেশি। এর ফলে সংগৃহীত প্রকৃত কর ও ধার্য করের মধ্যে এক বড় ব্যবধান দেখা যায়। আর সেজন্য মোট আয় বেশ ভালো পরিমাণেই হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ে বাধ্য হয়েই ব্যয়সংকোচ করতে হয়।

২. ইউনিয়ন কর্মচারীদের বকেয়া বেতন থেকেই ব্যয়সংকোচ করা হয়। অবশ্যম্ভাবী-ভাবেই কর্মচারীগোষ্ঠীর নৈতিকতা, পরিচালনগোষ্ঠীর যোগ্যতা বিষয়ে সংশয় জন্ম নেয়। এই অবস্থাকে রক্ষা করতেই সভাপতির পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের দাবি ওঠে, সে ক্ষমতার চরিত্র ভালো বা মন্দ যাই হোক। গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে সভাপতি যদি অকৃতকার্য হন তাহলে অবধারিত যে তিনি মানসম্মান খ্যাতি খোয়াবেন।

৩. বাজেট বরাদ্দের ৮০ শতাংশের বেশি ব্যয়িত হয় কর্মচারীদের বেতনে। উন্নয়নের খাতে ব্যবহারের জন্য পড়ে থাকে সামান্য অবশিষ্ট।

৪. প্রকৃতপক্ষে বাজেট বরাদ্দের বাইরে ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য তহবিল রয়েছে। যতটুকু জানতে পেরেছি যে, সাধারণ বাজেটভুক্ত নয় এমন তিন রকমের তহবিল আছে ঃ

(ক) মহিলা-সহায়তা-যোজনা খাতে কাজের ব্যবস্থা (২২০ VGFC প্রকল্প)। কার্ডপিছু প্রতিমাসে ৩১.২৫ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য; ৮২,৫০০ কিলোগ্রাম বাৎসরিক পরিমাণে।

(খ) মহিলা-সহায়তা-যোজনার আর একটি প্রকল্প ১৫ জন মহিলাকে প্রতিদিন মাথাপিছু ১২ টাকা করে অনুদান (RMP প্রকল্প)। এই বিশেষ প্রকল্পের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ ৬৫,৭০০ টাকা।

(গ) কানাডা থেকে মঞ্জুরি বরাদ্দ পাওয়া যায় ৫৮,৩২০ টাকা।

৫. ইউনিয়ন অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অধিকাংশই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে অঞ্চলের জন্য কে কতটা অর্থ আদায় করতে পারবে। গ্রামবাসীরা বলেন, ক্ষমতা-সম্পন্ন এক মন্ত্রীপরিষদীয় সদস্য নিজ অঞ্চলের আগৈলঝরা উপজেলার জন্য ৬টি মঞ্জুরি প্রকল্পের বরাদ্দ পেয়েছেন, যেখানে প্রতিবেশী অঞ্চল গৌরনদীর জন্য বরাদ্দ মাত্র দুটি। এছাড়া সুযোগসন্ধানী অসৎ লোকেদের চাতুরিও আছে। উপজেলার জন্য ১৯৮৫ সালের

প্রথম তিন মাসে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পের আওতায় সিংগা থেকে জয়সিরকাঠি পর্যন্ত সাড়ে ছয় মাইল সড়ক নির্মাণ কাজের জন্য ২,৮৮৮ মণ গম বরাদ্দ করা হয়। মণ প্রতি গমের দাম ১২৪ টাকা; সম্পূর্ণ প্রকল্পটির জন্য ব্যয় ধরা হয় ৫,০২,৮১২ টাকা। প্রতি ১০০০ বর্গ ফুটের জন্য একজন শ্রমিকের প্রাপ্য গমের পরিমাণ ছিল ৫০ সের অর্থাৎ ৪৬.৭ কিলোগ্রাম। কাজের দিনগুলিতে ৭০০ থেকে ৮০০-র মতো মজুর থাকত। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকল্পটি শেষ হলে দেখা যায় এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত বিশেষ এক ব্যক্তি উপজেলা সভাপতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের খাতিরে নিজের নামে অনুমোদন করিয়ে নেন, এমনকি কোনো রকমের হিসাব দাখিল করাও নস্যাৎ করেন। ইউনিয়নের সর্বত্র কথা ছড়িয়ে যায় যে বরাদ্দ টাকা তছরূপ হয়েছে।

৪. গ্রামের নাম হরহর

উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অনেকটা আয়তাকৃতির ছোট সুন্দর গ্রাম হরহর। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁসে বরিশাল-ফরিদপুর পাকা সড়ক চলে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে। প্রায় ৩০০ মিটার বিস্তৃত পাকা সড়কের দুপাশে বাটাজোর বাজার। গ্রামের একাংশ বাজার ঘেঁষা, কিন্তু গ্রামের জীবন বাজারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাজার নিয়ে ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, আমরা যাব গ্রাম-সমীক্ষায়।

চিত্র ঃ ১.১ জনসংখ্যা বিভাজন (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬) হরহর গ্রাম
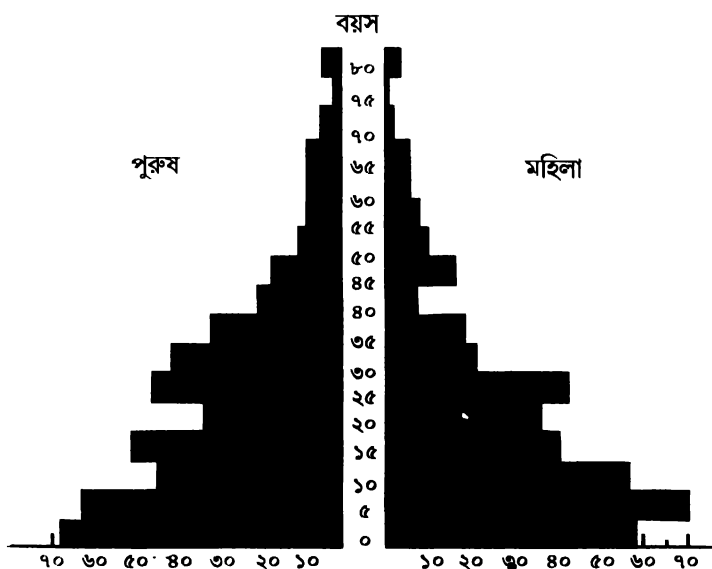
গ্রামটির সঠিক জনসংখ্যা নির্ণয় করা রীতিমতো কঠিন। বাজার ঘেঁষা বা তার চৌহদ্দির মধ্যে গ্রামের বাইরেকার মানুষ—কুড়িটি ঘরের বেশিই হবে—অস্থায়ী ঘরবাড়ি পেতেছেন বা গ্রামের মানুষের বাড়িতেই বসবাস করেন। অন্যদিকে, গ্রামস্থ পরিবারের রোজগেরে

কর্তাদের কেউ কেউ গ্রামের বাইরে থাকেন। আমাদের সমীক্ষায় অস্থায়ী বসতকারীদের বাদ দিয়ে আওতাভুক্ত করা হবে দ্বিতীয়োক্ত মানুষজন, মূলত অর্থোপার্জনের কারণে যারা গ্রামের বাইরে থাকেন। গ্রামের বাইরে বসতকারীরা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত — ডাক্তার, ব্যাঙ্ককর্মী, পোস্টঅফিসের কেরানি, একজন আছেন কলেজের অধ্যাপক, এছাড়া ছাত্র প্রমুখ।

সারণি ঃ ১.৯ প্রতি দম্পতির শিশুর গড় সংখ্যা

স্বামীর বয়স	দম্পতির সংখ্যা	শিশুর সংখ্যা	দম্পতি পিছু শিশুর গড় সংখ্যা
৬০ এবং তদূর্ধ্ব	৪৪	৩১১	৭.১
৫০ - ৫৯	২১	১৪০	৬.৭
৪০ - ৪৯	৩৮	১৭৬	৪.৬
৩০ - ৩৯	৫৮	১৬৫	২.৮
২০ - ২৯	১৭	২১	১.২
১৫ - ১৯	১	১	১.০

সারণি ঃ ১.১০ শিশুজন্মের অনুপাতে অসময়ে শিশুমৃত্যুর হার

স্বামীর বয়স	দম্পতিদের মোট সংখ্যা	নমুনা সমীক্ষায় দম্পতিদের সংখ্যা	শিশুজন্মের সংখ্যা	অল্পবয়সে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা	শিশুজন্মের গড় সংখ্যা	শিশু বয়সেই মৃত্যুর গড়	মৃত্যুর গড় (শতাংশে)
৬০ এবং তদূর্ধ্ব	৪৪	২১	১৬৬	৪৪	৭.৯	২.১	২৬.৫
৫০ -৫৯	২১	১২	৮২	২৩	৬.[illegible]	১.৯	২৮.০
৪০ -৪৯	৩৮	১৫	৯২	২৬	৬.১	১.৭	২৮.৩
৩০ -৩৯	৫৮	২০	৫২	৬	২.৬	০.৩	১১.৫
২০ -২৯	১৭	৩	৪	০	১.৩	০	০
১৫ -১৯	১	০		-	-	-	-

অস্থায়ী বহিরাগতদের বাদ দিয়ে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-র শেষপর্যন্ত গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ৮৮৭ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৬৩, মহিলা ৪২৪ জন। গ্রামের আয়তন ৩০৭.৭৭ একর অর্থাৎ ১,২৪৫ বর্গ-কিলোমিটার; প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে জনঘনত্ব ৭১২। শতকরা ৭৫.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬৭০ জন হিন্দু, ২১৭ জন অর্থাৎ ২৪.৫ শতাংশ মুসলমান।

চিত্র ১.১-এ বয়স অনুপাতে জনবিন্যাস দেখানো হয়েছে। গ্রামবাসীদের প্রকৃত বয়স নির্ধারণ করা অনেকক্ষেত্রেই বেশ কঠিন। সম্ভাব্য বিভিন্ন উপায়ে তুলনামূলক নিরীক্ষার পরেও কোথাও-কোথাও অবশ্যম্ভাবী ভুল থেকে গেছে। ৯ জন পুরুষ ও ১৭ জন মহিলার বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়ঃক্রমের নারীসংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের কম যদি পূর্বোক্ত ১৭ জন নারীদের এই বয়ঃক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলে এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পরিসংখ্যান মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে নেওয়া সম্ভব। ২০ থেকে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের নিম্নমুখি ঝোঁকের কারণস্বরূপ বলা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন দুর্বিপাক, অন্তত ২২ জনকে গুলি করে মারা হয়; অন্যথায় অপুষ্টির কারণে মৃত্যু হয়। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই বয়ঃক্রমের (সমীক্ষার সময়ে যাদের বয়স হতো) ৬ জন শিশু মুক্তিযুদ্ধের সময় হয় মারা গেছে, নয়তো হারিয়ে যায়। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ-সহ সামাজিক

অনিশ্চয়তা শিশুজন্মে বড় রকমের অভিঘাত রেখে গেছে। আলোচনার শেষাংশে দেখতে পাব প্রতিবেশী দেশ ভারতে অভিবাসনও জনসংখ্যা হ্রাসের উল্লেখযোগ্য কারণ।

উল্লেখ করা দরকার, ৪ বছর বয়স এমন শিশুর সংখ্যা ১২৫; ৫ থেকে ৯ বছর বয়ঃক্রমের শিশুসংখ্যা ১৩২ জন। এই প্রবণতা বিগত দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আছে বলে গণ্য করা যায়, কেননা ১৫-২৪ বয়ঃসীমার জনসংখ্যা তুলনামূলক কম। শিশুজন্মের নিম্নহারের অন্যান্য কারণও সম্ভব বলে মনে হয়। সারণি ঃ ১.৯ ও ১.১০ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে গেছে; বিশেষ করে সেসব বয়সি মানুষদের ক্ষেত্রে যারা এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। পঞ্চাশোর্ধ্ব গ্রামবাসীরা সন্তান সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষ গা করত না, এমনকি আকছার জন্মদানেও বিশেষ অপারগ ছিল না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল মারাত্মক রকমে কার্যকর । উল্লেখ করার মতো যে, এই পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রজন্মে কখনও কখনও কোনো অল্পবয়েসি মেয়ের নাম শোনা যায় 'ইতি'। সাত-আটটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর এই 'পিতৃকূল' সচেতন হয়ে সন্তান প্রজননে ইতি টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী হচ্ছে 'ইতি টানবার পরেও' আরো একটি কি দুটি সন্তান এদের 'সুখী গৃহকোণে' জন্ম নিয়েছে। ৪০ থেকে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমের যে প্রজন্ম, তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধের দুর্বিপাকের সময়কালেও শিশুমৃত্যুর হার যতটা অনুমান করা গিয়েছিল সে-অনুপাতে হ্রাস পায়নি। এদিকে, ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের নিচে শিশু জন্ম-মৃত্যুর হার বিপজ্জনকভাবে নিম্নগামী।৩০ থেকে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম গোষ্ঠীর মোট ৫৮ জন দম্পতির মধ্যে সাকুল্যে শুধু পাঁচজনের পাঁচের বেশি সন্তান। পরিবারে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা গ্রহণীয় বলে ধরা হয়েছিল। যেসব দম্পতির কুড়ি বছর বয়ঃক্রম, ভবিষ্যতে তাদের একাধিক সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য করার, এদের কারোই চারটির বেশি সন্তান নেই। এই বয়ঃক্রমের মোট ১৭ জন দম্পতির মধ্যে একজনেরই সন্তান সংখ্যা তিনটি।

পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ৪০-এর নিচে যাঁদের বয়স সেই গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই গ্রামেই একজন শ্রমিক মহিলা সহযোগী-সহ জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে গর্ভনিরোধক পিলের বাক্স। এখন আফসোস হচ্ছে যে নিজেরাই দ্বিধাবশত সেই সুযোগ হারিয়েছি, যে এই দুজনের উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা জেনে নিইনি। যা হোক, গ্রামের তরুণতরদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কোনো-না-কোনো পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের পরবর্তী কাজ হওয়া উচিত ছিল যে কোন ধরনের পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করছেন — সময়ানুগভাবে গর্ভ-নিরোধক পিলের উপর নির্ভর করেন, না গর্ভপাতের পদ্ধতি বেছে নেন, নাকি অন্য কোনো পদ্ধতি? অবৈধ যৌনসম্পর্কজনিত গর্ভপাতের নিদারুণ কাহিনিও নিতান্ত অশ্রুত নয়।

গ্রামীণ জনবিন্যাসে অর্থনৈতিক স্তরের বিভিন্নতার স্বরূপ সন্ধান এই সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। অর্থনৈতিক অবস্থানুযায়ী গ্রামবাসীদের মোটামুটি একটা ভাগ করতে গিয়ে আমরা চৌকিদারি করনির্ধারণ ব্যবস্থাকে নির্দেশিকা বা সূচক হিসাবে উল্লেখ করব।

বর্তমান সমীক্ষায় মোট 'খানা' / পরিবার-এর সংখ্যা ১৪৫, যার ১৩৪টি চৌকিদারি কর ব্যবস্থার অন্তর্গত। দুটি তালিকায় যে-পার্থক্য বা অসঙ্গতি দেখা যায় সে অসঙ্গতি গ্রামের ভিতর ও বাহিরের লোকসংখ্যার অভিবাসনজনিত ও খানা/পরিবার-এর পৃথগান্ন হয়ে যাওয়ার কারণে। ফলে স্বীকার করে নিতেই হবে এই পার্থক্য বা অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে অব্যাখ্যাত রয়ে যাবে।

সারণি ঃ ১.১১ চৌকিদারি খাজনার ভিত্তিতে 'খানা' / পরিবার-এর শ্রেণীকরণ

শ্রেণী	খাজনার পরিমান/ টাকায়	খানা / পরিবার সংখ্যা	শতকরা পরিমান
ক	০ - ৫	৭৮	৫৮.২
খ	৬ -১০	৩৩	২৪.৬
গ	১১-২০	১৫	১১.২
ঘ	২৫	৮	৬.০
মোট		১৩৪	১০০.০

১৩৪টি 'খানা' বা পরিবার চৌকিদারি কর ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই 'খানা' বা পরিবারগুলি মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত (সারণি ঃ ১.১১ দেখুন)— অবশ্য এই শ্রেণীকরণ খুবই সাবেকি, সাধারণ। তা সত্ত্বেও যে-সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে এই ভাগ করা হয়েছে তা সহজেই বাতিল করে দেওয়া যায় না। 'দফাদারের'-অর্থাৎ চৌকিদারপ্রধান বা গ্রামের পুলিশের সঙ্গে কর সংগ্রহের সময় বেরিয়ে গেলাম। দফাদার নিজে একজন সহৃদয় মানুষ। দেখি যে, কোনো গ্রামবাসীই কর-ভার বা কর মকুবের জন্য বিশেষ ওজর-আপত্তি করছে না। দু-একটি ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর অনুরোধে সামান্য অদলবদল করে কর নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। বলতে পারব না, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দফাদারের নিজস্ব অধিকার ঠিক কতখানি। সিদ্ধান্ত যা-হোক-না কেন এটি একটি খোলামেলা পরিবেশে করা যে অকপট চুক্তিবদ্ধ, তা যাদের কর নির্ধারিত করা হচ্ছিল তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে বলে মনে হয়। শার্ট ও লুঙ্গি পরিহিত 'দফাদার' গ্রামসমাজে সুপরিচিত — প্রতিটি গ্রামবাসীর হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। ফলে দফাদারের করা সরেজমিনে কর নির্ণয় সারবত্তাহীন ভাসাভাসা বলে খারিজ করা যায় না।

চৌকিদারি কর হিসাবে যে 'খানা' বা পরিবার ৪ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে, তারা 'ক' বর্গভুক্ত। এই বর্গভুক্ত পরিবারগোষ্ঠীর প্রায় কোনো জমি নেই । নেই কোনো কৃষিজ উৎপাদনের উপায়। ছোট দোকানদার ও ফেরিওয়ালা এই বর্গের অন্তর্গত। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই নিদারুণ সংগ্রাম চালাতে হয়। অর্ধেকের বেশি 'খানা' বা পরিবার এই বর্গভুক্ত—বাংলাদেশের অন্যত্রও চেহারাটি এক।

পরবর্তী পর্যায় 'খ' বর্গীয়, অর্থাৎ 'খানা' বা পরিবার পিছু ৬ থেকে ১০ টাকা চৌকিদারি কর দিয়ে থাকে। এই বর্গভুক্ত 'খানা' বা পরিবারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির কোনো একটি বিচার করা হয়ে থাকে ঃ

(১) কম জমির মালিক ও বাজারে কেনাবেচা বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে ;

(২) কম জমির মালিক যাদের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, পোস্টঅফিসের পিয়ন প্রমুখ ;

(৩) অল্প জমির মালিক উপরন্তু পানের বরজ আছে, যার ১০০ থেকে ২০০-র মতো পানের খান (সারি) ;

(৪) বড় জোত মালিক, ভরণপোষণযোগ্য সংখ্যায় অনেক পারিবারিক সদস্য ;

(৫) বেশ বড় সংখ্যক উপার্জনকারী ;

(৬) খেতমজুর উপরন্তু পান চাষে নিযুক্ত।

অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গেছে, এই 'খানা' বা পরিবারগোষ্ঠীর উপার্জনের আরও বিভিন্ন সূত্র আছে, যেমন নিজস্ব পুকুরে মাছচাষ, গো-পালন, বলদ খাটানো। যারা মূলত পানচাষ ও তাঁতশিল্প-নির্ভর তাদের খুব কষ্টে দিন কাটে, কারণ পানের দামের আকস্মিক অধোগতি ও হাতে বোনা তাঁতের নিম্নমুখী চাহিদা। সাধারণভাবে বলা যায়, এই বর্গভুক্ত 'খানা' বা পরিবারগোষ্ঠী বিচিত্র অর্থনৈতিক উপার্জনের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক স্বত্ব বজায় রাখে। অনেক 'খানা'র অর্থনৈতিক অবস্থান বেশ নড়বড়ে।

১৫টি 'খানা' বা পরিবার অর্থাৎ ১১.২ শতাংশ 'গ' বর্গীয়। এরা ১১ থেকে ২০ টাকা চৌকিদারি কর দিয়ে থাকে। ৮টি 'খানা' বারুই জাতের। এরা প্রায় ৩ একর জমির মালিক, তাছাড়া ৩০০-র বেশি পানের 'খান' বা সারি আছে। এদেরই একাংশ কেরানি, দোকানদারি, তেজারতি ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত। বাকি ৭টি 'খানা' বারুইদের সমগোত্রীয়-পর্যাপ্ত জোতজমি আছে, তাছাড়া পানের চাষ। নমশূদ্র একটি পরিবার এত ধনী যে 'ঘ' বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক; আবার এও ঠিক যে এমন নমশূদ্র 'খানা' বা পরিবার আছে যা-কিনা 'খ' পর্যায়ভুক্ত হওয়াই যথাযথ। ধনী নমশূদ্র 'খানা'র ২.৯৯ একর উচ্চ ফলনশীল শস্যের কৃষিজমি, এছাড়াও ২.৮৫ একর 'নল' জমি আছে যেখানে উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ হয় না। ৬৭৩টি সারি বা 'খান'-এ পান চাষ হয়। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই পরিবারের প্রবীণ গৃহকর্তা ৩৫,০০০ টাকা ব্যয়ে নিজের বাগানের একধারে ইটের তৈরি 'হরি মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহা ধুমধাম হয়, প্রায় দু-তিন হাজার লোক এই উপলক্ষে 'হরিসভা'য় রাতভোর নামসংকীর্তন করে। অন্যান্য 'খানা' বা পরিবারের সদস্যরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত।

চৌকিদারি কর হিসাবে ২৫ টাকা করে দেয় 'ঘ' বর্গভুক্ত এমন 'খানা' বা পরিবারের সংখ্যা ৮টি। সাধারণত, এদের ৩ একরের বেশি জমি ও শতাধিক পানের সারি আছে। খুব উল্লেখযোগ্য জোতদার হলেন জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান, যিনি অনেকগুলি বসতবাড়ি অধিকার করে আছেন যেগুলি কোনো এক সময়ে দত্ত পরিবারভুক্ত কারো-না-কারো সম্পত্তি ছিল। এই জোতদার বৃদ্ধ মুসলমানের ২৫ একর জমি, ৩টি দোকান এবং বাজারে একটি ধানকল আছে। পাঁচ একর জমির মালিক আর এক মুসলমান চাষি সত্তর দশকের শেষার্ধে বাহারিনে দু'বছর কাজ করে অর্থোপার্জন করে ভাগ্যবান হয়ে ওঠেন। এখন তাঁর পড়তি অবস্থা; যদিও তিনি আবার বাহারিনে যেতে চান, কিন্তু মনে হয় না আগেকার মতো তেমন সহজ ব্যাপার আর আছে। জনৈক ধোপার ১৯ একর জমি আছে, আর ৭০০ সারি পানের চাষ। তিনটি বারুই পরিবার বা 'খানা' এই পর্যায়ভুক্ত — তাদের যথাক্রমে ৩৫০, ৪৬৭ ও ৫২৫টি পানের 'খাঁন' বা সারি আছে। এক কায়স্থ পরিবার ৩.৪০ একর জমির মালিক যা মূলত গ্রামের বাইরে, এছাড়াও ৩৭০টি পানের 'খান'

আছে। বাকি একটি 'খানা' বা পরিবার বণিক জাতিভূক্ত এক ব্যবসায়ীর যিনি গৌরনদী অঞ্চলের অন্যতম ধনাঢ্য। এই ব্যবসায়ীর তরকি বাজারে দোতলা দোকান যেখানে রোজকার লেনদেন প্রায় ৩০,০০০ টাকা কি তারও বেশি। তার মতো একজন পাইকারি ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের হার দুই শতাংশের মতো।

অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী তাঁর *এগ্রেরিয়ান সোস্যাল রিলেশসন্স অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ* (১৯৮২) গ্রন্থে সমাজ কী তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেছেন ঃ

> " সমাজ বলতে এমন এক মানবগোষ্ঠী বোঝায় যারা জ্ঞাতিসূত্রে পরস্পরে বাস করে, এই সমাজের স্থানগত এক নির্দিষ্ট সীমানা যেমন আছে সে রকমই একই সামাজিক-রাজনৈতিক স্বারূপ্য আছে।"

হরহর গ্রামের মানুষজন পরস্পর সামাজিক সম্পর্ক শিথিলভাবে বজায় রেখে চলে। যদিও এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে, তৎসত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে কোনো সার্বজনীন সমাজ গড়ে ওঠেনি। ফলে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে গ্রামসমাজ বিভক্ত। আবার এও লক্ষ্য করার যে, বিশিষ্টভাবে কোনো 'মুসলমান' সমাজও নেই। হরহর ছিল মূলত কায়স্থপ্রধান হিন্দু গ্রাম। বিশ শতকের শুরুতে এই গ্রামে নিজের কর্ষিত জমিতে কোনো মুসলমান বসবাস করেনি। এখনকার মুসলমান বাসিন্দাদের অধিকাংশই ১৯৪৭-এর পরের আগন্তুক। পূর্বেকার গ্রামের নিজ সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা এখনও পর্যন্ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। ইউনিয়ন পরিষদের নথি অনুযায়ী গ্রামের মোট ১৩৪টি 'খানা' বা পরিবারের মধ্যে ৩৫টি মুসলমান খানা। সারণি ঃ ১.৭-এ মুসলমান গ্রামবাসী কোন সমাজভুক্ত তা দেখানো আছে। হিন্দু গ্রামে তারা ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, এমনকি নিজ সমাজ পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারেনি। এ কারণেই এখনও পর্যন্ত কেউ 'মাতব্বর' সম্বোধনযোগ্য নয়। আমরা আগেই জেনেছি, এ গ্রামে প্রভূত বিত্তশালী ধনাঢ্য এক জোতদারের বাস। কিন্তু ধনসম্পত্তিতেই 'মাতব্বর' হয়ে ওঠা একমাত্র চিহ্ন নয়, যদি না তার বংশ-কুলগত পারিবারিক ঐতিহ্য, নৈতিক উৎকর্ষতা থাকে। এই বিত্তশালী জোতদারের সে-অর্থে নিজস্ব কোনো 'সমাজ'ও নেই।

হিন্দু সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোনো বর্ণ বা উপ-বর্ণগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, এই অঞ্চল-সমাজের নেতৃত্বে থাকেন একজন 'সমাজপতি'। দীর্ঘদিন যাবৎ হরহর গ্রামের হিন্দু সমাজে সমাজপতির প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন তরুণ বয়সি নেতাদের ঠাট্টার ছলে 'সমাজপতিবাবু' বলে মাঝে মাঝে সম্বোধন করা হয়। বর্তমান সময়ের হরহর গ্রামে তিন ধরনের সমাজ শনাক্ত করা যায় ঃ

(১) গ্রামের উত্তর দিকের নমশূদ্র সমাজ;

(২) মধ্যভাগের বারুই সমাজ;

(৩) দক্ষিণ প্রান্তের বিভিন্ন বর্ণ সমন্বয়ে এক মিশ্র সমাজ। (চিত্র ঃ ১.২ দেখুন)।

গ্রামবাসী সকলে প্রথমোক্ত দুই সমাজকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। তৃতীয় সমাজ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। এই 'মিশ্র সমাজ'-কে সবাই 'সমাজ' রূপে স্বীকৃতি দেয় না। এই সমাজ তার অঞ্চল পরিচয়ে চিহ্নিত। বিরুদ্ধবাদীদের জিজ্ঞাস্য, বর্ণগোত্রহীন

একটি দল কীভাবে 'সমাজ' রূপে অভিহিত হয়। 'মিশ্র সমাজ' নবোদ্ভূত এমন এক জনগোষ্ঠী যা ১৯৪৭-উত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ফল। স্বাভাবিকই যে, প্রথম দুই গোষ্ঠীর মতো এই তৃতীয় গোষ্ঠীর সংহত পারস্পরিকতার অভাব দেখা যায়। বাজারে রমরমা

চিত্র ঃ ১.২ হরহর-এর তিন সমাজ
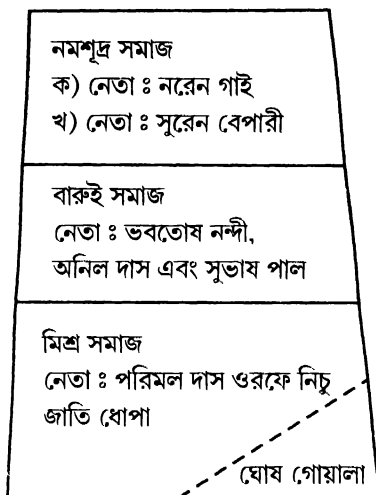
ব্যবসা ও কৃষিকর্মের সঙ্গে লিপ্ত একজন ধোপাজাতের মানুষ তার বর্ণের লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে এই মিশ্র সমাজের নেতা হয়ে বসেছেন। ঘোষ পদবিধারী গোপজাতের মানুষ ধোপা নেতৃত্বের সমাজ থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখে — তাদের নেতা জনৈক দোকানদার। আওয়ামি লীগের একান্ত সমর্থক গোপ দলের নেতা একসময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নমশূদ্র সমাজ ১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত এক প্রাথমিক ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের নেতৃত্বাধীন ছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে পূর্বোক্ত বিত্তবান, যিনি ১৯৮৬ সালে পাকা গাঁথুনির হরিমন্দির বানিয়েছেন, এই শিক্ষক মহাশয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। নমশূদ্র সমাজ 'হরেকৃষ্ণ' নামগানে অভ্যস্ত পরম্পরাবাহিত বৈষ্ণব, অন্যদিকে পূর্বোক্ত বিত্তবান ছিলেন অন্য এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসক, যে গোষ্ঠীর নামগান 'হরিবোল'। এই ধনীব্যক্তি 'হরিবোল' উপাসকদের অনুসরণে কীর্তনের আসর শুরু করেন 'হরেকৃষ্ণ'-পন্থী নমশূদ্রগোষ্ঠীর কোনো রকমের সহায়তা ছাড়া। ফলত, সমাজ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন এবং প্রায় চার বছরের মতো একঘরে করে রাখা হয়। ১৯৮৩ সালে কালীপূজার চাঁদা নিয়ে নমশূদ্রগোষ্ঠীর দুজনের মধ্যে হাতাহাতি হয়; পরে এদেরই একজন তার জ্ঞাতিগুষ্টি নিয়ে সেই একঘরে করে দেওয়া লোকটির কাছে যায়, এবং তাঁকে নেতা মেনে নিয়ে এক নতুন সমাজের জন্ম দেয়। যে কোনো বিষয়েই দুই সমাজের শত্রুতা ও রেষারেষি একেবারে প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। এর অর্থ অবশ্য এমন নয় যে কোনো উপলক্ষ্যে এই দুই সমাজের লোকজন একত্র হয় না। বর্তমানে সমাজ এমন কোনো একমাত্র সংগঠন নয় যার সঙ্গে

চিত্র ঃ ১.৩ একটি গ্রামের বসতবাড়ি ও আবাসিক এলাকা
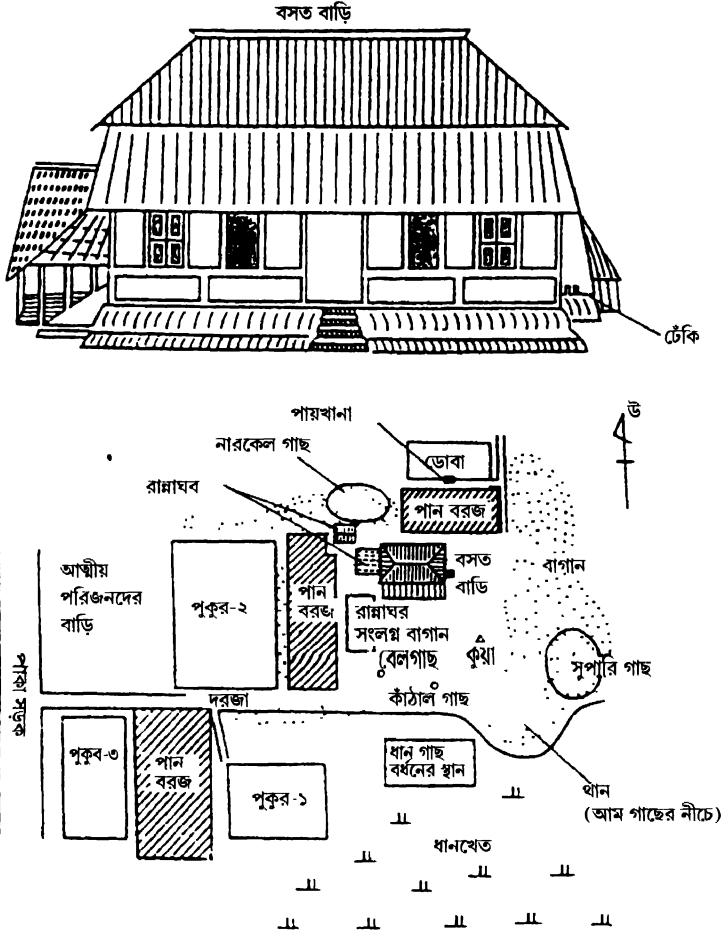
চিত্র ঃ ১.৪ ঢেঁকি এবং তার উপর ধর্মীয় নক্সা
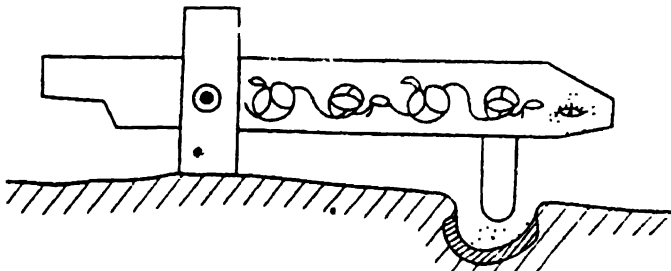
গ্রামবাসীরা নিজেদের শনাক্ত করতে পারে। গ্রামজীবনের সম্পর্কের বুনট জটিল হয়ে উঠেছে। কোনো সিদ্ধান্তে ঐক্যমত হওয়ার লক্ষ্যে পরস্পরের কাছাকাছি যেমন আসে, সেভাবে মতের অনেক দূরেও সরে যায়। খুবই সাধারণ কারণে পারস্পরিক বন্ধনে হামেশাই চিড় ধরে।

বারুই সমাজে দু-তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছেন। এদের মধ্যে একজন ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঃ দীর্ঘকায়, সপ্রতিভ ও কর্মঠ এই ব্যক্তি গ্রামবাসীদের প্রতিদিনের ব্যাপারে ও সামাজিক কাজকর্মে উদাসীন বলে মনে হয়। অনুরোধ করলে বড়জোর মধ্যস্থতার কষ্টটুকু স্বীকার করেন, এমনকি তা গোষ্ঠী বা সমাজের বাইরের কোনো কিছু হলেও। মেয়ের বিবাহের সময় নিজ গোষ্ঠীর কোনো রকম স্বীকৃতি চাননি এমন একজন আছেন যিনি বারুই সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

৫. গ্রামজীবন সম্পর্কে দু-একটি কথা

গ্রামবাসীদের মতে ঘরগৃহস্থালিতে দুটি জিনিসের অত্যন্ত প্রয়োজন ঃ পুকুর আর পায়খানা। গ্রামে বসতি এলাকা ছোট বড় পুকুরে ঘেরা। জলাশয় অঞ্চলের তিনটি ভাগ ঃ দিঘি বা বড় পুকুর, সাধারণ পুকুর বা পুষ্করিণী, আর মাপে সবচেয়ে ছোট কচুরিপানায় ভর্তি ডোবা।

গ্রামজীবনে নানা দিক থেকেই পুকুর খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের স্নানে ব্যবহার করা হয়। গ্রামবাসীর একাংশ — যারা মূলত বাজারে কাজকর্ম করেন — পুকুরের তুলনায় খালের উষ্ণ জলে স্নান করতে পছন্দ করেন। মাছচাষের কাজে লাগে। মাছের আঁশটে গন্ধ সত্ত্বেও উষ্ণ দুপুরে পুকুরের শীতল জলে স্নান বড় আরামের। বাসনকোসন ধোয়া, কাপড় কাচার কাজে পুকুর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্রামবাসীর মতে, কুয়োর জল থেকে পুকুরের জলে রান্না ভালো হয়, এ জলে সিদ্ধ ভাত খেতে সুস্বাদু।

বাসগৃহ অঞ্চলের একেবারে শেষপ্রান্তে ডোবা; ডোবা পায়খানা সংলগ্ন। সুবিধার জন্য ডোবার একধারে খুবই সাদামাটা কুঁড়েঘর। কখনও কখনও কোনো গাছের অংশ ডোবার দিকে আড়াআড়িভাবে বাড়িয়ে রাখা, পাতাঘেরা এই জায়গাটি লোকচক্ষুর বাইরে। গ্রামীণ ধারণায় সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত হল পেটভরা আহার আর সহজ প্রাতঃকৃত্য। এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা খুবই খোলামেলা যে গাছের ডালের প্রান্তভাগে বসে প্রাতঃকৃত্যে তারা বেশ মজা উপভোগ করে। কিন্তু বর্ষার দিনে এই স্বর্গসুখই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। আর তাই রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন পাকাপোক্ত স্থায়ী পায়খানা প্রত্যেকেরই কাম্য। কোনো গৃহস্থের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম পরিমাপক সে কোন ধরনের পায়-খানা ব্যবহার করে।

চিত্র ঃ ১.৩ এক নমশূদ্র গ্রামবাসীর আবাসিক এলাকা ও বসতবাড়ির নকশা। তার বাড়ি হরহর গ্রামে নয়, লাগোয়া গ্রামে। ভদ্রলোকের অর্থনৈতিক অবস্থান 'খ' ও 'গ' বর্গের অন্তর্বর্তী। বাড়িটি ঘিরে তিনটি পুকুর, একটি ডোবা। প্রথম পুকুরটি পুরোপুরি পারিবারিকভাবে ব্যবহার করা হয়। পুকুরটি ভূমিতল থেকে দুই মিটারের মতো উঁচু চারটি পার দিয়ে ঘেরা বাইরের মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। পরিবারের লোকজন বিশেষত

মেয়েরা, স্নানসহ ঘাটে অন্যান্য কাজ করে থাকে। দ্বিতীয় পুকুরটি সবচেয়ে বড় — শীতকালে ধানখেতে বদলে নিয়ে উচ্চফলনশীল ধানচাষ হয়। তৃতীয়টি বড় পাকা সড়কের ধারে। মাছচাষ হয় এখানে। ডোবার একধারে পায়খানা।

বাড়িটির খুব সুবিধাজনক অবস্থান। দক্ষিণদিকের খোলা ধানখেত, বাসিন্দারা দক্ষিণের বাতাস উপভোগ করে। দক্ষিণ-বাতাসে ঘরবাড়ি পোকামাকড় মুক্ত থাকে, কেননা বসন্তে পোকামাকড়ের উপদ্রব দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়। বাড়ির উত্তর দিকে ঘন জঙ্গলের কারণে শীতের উত্তরা বাতাস জঙ্গলে প্রত্যাহত হয়।

বাড়ির উঠান গাছগাছালিতে ঘেরা। নানা ফলের গাছ — নারকেল, সুপারি, আম,কাঁঠাল, লিচু,বেল ইত্যাদি। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর হোগলার চাটাই বিছিয়ে গাছের তলায় গাছেরই ছায়ায় শ্রান্তিহরা ঘুম; সংসারের জমা-খরচের নিছক বস্তুতান্ত্রিক নৈমিত্তিকতার পরে রোমন্থনে ফিরে আসে দুইপুরুষ আগের সহজ সরল চাষি জীবনের ছবি।

উঠানে একটা শ্যালো টিউবওয়েল। টিউবওয়েলটি বসানোর সময় পরিষদের প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে বর্তমান গৃহকর্তার বচসা হয়, ঝগড়াঝাটি এতদূর গড়ায় যে সভাপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। গৃহকর্তা ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ভারতীয় সেনা ক্যাম্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই গৃহকর্তা বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে 'মুক্তি বাহিনীর' সেনা হিসাবে যোগ দেন।

বাড়ির বাগানের এককোণে আমগাছের নীচে মনসার 'থান' : বছর কয়েক আগেও পূজা হতো। ক্রমবিলুপ্তির পথে হলেও গ্রামের অনেক পরিবারে এখনও পালাপার্বণ, নানা অনুষ্ঠান হয়। পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে গোঁড়া ধর্মাচরণের জাঁক; জমে উঠেছে পারিবারিক গুরুদেব উৎসব। যখন-তখন কীর্তনসভা। উৎসবের সময় হচ্ছে শীতকাল। উচ্চফলনশীল ধানচাষ চালু হওয়ায় শীতকাল এখন খুব ব্যস্ত সময়। তবুও, শীতের সন্ধ্যায় হিন্দুঘরের রমণীদের উলুধ্বনি আকাশ-বাতাশ রণিত করে ফেরে, কাছে-দূরের কোথাও সংগীতের সুর ভেসে আসে ঘন রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে — গ্রামবাসীরা কিন্তু অনায়াসে অনুমান করে নেয় কোথায় কীর্তন হচ্ছে, কোথায় উরস। ছোটমেয়েরা ব্রত পালন করে, ব্রতের আলপনা দেয়। প্রভাতি কীর্তনের মিছিল প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে কাছে এসে আবার মিলিয়ে যায়; গ্রামের পথ ধরে সেই সুর স্বপ্নের আবেশ সৃষ্টি করে যায়। বাজার সমিতি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে পাঁচ-ছয় দল কীর্তনীয়া নামগান করে। আপাত সংযত, স্থিত, স্বচ্ছ জীবনযাপনকারী গ্রামবাসী নাম-সংকীর্তনে উদ্বাহু নৃত্যে মাতোয়ারা হয়ে আনন্দে পুলকিত অশ্রুতে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। আসরে উপবিষ্ট গ্রামের রমণীরা মুহুর্মুহু উলুধ্বনিতে সচকিত করে তোলে চারপাশ। হিন্দু বাসিন্দারা এভাবেই রক্ষা করেন তাঁদের ধর্মচিহ্নিত সামাজিক আত্মপরিচয়। যা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য তা হল — এই উৎসবের জন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীরও একাংশ চাঁদা দিয়ে থাকেন।

বসতবাড়ি মাটির তৈরি। সিঁদ কেটে কোনো চোর ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর' গল্পে যেমন আছে। যে-পরিবার নিয়ে অলোচনা করছি তাঁদের এই অভিজ্ঞতা আছে। বসতবাড়ির ছাদ টিনের ছাউনি দেওয়া। টিনের ছাদ

অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। গরিব মানুষের মাথার ওপরে ছাদ বলতে সুন্দরবন থেকে আমদানি করা গোলপাতার ছাউনি। তুলনায় বেশি গরিব মানুষেরা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য ছন বা শনের ছাউনি দেয়। দুর্দশাপীড়িত হতশ্রী মানুষ বৃষ্টির জলরোধক প্লাস্টিকের আচ্ছাদন শনের ছাউনির উপর বিছিয়ে দেয়। অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের বাড়ির দুয়ার কারুকার্যখচিত নকশা-কাটা। আমাদের আলোচ্য বাড়িটিও তাই।

অনেক বসতবাড়ির পিছন দিকে বা একপাশে থাকে ধানভানার ঢেঁকি। বিশ্বকর্মা পূজার দিন বাড়ির মেয়েরা পুরনো ঢেঁকির গায়ে পিটুলিগোলা দিয়ে চোখ এঁকে দেয়। এই বাড়িতেও একটি ঢেঁকি আছে, কিন্তু স্ত্রী-আচার আদৌ অনুসরণ করা হয় না। বসতঘরের গা ঘেঁষে রান্নাঘর, কোথাও কোথাও সামান্য দূরে কুঁড়ে মতো তৈরি করা হয়। রান্নাঘরের মেঝেয় দু-তিনটি পাতা উনান। হিম শীতের রাতে উনানের চারপাশে ঘিরে বসে আঁচ পোহাতে-পোহাতে খেজুর রসে গরম পিঠা খাওয়া এক মনোরম অভিজ্ঞতা।

শিশুদের হল্লায় বাড়ির উঠান মুখরিত; এই উঠানেই মেয়েরা শস্য ঝাড়াইবাছাই-এর কাজ করেন।

সত্য যে, গ্রামজীবনে দারিদ্র্য আছে, অভাব আছে। এসব সত্ত্বেও জীবন শুধুমাত্র দুঃখের বারমাস্যা নয় — উৎসবে, পালপার্বণে, সুখের দিনেও তাঁরা একে অপরের নিমন্ত্রিত। যদিও বিবাহে, আনন্দানুষ্ঠানে, শ্রাদ্ধে আত্মীয়পরিজনদের নিমন্ত্রণ খাওয়ানো বাস্তবিকই বেশ খরচসাপেক্ষ, আর্থিক বোঝাস্বরূপ। এবিষয়ে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ করলে গ্রামবাসীর উত্তর হল, জীবনে নতুন করে বেঁচে থাকার এ-এক প্রাণশক্তি।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ গ্রামের ইতিহাস

১. পূর্বকথা

প্রবাদে বলে,

দানে বাটা ক্রিয়ায় জোর
তার নাম বাটাজোর

অর্থাৎ দালানকোঠা আর সুকীর্তি মিলে বাটাজোর।

কথিত আছে নৃপতি আদিশূর বাটাজোর গ্রাম দত্তদের দান করেন। অসমর্থিত প্রচলিত সূত্রে আছে যে, দত্তবংশীয় দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণ দত্ত লক্ষণ সেনের রাজসভায় 'মহাসন্ধি বিগ্রহিক' অর্থাৎ পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে দত্তবংশের চতুর্দশ পুরুষ সদানন্দ ও তাঁর ভাই সনাতন (বিদ্যানন্দ খান) বাটাজোরে এসে বসতি পত্তন করেন। এঁরা অশ্বিনীকুমার দত্তের সাত পুরুষ পূর্বে। প্রতি পচিঁশ বছর অন্তর বংশধারার রদবদল বিচারে বলা যেতে পারে সদানন্দের জন্ম ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। আর তাই মনে হয় এমন অনুমান যুক্তিসংগত যে দত্ত পরিবার সতের শতকের কোনো একসময়ে বাটাজোরে আসেন । কেননা সাল-তারিখের নিরিখে অঞ্চল হাসিল করে বসতযোগ্য করে তোলার ইতিহাসের সঙ্গে দত্তদের বসতি পত্তনের তারিখ মিলে যায়। গ্রামের ৭৭৪ নম্বর প্লটটি বহুকালের এক পুরানো দিঘি; লোকমুখে মগের দিঘি, মগের আস্‌কি বা মগের আঁধি হিসাবে পরিচিত।[১৬] জনশ্রুতি যে, ১৬৫৭ সালে মগেরা এই দিঘি খনন করায়। ১৯৮০-র গোড়ার দিকে এই দিঘি থেকে কষ্টিপাথরের এক দেবীমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রামের 'মিশ্র সমাজ'-এর নেতৃস্থানীয় জনৈক ধোপার বাড়ির উঠানে ছোট এক কুঁড়েঘর তৈরি করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে — 'মহামায়া মহাশক্তি'-ভূষিতা এই দেবীমূর্তি নিত্য পূজার্চনায় রত। প্রতিমা-লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, মূর্তিটি যে মূর্তির সমকালীন, সেই আর একটি মূর্তি উনিশ শতকে উদ্ধার করা হয়েছিল, কেননা এই উভয় দেবীমূর্তির মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। উনিশ শতকে আবিষ্কৃত মাতৃমূর্তিটি লক্ষণকাঠির গ্রামের এক পরিবারে সংরক্ষিত। এসব ব্যতিরেকে সতের শতকের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ গৌরনদী অঞ্চলের পুরানো পথঘাট। জনৈক সাবিখান এই রাস্তাঘাট বানিয়েছিলেন, লোকমুখে 'জঙ্গল' নামে পরিচিত।[১৭]

মোঘল আমলে বাটাজোর দত্তবংশের খুব স্বল্প ছড়ানো-ছিটানো তথ্য পাওয়া যায়। পরগনা বানগ্রোরার তিনটি মূল তালুকের অন্যতম তালুকদার ছিল দত্তপরিবার। এই পরিবারের অনেকেই মুর্শিদাবাদ নবাবের দরবারে রাজকীয়কর্মে নিযুক্ত হন। দেশপাড়া ছিল দত্তদের আদি ভিটা — ঘনগাছে ঢাকা এই বংশের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। মোঘল শাসনে বাঁটাজোর দত্তরা 'মজুমদার' উপাধিতে ভূষিত হন। এই পরিবারে সংস্কৃত ও ফার্সিভাষা-সাহিত্যে বহু সুপণ্ডিত বিদ্বানের জন্ম।

ইংরাজ শাসনের একেবারে গোড়ার দিকে কলকাতা শহর তথা আশেপাশের অঞ্চলে সতীপ্রথা বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল, দেখা গেল যে মফস্বলের সদর অঞ্চলগুলিতেও

ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। দত্তপরিবারের একজন সতী হন — অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রপিতামহের বাবা রমাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র গতিনারায়ণের দেহান্ত হলে তাঁর স্ত্রী সহমৃতা হন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, যে দত্তপরিবার সমকালীন রীতিনীতির অনুসারী ছিলেন।[১৮]

১৭৯২ সালে কানুনগো প্রথা বাতিল হয়ে যাওয়ার দরুন পুরানো সময়ের কানুনগো দলিল-দস্তাবেজ নষ্ট করে দেয়া হয়; ফলে বাংলাদেশের এই অঞ্চলের গ্রাম-ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা উচিত ১৭৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ১১৯৭ বঙ্গাব্দের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময় থেকে পাঁচশালা নথিপত্রের ভিত্তিতে।[১৯] অত্যন্ত দুঃখের যে সময়াভাবে এই মহার্ঘ দলিলগুলির যথাযথ উল্লেখ করা যায়নি; তাছাড়া এগুলি দেখতেও প্রশাসনিক নানা বাধা রয়েগেছে, বলতে গেলে তাদের সান্নিধ্য পাওয়া দুষ্কর।

কানুনগো কাগজপত্র বাখরগঞ্জ মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। গ্রামজীবন ও জমিজমা-ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত এই সমস্ত নথিপত্র। খেরো কাপড়ে মোড়া কানুনগো নথিপত্র পরগনা অনুযায়ী বিভক্ত। অর্ধেকের বেশি নথিপত্রের ভাষা ফার্সি, বাকি অর্ধেক বাংলায় লেখা। দলিলপত্রের একটা অংশ বানগ্রোরা পরগনা সংক্রান্ত। এইসব কাগজপত্রের মধ্যেই এক অছিলায় ১২৩০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের 'বান্‌গ্রোরা পরগনাঁর তালুকওয়ারি বিবরণ' দেখার সুযোগ করে নিই। ধারণায় ছিল পনের ধরনের তথ্য এই নথি থেকে পাওয়া যাবে, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে তিনটি মাত্র তথ্য হরহর প্রসঙ্গে এখানে রয়েছে; সে-তিনটি মৌজা বা গ্রামের ক্রমিক সংখ্যা, গ্রামনাম ও 'খেরাজি মহাল' বা রাজস্ব-তালুক। ১৮২৩-এ হরহর-এর মৌজা নম্বর ১১৭; সাকুল্যে ৩০টি ছিল 'খেরাজি মহাল' — এগুলির (তৌজি অর্থাৎ জমিস্বত্ব ও খাজনার পরিমাণ) নম্বর যথাক্রমে ৪৯৬, ৫১০, ৫১৭, ৫৬১, ৫৭৩, ৬০১, ৬০২, ৬২৫, ৬২৭, ৬৪৯, ৭২৮, ৭৩৪, ৭৩৭, ৮৬০, ৮৭৭, ৮৮১, ৮৮৪, ৯০০, ৯২৩, ৯৪৩, ৯৯৫, ১১২৩, ১১৩১, ১১৯৩, ১২১১, ১২১৬, ১২২৮, ১৩৭৬।

'থাকবস্ত' মানচিত্রে (মানচিত্র ঃ ২.১) যে সমস্ত পত্তনির উল্লেখ আছে এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে তার সামান্য তফাত আছে। ১৮৫৯-এ তৈরি 'থাকবস্ত' জরিপ মানচিত্রে অজস্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সমৃদ্ধ; মানচিত্রের পিছনের সাদা জায়গায় বা সামনের দিকের মার্জিনে উল্লেখ করা আছে। উপরোক্ত তৌজি নম্বরগুলি থেকে ৬২৫, ৬২৭, ৭২৮, ৭৩৪, ৯০০, ৯৪৩, ৯৯৫, ১১৩১, ১২১১, ১২১৬ পত্তনি বাদ দিয়ে সংযোজিত হয়েছে ৫২৭, ৫৮৮, ৬৮৪, ৬৮৯, ৭০৮, ৭২৭, ৭৯১, ১০১৬, ১১৩৯, ১১৯৮ ও ১৩২৪ সংখ্যক পত্তনিস্বত্ব। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের আলোচনার প্রসঙ্গে এই পরিবর্তনের কারণ কী উল্লেখ করা যাবে?

'থাকবস্ত' মানচিত্রেই যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেসবের ভিত্তিতেই গ্রামবিবরণের খানিকটা শুরু করা যায়। সম্পূর্ণ গ্রাম ছিল ১৫০টি চকবন্দে বন্দি বা বিভক্ত। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময় চকবন্দি অংশগুলি ৫০০টিরও বেশি 'দাগ' বা জমিখণ্ডে পুনর্বিন্যস্ত হয়; পুনর্মার্জিত বসতি জরিপের (রিভিশনাল সেটেল্‌মেন্ট সার্ভে) সময়ে এই 'দাগ' খণ্ডগুলি ৯০০-র বেশি 'দাগে' পুনর্বিভক্ত হয়। হাতে-আঁকা কাঁচা মানচিত্রে দেখা যায় (মানচিত্র ঃ ২.১) তিনটি পাকাবাড়ির উল্লেখ আছে। বাড়ি তিনটি যথাক্রমে 'হরমোহন দত্তের পাকাবাটি', 'শ্রীনাথ দত্তের পাকা চণ্ডীমণ্ডপ' ও 'শ্রীনারায়ণ ঘোষের পাকা চণ্ডীমণ্ডপ'। প্রথম দুই

ব্যক্তি দত্ত পরিবারের 'পশ্চিম ও নূতন বাড়ি'র গৃহকর্তা, শেষের জন গ্রামের প্রভাবশালী আর এক 'তালুকদার' পরিবারের মালিক। এঁরা সবাই কায়স্থ।

বাড়িগুলি এখন যেভাবে যে-জায়গায় আছে থাকবস্ত মানচিত্রে ঠিক সে-ভাবেই দেখানো আছে, যদিও তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। প্রভাবশালী তালুকদারদের তিনটি পাকাবাড়ি কেন্দ্র করে অন্যান্য বাড়িগুলি মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম সারির বাড়িগুলি, সংখ্যায় ৯টি, পূর্ব থেকে পশ্চিম ঘিরে গ্রামের উত্তরমুখি বিস্তৃত। ঘোষবাড়ি বাদে এই প্রথম সারির মধ্যেই দুটি ছোট সারির প্রত্যেকটির চারটি করে বাড়ি স্পষ্টত বোঝা যায়। দ্বিতীয় সারি, আমরা 'পশ্চিমের বাড়ি' বলতে পারি, সংখ্যায় সর্বাধিক বাড়ি ২৫টি। পশ্চিমের বাড়ির অবস্থান গ্রামের মাঝে ঃ পূর্ব- পশ্চিমে বিস্তৃত বাড়িগুলি যেন বলয়ের মতো ঘিরে রেখেছে। গ্রামের দক্ষিণাংশে উত্তর-দক্ষিণে উলম্ব ভাবে বিন্যস্ত ১৯টি বাড়ি নিয়ে তৃতীয় সারির 'নূতন বাড়ি'। প্রতি সারিতে তিন থেকে পাঁচটি বাড়ি আছে। স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় আবাসিক অঞ্চল জাতপাতের নিরিখে আলাদা-আলাদা।

প্রতি পরিবারে পাঁচজন বাস করতে পারে, থাকবস্ত জরিপের সময়ের এই হিসাব অনুযায়ী গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ছিল ২৬৫ জন। ৫৩টি পরিবারের মধ্যে ৪৬টি কৃষিকরক ও বাকি ৭টি পরিবার অ-কৃষকগোষ্ঠীতে শ্রেণীভুক্ত। মূলত হিন্দুপ্রধান গ্রাম ঃ ৫১টি পরিবার হিন্দু ও ২টি মুসলমান পরিবার। গ্রামে না-ছিল সপ্তাহান্তের হাট, না-কোনো স্কুল। কোনো ধরনেরই কারখানা বা কুঠিও ছিল না। কৃষি সংক্রান্ত তথ্য থাকবস্ত জরিপে খুবই সামান্য। মূল শস্য ধান, কর্ষিত জমির গড় ৬৩১/১৬ একর। উল্লেখ করার যে, ১৮৫৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকবস্ত জরিপ চলাকালীন জমির মালিকদের প্রতিভূ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশচন্দ্র দত্ত, প্রতিবেশী গ্রামগুলির রায়তদের প্রতিনিধি ছিলেন কানাই সিংহ।

যদি আমাদের - গ্রামের সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান দেওয়া থাকত, তা হলে এই ১৮৫৯-৬০-এর রাজস্ব জরিপের মানচিত্রটি (মানচিত্র ঃ ২.২) বিশেষ উপযোগী হত। বরিশাল মহাফেজ খানার ধূলিধূসরিত স্তূপ থেকে মানচিত্রটি উদ্ধারের পর দেখা গেল মানচিত্রের উত্তর অংশটুকু হরহর। উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা সত্বেও মানচিত্রটি পুনর্মুদ্রিত হল এই মনে করে যে স্বল্প ঘনবসতি, জঙ্গল সমাবৃত, নিরুদ্বিগ্ন শান্ত পারিপার্শ্বের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

২. থাকবস্ত ও কিশ্‌তওয়ারি জরিপ ঃ তালুক হরহর

এন. ডি. বীটসন-বেল ও জে সি.জ্যাক — এই দুই সেট্‌ল্‌মেন্ট অফিসারের তত্ত্বাবধানে ইংরাজ আমলে করা বাখরগঞ্জের কিশ্‌তওয়ারি জরিপ সর্বজনগ্রাহ্য, সবচেয়ে বিস্তারিত ও নিখুঁত। বরিশাল মহাফেজখানায় জরিপ-সংশ্লিষ্ট মূল্যবান কাগজপত্র, দস্তাবেজ এখনও পর্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষিত আছে। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের একাংশ, যা আমাদের সমীক্ষার আকরসূত্র সেগুলিও রীতিমতো ভালো অবস্থায় রয়েছে। ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত হরহর-ও জরিপের সঙ্গেই 'খানাপুরি' বা দলিল-লিখন, বিভিন্ন দায়ের ও দায়ের রফার কাজ চলে।

'গ্রাম মন্তব্য' দিয়ে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণের শুরু। থাকবস্ত ও কিশ্‌তওয়ারি জরিপের দুই সময়কার দুটি 'গ্রাম মন্তব্য' পাওয়া যায়, এই দুটি মন্তব্যের তুলনামূলক বিচার করে অন্তর্বর্তী সময়ে গ্রামে কী সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তার সম্যক ধারণা করতে পারি।

একটি সহজ কথা যে এই অন্তর্বর্তী সময়ে গ্রামে অর্থনৈতিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, কেননা গ্রামে পূর্বেকার লোকসংখ্যা ২৬৫ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৯ জনে পৌঁছায়। থাকবস্ত জরিপের ভিত্তিতে আগেই লক্ষ্য করেছি যে গ্রামের পরিকাঠামোগত বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি — না ছিল হাটবাজার, না কোনো শিক্ষালয়, না কোনো কারখানা বা শিল্পকুঠি। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের 'গ্রাম মন্তব্যে' উল্লেখ করা হচ্ছে বাটাজোর-এ নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের বাজার বসে। অন্যদিকে, স্বদেশি পর্বের সরকারি নথিপত্রে জানা যায়, আবদুল গফুর নামে বাটাজোর স্কুলের এক মুসলমান শিক্ষক স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। গ্রামের জনৈক প্রধান ব্যক্তি জানিয়েছেন, ইস্কুলবাড়িটি ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ি অর্থাৎ 'নূতন বাড়ি'র প্রবেশ পথের পাশেই। 'বাবু'-র অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো সরলকুমার এখনকার জায়গায়, বাটাজোর-হরহর সীমান্ত অঞ্চলে, ইস্কুল বাড়িটি সরিয়ে আনেন।

এই সময়কালে বাটাজোর দত্ত পরিবারে এমন দুই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে যাঁরা জনহিতকর কাজের জন্য জেলায় স্মরণীয়। এর সমর্থন পাওয়া যায় 'গ্রাম মন্তব্য'-এ ঃ

> এই মৌজা বাটাজোর দত্তের বাসভিটা। রায় দ্বারিকানাথ দত্ত বাহাদুর ও বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত পরিবারের দুই উল্লেযোগ্য ব্যক্তিত্ব। প্রথমোক্ত জন জেলা বোর্ডের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল জড়িত, এবং বরিশাল কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী। অন্যজন জেলার শিক্ষা উন্নয়নে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার কারণে সুপরিচিত; তিনি পিতার নামাঙ্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। জেলায় জনমুখি সকল আন্দোলনের তিনিই পুরোধা।

দত্ত পরিবারের এই দুই ব্যক্তিত্বের জনমুখী কর্মের গতিপ্রকৃতি ছিল দুই বিপরীত লক্ষ্যাভিমুখী। 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার কারণে দ্বারিকানাথের সঙ্গত ঘনিষ্ঠতা ছিল জেলা প্রশাসনের সঙ্গে; অপরদিকে ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির সপক্ষে দেশমানুষের স্বাধিকার শ্রীবৃদ্ধি অর্জনে অশ্বিনীকুমার জীবন ব্রত করেন। একটি সঙ্গত জিজ্ঞাসা জন্ম নেয় ঃ কী ভাবে এই দুই বিপ্রতীপ ধারা পরস্পরে মিশে যায়, বিশেষত নগর থেকে এই অজগ্রাম বাটাজোর-এ, তাঁদের ছোট গ্রামের ভিটায়?

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে অশ্বিনীকুমারের এক জীবনচরিত থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৮৭৩-এ রাজস্ব জরিপ চলাকালীন কর্মরত হিন্দিভাষী এক জরিপ-আমিন দ্বারিকা-নাথ দত্তদের পরিবারের এক যুবককে উদ্ধত স্বরে ডেকে জরিপের পিলারটি কোথায় দেখাতে বলে। বংশকৌলিন্যে গর্বিত মানুষ যেমন স্থিতধী হয় এই যুবকও সেভাবেই জরিপ-আমিনকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কোনো কারণের তোয়াক্কা না করে আগের তুলনায় আরও দুর্বিনীত-ঔদ্ধত্যে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে আমিন লোকটি। এইসব চাপান-উতর চলতে-চলতে তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। নাকারা বেজে ওঠে, খবর পৌঁছায়

'নূতন বাড়ি'তে যেখানে দত্তদেরই ছোট এক তরফ বাস করত। অশ্বিনীকুমারের তখন কিশোর বয়স। তাঁর এক কাকা জিজ্ঞাসা করেন কী করা উচিত এই সময়ে। এই সময়ে দুই পরিবারের সম্পর্কে বেশ চিড় ধরেছে। অশ্বিনীকুমার শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন ঃ "নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়াঝাঁটি থাকুক, শত হলেও আমরা ভাই।" 'নূতন বাড়ি'র নাকারাও বেজে উঠল, 'পশ্চিমের বাড়ি'র লোকদের সাহায্যের জন্য লোকলস্কর ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়াল। অশ্বিনীকুমার পৌঁছে দেখেন আমিন বেচারার রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা, মারধোর খাওয়ার উপক্রম। কোনো রকমে তিনি আমিনকে রক্ষা করেন, অবশ্য এসবের মধ্যে উত্তেজিত জনতার হাতে দু'তিন চড়ঘুসি অশ্বিনীকুমারকে সহ্য করতে হয়েছে।[২০]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, দত্তদের দুই তরফের শত্রুতা নিহিত ছিল ঘরের মধ্যেই, পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্বে। পরে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে, তবে আপাতত এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। এসব সত্ত্বেও প্রয়োজনে, আপদে-বিপদে একে অপরের সহযোগিতায় বিমুখ হতো না — যেমন, পারিবারিক কোনো ব্যাপারে বাইরের কারো কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। জেলাস্তরের রাজনীতিতে এই দুই তরফের রেষারেষি তাদের ভিটাগ্রামের ক্ষমতা-আধিপত্যের সম্প্রসার ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের গ্রামের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে জেলাস্তরে জনমুখী বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিজেদের স্ব-স্ব অবস্থান শক্তিশালী করে। কূটাভাসের মতোই যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য যা-কিছু উন্নতি সবই দত্তদের এই দুই তরফের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফসল। ধরে নেওয়া যায়, এই সময়কালেই গ্রামোন্নয়নের সমান্তরালে জেলা সদর বরিশালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অনেকটাই দত্তদের দুই গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায়। অঞ্চল নিয়ে এই বিশিষ্ট তালুকদার-গোষ্ঠীর আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে তুঙ্গে পৌঁছেছিল।

এই গল্পের আরও একটি দিক ছিল। ঘটনাটি থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো জরুরি অবস্থায় কি সংকটের সময়ে শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও জ্ঞাতিরা একজোট হতো। যখন এর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি সে-সময়ে দেখি যে এই পারস্পরিক রেষারেষি আসলে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার ভাগভাগিরও এক উপায়। যদিও এই সময়ে ঔপনিবেশিক শাসন জাঁকিয়ে বসেছে কিন্তু এক নতুন সামাজিক শক্তিরূপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় জন্ম নিচ্ছিল। দত্তদের দুই গোষ্ঠীর সরকার-পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থানের নীতি সময়োপযোগী ভরসাস্থল ছিল যেমন সে-রকমই আবার বাংলার পরিবর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক আবহে ঐতিহ্যবাদী এই তালুকদার পরিবারকেও স্থায়িত্বদান করেছিল। অবশ্যই তা সচেতন প্রক্রিয়ার নয়। অবচেতনার এই প্রক্রিয়াই জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের ক্ষেত্রে বিস্তৃততর ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ঘটনা সংশ্লিষ্ট আরও একটি বিষয় গণ্য করতে হবে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল গ্যাসট্রেলের তত্ত্বাবধানে থাকবস্ত জরিপের অব্যবহিত পরে জেলায় প্রশাসনিক আধুনিকীকরণের যে সূত্রপাত হয় তার ফলে বনেদি জমিদারদের ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও এক ধরনের পরিবর্তন এনেছিল। জমি জরিপ দলের সঙ্গে দত্ত পরিবারের বচসার জের পুলিশি

অনুসন্ধান পর্যন্ত গড়ায়। অশ্বিনীকুমারের জীবনীকার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছেন, গ্রামের কোনো ব্যক্তিরই দত্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো সাহস ছিল না। পুলিশ অন্য কোনো সূত্র মানতে পারে, নাকাড়া বাজিয়ে দত্তদের দুই পক্ষের লোকলস্কর জড়ো করা হয়। পুলিশ অনুসন্ধানের নির্দেশ জেনে দত্তরা স্থানীয় এক পুকুরে নাকাড়া দুটি বিসর্জন দেয়।[২১]

এভাবেই জমিদারি ক্ষমতার একটি চিহ্ন চিরতরে হারিয়ে যায়। তালুকদারি প্রতিপত্তি ক্ষমতার উপরে আধুনিক প্রশাসনের ছায়া তখন দীর্ঘতর হয়ে নেমে আসতে শুরু করেছে।

সুরেশচন্দ্র গুপ্ত কথিত অন্য এক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিবেশী শোলক গ্রামেরই এক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেছেন কিশোর অশ্বিনীকুমার, অগ্রজ একজনের পরামর্শ মতো তিনি পঁচিশ জনের সমভিব্যাহারে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের কৃতার্থ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলা জমিদারি মানসিকতার ঘোরতর বিরোধিতার চেষ্টা করতেন, উপরন্তু তাঁর জনমুখী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষ নিজ সামর্থেও নিজের পায়ে যাতে দাঁড়াতে পারে। গ্রামবাসীর প্রতি জমিদারশ্রেণীর চিরাচরিত মনোভঙ্গিও বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে, এবং বিরোধিতা আসছে স্বগোষ্ঠীভুক্ত এক শিক্ষিত শ্রেণীর থেকে।

কিশ্‌তওয়ারি জরিপের নথিপত্রে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে যে, এই সমস্ত নথির আলোচ্য সমস্যা জমিস্বত্বকে কেন্দ্র করে। বাংলার কোনো জমিদারি অঞ্চলে এই বিষয়টি অন্তুতপক্ষে দুটি স্তরে দেখা উচিত ঃ প্রথমত, জমিদারদের দিক দিয়ে; দ্বিতীয়ত, জমির প্রকৃত স্বত্বাধি-কারীদের পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের এই আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে দেখব যে এই দুটি বিশিষ্ট বর্গ আবার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত; আপাতত সুবিধার জন্য আলাদা-আলাদা ভাবেই বিবেচনা করব।

কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময়ে এই গ্রামের জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩০৪.৪৫ একর। গ্রামের ৩৯টি ভূসম্পত্তির সবই ছিল তালুক, বাকি ৫.০২ একরের মতো ছোট জমি ছিল ঢাকা কালেক্টরেট-এর রাজস্ব অঞ্চলে। সারণি ঃ ২.১-এ প্রতিটি তালুকেব বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। মোট জমি-অঞ্চলকে তালুকের সংখ্যা দিয়ে সাধারণ ভাগ করলেই দেখা যায় প্রতিটি তালুকের গড়ে জমি ছিল ৭.৬৮ একর মাত্র। গ্রামের সবচেয়ে বড় তালুক ছিল তৌজি নম্বর ১২১১-এর রামশঙ্কর দত্তের, জমির পরিমাপ ৩৭.০৪ একর।

৩৯টি তালুকের মধ্যে ১০টির মাত্র জমির পরিমাণ ছিল ১০ একরের সামান্য বেশি। গ্রামের সবচেয়ে ছোট তালুক, ফরিদপুর তালিকাভুক্ত, তৌজি নম্বর ৫৫৫২-এর তালুব মাহেরজোব, মাত্র ০.১৮ একর। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে ৮টি তালুক ছিল ১ একরের কম। এই ৮টির মধ্যে ৩টি ছিল ফরিদপুর রাজস্ব-তালিকার অন্তর্গত। মনে রাখা প্রয়োজন, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার নিকট প্রতিবেশী-অঞ্চল গৌরনদী থানা; মাদারিপুর ১৮৭৩ পর্যন্ত বাখরগঞ্জ প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে ছিল। এমনকি গৌরনদী এই সময়কালে মাদারি-পুর মহকুমার অন্তর্গত। এছাড়া, তালুক-অন্তর্গত জমির কোনো সংহত সুনির্দিষ্ট আকৃতিও ছিল না; ছোট-ছোট বিক্ষিপ্তভাবে জমিগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

সারণি ঃ ২.১ হরহর-এ জমি ছিল যে সমস্ত তালুক-এর (কিশ্‌তওয়ারি জরিপ অনুযায়ী)

তৌজি নম্বর (১)	তালুক স্বত্ব (২)	মোট এলাকা (একরে) (৩)	হরহর-এ জমি (৪)	মোট খাজনা (৫)	হরহর থেকে প্রাপ্য খাজনা (৬)	তালুক-এর উৎপত্তি (৭)	বর্তমান মালিকানা (৮)
৪৮১	হায়তন্নেসা খাতুন		০.৮৩	২	০		
৪৯৬	বাণেশ্বর দত্ত	১১৭.৫৮	৭.২৪	২-১২-১০	৩-৫-৭	দ.বা.	দ.বা.
৫১০	ভবানী প্রসাদ দত্ত	২১.৬৫	১.৫৫	৫-৫-৪	০-৯-৩	-ঐ-	দ.বা.
৫১৭	বিষ্ণুপ্রসাদ দত্ত	৩৭.৭৪	৮.৫০	১৪-১৪-১১	২৪-১৫-০	-ঐ-	প.বা.
৫৫১	দুর্গা জয়মণি কুকুরি	২০৩.৯১	২.৫৫	৮৬-৮-১০	১১-৬-৬	প.ব.	(প.বা.)
৫৬১	দর্পনারায়ণ দত্ত	৩০৬.০০	০.৯০	৭৫-৬-৫	৩-০-০	-ঐ-	-ঐ-
৫৭৩	গোলকনাথ দত্ত	১৩৩.৪৩	৬.৭৫	১৪-৭-৩	২৩-১২-০	-ঐ-	-ঐ-
৫৮৮	গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত	৮৮.৪৭	৫.৪৮	৯-১১-৪	১-৮-০	পাঁ.আ.বা?	*
৬০১	গঙ্গানারায়ণ দত্ত	৬৫৬.৫৯	১৭.৬৪	৩০-১-৯	৭৬-২-১	নূ.বা	নূ.বা.
৬০২	গোকুলনারায়ণ দত্ত	৩০৩.৩৭	১৩.৯৩	১৫-১১-৫	৪৬-৩-৩	-ঐ-	-ঐ-
৬৪৯	জগন্নাথ দত্ত	১১.৮২	৩.১৫	৮-১-০	৩-৩-১১	দ.বা	দ.বা/প.বা
৬৮৪	জয়নারায়ণ দত্ত	৬৯.৬৮	৫.৪৮	৯-১০-৮	১-৮-০	পাঁ.আ.বা	*
৬৮৯	জয়নারায়ণ সেন	৭২.৩৩	১২.৩৯	১১-১১-৯	৩০-৯-৯		প.বা.
৭০৮	কালিকাপ্রসাদ দত্ত	৩০.৭৮	২৩.৬৯	২৭-১২-১০	৫৭-১৪-৬	পু.বা.	পু.বা.
৭২৭	কাশীরাম দত্ত	১৭.৫৯	৮.৭৫	৪-৪-৩	২১-১০-৬	-ঐ-	-ঐ-/প.বা.
৭৪০	কৃষ্ণচন্দ্র বসু	১৩.৯৭	০.৩২	১-১-১	০-১২-০	*	*
৭৯১	লক্ষ্মী দাস	২৬৫.০৭	২৬.৯৩	৪৮-০-০	৭৪-১০-৩	*	প.বা.
৮৪০	মহাদেব চক্রবর্তী	১২.১৮	০.৩২	২-২-৬	-	*	*
৮৬০	নন্দকিশোর দত্ত	৪১৬.০৫	১১.৯১	৫৩-৬-৩	৩৩-৯-৫	নূ.বা.	নূ.বা
৮৭৭	উদয় নারায়ণ দত্ত	৩০৭.৯১	৫.২৭	৬৪-৮-৬	১-৪-৪	প.বা.	প.বা.

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৮৮১	প্রেমনারায়ণ দত্ত	২২৬.৭৩	১.৪৬	৯০-৯-১০	১-৭-৮	-ঐ-	-ঐ-
৮৮৪	পদ্মনারায়ণ দত্ত	৩৬.৭০	১০.৩৪	৭-১১-৯	৮-৭-৮	দ.বা.	দ.বা./নূ.বা./প.বা
৯২৩	রাজবল্লভ দত্ত	২৯২.৪১	৬.০৩	৭৮-৫-৫	১৫-১-৪	প.বা.	নূ.বা./প.বা
১০১৬	রামগোপাল দত্ত		২.২৩	৫-১০-১০	৩-১০-১১	?	প.বা.
১০৭৯	রামকিশোর দত্ত		৬.৫৯	২-৫-১	১৩-১৪-৭	পাঁ.আ.ব.	-ঐ-
১১১৪	রামাকান্ত দত্ত		০.৩৪	?	০-৬-৩		*/নূ.বা/দ.বা.
১১২৩	রামমাণিকা দত্ত		৩.৯৮	?	৪-১১-৯	দ.বা.	নূ.বা.
১১৩১	রামমোহন দত্ত		২.১৯	৯-১০-৯	. ১-১১-১১	পাঁ.আ.ব.	প.বা.
১১৯৮	রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ		১৩.৭৮	৬-২-২	৪৩-১৩-১১		-ঐ-
১২১১	রামশঙ্কর দত্ত		৩৭.০৪	৩-১-১	৬৪-১-৪	পু.বা.	*/প.বা./নূ.বা.
১২২৮	রুদ্রনারায়ণ দত্ত		৪.০৭	০-১১-৯	৬-১-৪	দ.বা.	প.বা./নূ.বা.
১২৮৩	রামানাথ দত্ত	৩৩৮.৮৫	৬.২৫	২৫-২-১২	২৪-১২-৩	প.বা.	প.বা.
১৩১৭	শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত	২২.৯৬	২ ১৪	২-৬-৫			*/নূ.বা.
১৩২৪	শিবনারায়ণ দত্ত	৭০.৩৬	৩.৯৯	২১-১২-৮		পাঁ.আ.আ.	নূ.বা./প.বা.
১৩৭৬	শিবনারায়ণ ঘোষ	৭০.৫৪	৩৩.৯২	১১-০-৩	৬৩-৫-১১		*/নূ.বা./প.বা.
৫১৫৮	সোভানউল্লাহ্		০.৪৭		০		
৫৫৫২ এফ	মাহেরজোব বিবি		০.১৮	০			
৫৫৫৩ এফ	নিয়ামতুল্লাহ্		০.৩৮	০			
৫৫৫৪ এফ	সোনাউল্লা		০.৩৭	০			
*ঢাকা			৫.০২				

সংকেত সূত্র/মন্তব্য ঃ ১.০.৭১ একর জমি থেকে; ২.১৩.৩৫ একর জমি থেকে; ৩.০.৫৪ একর জমি থেকে রাজস্ব ও খাজনা কলাম-এর হিসাব টাকা-আনা-পয়সা/পাই অনুসারে।

দ.বা = দক্ষিণের বাড়ি; প.বা = পশ্চিমের বাড়ি; পাঁ.আ.বা. = পাঁচ আসিন বাড়ি; নূ.বা. = নূতন বাড়ি; পূ.বা. = পুরানো/পুরান বাড়ি। * = অন্যান্য।

*/নূ.বা./পূ.বা. = অন্যান্য / নূতন বাড়ি / পুরানো বাড়ি জমি স্বত্ব, এই তালুকে।

কোনও বিস্তৃততর এলাকাতেও তালুকের এই অসংবদ্ধ বিক্ষিপ্ত চরিত্র লক্ষ্য করা গেছে। এই সমস্যার কথা মনে রেখেই আমরা দত্ত পরিবারের দশটি নির্বাচিত তালুক সমীক্ষা করব; তালুকগুলি তুলনামূলকভাবে বড়, মোট আয়তন ১০০ একরের বেশি। নাম দিয়েছি দত্তদের দশটি প্রধান মহাল। সারণি ঃ ২.২-এ দেখা যাবে এই দশটি ছোট মহাল ৫৫৮টি গ্রামে বিন্যস্ত ২৯৬৩.৯৮একর। গড়ে প্রতি তালুকের এক গ্রামস্থ আয়তন

সারণি ঃ ২.২ বাটাজোর দত্তদের ১০টি ছোট তালুকের জমির পরিমাপের আনুমানিক গড়

তৌজি নম্বর	তালুকস্বত্ব	যেসমস্ত গ্রামে তালুকটির জমি আছে তার সংখ্যা	তালুকের মোট এলাকা একরে	গ্রামে জমির পরিমাপের আনুমানিক গড়
৪৯৬	বাণেশ্বর দত্ত	১১	১১৭.৫৮	১০.৬৯
৫৫১	দুর্গাজয়মনি কুকরি	৬৩	২০৩.৯১	৩.২৪
৫৬১	দর্পনারায়ণ দত্ত	৬৬	৩০৬.০০	৪.৬৪
৫৭৩	গোলকনাথ দত্ত	৩৬	১৩৩.৪৩	৩.৭১
৬০১	গঙ্গানারায়ন দত্ত	৬৪	৬৫৬.৫৯	১০.২৬
৬০২	গোকুল নারায়ন দত্ত	৫৭	৩০৩.৩৭	৫.৩২
৮৬০	নন্দকিশোর দত্ত	৬৫	৪১৬.০৫	৬.৪০
৮৭৭	উদয়নারায়ন দত্ত	৭০	৩০৭.৯১	৪.৪০
৮৮১	প্রেমনারায়ন দত্ত	৬৩	২২৬.৭৩	৩.৬০
৯২৩	রাজবল্লভ দত্ত	৬৩	২৯২.৪১	৪.৬৪
	মোট	৫৫৮	২৯৬৩.৯৮	৫.৩১

সারণি ঃ ২.৩ দত্তদের ১০টি ছোট তালুকের জমির তালিকায় একই গ্রাম-নামের পুনরুল্লেখ

কতবার উল্লেখ হয়েছে	গ্রামের সংখ্যা (পুনরুল্লেখ হয়েছে)	
১	১৮	
২	১১	
৩	১১	
৪	১১	
৫	১৪	
৬	১৩	
৭	৪	
৮	১১	
৯	১৬	
১০	৩	(হরহর, দেওপাড়া, বাটাজোর)
মোট	১১২	

৫.৩১ একর। সঠিকভাবে বলতে গেলে ১১২টি গ্রামে প্রধান মহালগুলির জমি। 'তালুক খতিয়ান' থেকে জানা যায় ঝালকাঠি ও স্বরূপকাঠির পাঁচটি গ্রাম বাদে, বাকি গ্রাম ছিল গৌরনদী চৌহদ্দির মধ্যে। সারণি ঃ ২.৩-এ দেখানো আছে যে একটি গ্রাম কতবার 'তালুক খতিয়ান'- তালিকায় উল্লেখিত হচ্ছে। তিনটি গ্রামের দশবার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ এই তিনটি গ্রামে দশটি ছোট মহালের জমি আছে। গ্রাম তিনটি হরহর, দেওপাড়া, বাটাজোর — পাশাপাশি গ্রাম বলে স্থানীয় মানুষেরা এক নামে 'বাটাজোর' বলে ডাকে। দত্তদের

তালুকগুলির সদর বাটাজোর। কিন্তু বাটাজোর কেন্দ্র ক'রে দশটি প্রধান মহালের জমি বিস্তৃত নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, উপজেলা ও ইউনিয়ন-এর মানচিত্রগুলি পাওয়া যায়নি। ফলে মানচিত্রে গ্রামগুলির সঠিক অবস্থান দেখানো সম্ভব হয়নি। এই অঞ্চলের স্থাননাম বিষয়ে যা জেনেছি তার ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্য কোনো মানচিত্র করে নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা সে-তথ্য মানচিত্র করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবে মোটামুটি ধরে নেওয়া সম্ভব যে দশটি প্রধান তালুকের জমি বাটাজোর-ফরিদপুর সড়কের দুইপাশে, বাটাজোর হয়ে গৌরনদী থেকে শিকরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ছিল। যদিও গ্রাম-বিন্যাস সর্বত্র এক নয়। কয়েকটি জনকেন্দ্রিক অঞ্চল ছিল। এগুলি উত্তরে গৌরনদী থেকে শুরু করে বাটাজোর, বামরাইল, শিকরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত—এই অঞ্চলগুলি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য গ্রাম, প্রতিদিনের বা সপ্তাহান্তের বাজার বসে বা দুটিই আছে। আবার, ঐতিহাসিক কারণে পরিচিত, 'ভদ্রলোক' কেন্দ্রিক, একটি হাট আছে সেই মাহিলারা গ্রামের নাম ঐ তালিকায় নেই। মহিলারা-ফরিদপুর সড়ক পথের মাত্র দুই কিলোমিটার উত্তরে এবং এই পথের পশ্চিম পার ধরে সমান্তরালে একটি খাল বয়ে গেছে। এমনকি বর্তমানের বাটাজোর ইউনিয়নের মধ্যে চারটি গ্রাম ছিল যার কোনওটিতে দশটি প্রধান তালুকের কোনো জমি ছিল না। গ্রামগুলি বাহাদুরপুর, বাসুদেবপাড়া, কিফায়তপাড়া ও জয়সিরিকাঠি, সব ইউনিয়নের সীমান্তদেশে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, দশটি প্রধান তালুক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম কেন্দ্র করে মূল সড়ক পথ বরাবর গড়ে ওঠে। কিন্তু কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ, যেমন অন্যান্য প্রভাবশালী জমিদারদের উপস্থিতি, এ-অঞ্চলে গ্রামগুলির সমানুপাতিক বিন্যাসে বড় বাধা ছিল। এই নির্দিষ্ট বিষয় আরও অনুসন্ধানের জন্য সংযোযিত পরিশ্লিষ্ট গ্রাম তালিকা থেকে দেখা যায় তৌজি নম্বর ৮৬০-এ তালুক নন্দ কিশোর দত্তের জমি ছিল। নন্দকিশোর অশ্বিনীকুমারের পিতামহ, ফলে এই তালুকটি 'নূতন বাড়ি'-র তরফে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দত্তদের অন্যান্য প্রধান তালুক মূলত 'বাটাজোর' কেন্দ্র ক'রে। তাই হরহর-এ সবচেয়ে বেশি জমির তালুক — তালুক রামশঙ্কর দত্ত — দত্তদের এই চরিত্র-সম্পন্ন তালুকগুলির শ্রেণীভুক্ত। এসব জমিদারির ঐতিহাসিকতা বাদ দিয়ে বলা যায় যে তাঁরা অঞ্চল-আধিপত্যে দত্তদের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন সদরকেন্দ্রে নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করে।

এই আলোচনা থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট বেরিয়ে আসবে যে, গ্রামে কোনো ব্যক্তি সর্বেসর্বা নয়। দত্তদের বাদে, অন্যান্য জমিদারদেরও ঐ অঞ্চলে ভূসম্পত্তি ছিল। সারণি ঃ ২.১-এ গ্রামসীমার মধ্যে সমস্ত তালুকগুলি দেওয়া আছে। এই তালিকা উল্লেখের সময়ে স্মরণে রাখতে হবে, দত্ত পরিবারের বিভিন্ন তরফের মধ্যেই রেষারেষি ছিল। হরহর গ্রামের মানচিত্রের পরিশিষ্টে 'গ্রাম মন্তব্য' অংশে দত্ত পরিবারের বংশলতিকা দেওয়া আছে (বর্তমানে, তথ্য ঃ ২.১.১ ও ২.১.২ দেখুন)। বংশলতিকা ক্রমে ঃ রতিনাথ থেকে শুরু করে দত্তদের পাঁচটি বংশধারা। অশ্বিনীকুমারের সাতপুরুষ পূর্বজ রতিনাথ। কিশ্‌ত-ওয়ারি জরিপের কালে এই পঞ্চ বংশধারার মধ্যে দুই শাখা 'পাঁচ আমিন বাড়ি' ও 'পুরানো বাড়ি' পূর্বমর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠ নয় আর তাদের পূর্ব কৌলিন্য নেই; বাকি তিনটে শাখার মধ্যে ছিল 'পশ্চিমের বাড়ি', 'নূতন বাড়ি' 'দক্ষিণের বাড়ি'-র তিন তরফ। সাল তারিখের

নিরিখে 'পশ্চিমের বাড়ি' ও 'নূতন বাড়ি' বড় দুই তরফ, বেশি ভূসম্পত্তিরও অধিকারী; এই দুইয়ের তুলনায় 'দক্ষিণের বাড়ি' তেমন কিছু নয়। ফলে পারিবারিক রেষারেষিও সীমাবদ্ধ ছিল বড় দুই তরফের মধ্যেই। ইতিমধ্যে আমরা সে কথা জেনেছি।

সারাণ ঃ ২.৪ দত্তদের চারতরফ ও অন্যান্য জামদারদের অধানে হরহর অঞ্চলের জামস্বত্ব

	তালুকের মোট অঞ্চল (একরে)	হরহর-এ জমি (একরে)	হরহর থেকে খাজনা
বাটাজোর দত্ত বংশ	৩২৬০.৯৯	২২১.৭৯ (৭২.৮%)	৪৫১-১৩-৯
পশ্চিমের বাড়ি	১৮৭০.৬৫	১২৪.১২ (৪০.৮%)	২৭০-৩-২
নূতন বাড়ি	১৩৩৮.৮৯	৭১.৭০ (২৩.৫%)	১৫৪-১৪-৯
দক্ষিণের বাড়ি	২০.৬৭	২.২৮ (০.৭%)	১-১৫-০
পুরানো বাড়ি	৩০.৭৮	২৩.৬৯ (৭.৮%)	২৪-১২-১০
অন্যান্যরা	৮৪৩.৯৪	৮২.৬৬ (২৭.২%)	১৮৬-৭-৪১/২
মোট		৩০৪.৪৫	৬৩৪-৫-১১/২

সারণি ঃ ২.৪-এ তালুক অধিকৃত মোট এলাকা, দত্তদের চারপক্ষের জমি ও হরহর-এ অন্যান্য জমিদারদের এলাকার বিবরণ দেওয়া হল। গ্রামের ৩০৪.৪৫ একর জমির মধ্যে দত্তদের মালিকানায় ২২১.৭৯ একর বা ৭২.৮ শতাংশ। দত্তদের বিভিন্ন তরফ-এর মধ্যে হৃতগৌরব 'পুরানো বাড়ি'-র জমি ২৩.৬৯ একর বা ৭.৮ শতাংশ। এই তরফ-এর মোট জমির পরিমাণও ছিল খুব কম, ৩০.৭৮ একর মাত্র। গ্রামের বাইরে অন্যত্র কোথাও কিছু ছিল না। এছাড়াও, 'পুরানো বাড়ি'-র পরিবারভুক্তরা ছিলেন অন্যান্য কায়স্থ পরিবারে বিবাহিত দত্ত পরিবারের কন্যাকুলের বংশধর। প্রকৃতপক্ষে, মাতৃকুলের দিক দিয়ে দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিমাত্র এইসব লোকজন দত্ত গোষ্ঠীর কেউ ছিল না। সারণি ঃ ২.১-এ যেমন দেখানো হয়েছে যে 'দক্ষিণের বাড়ি'-র অধিকারভুক্ত মূল তালুকগুলির অধিকাংশই ছিল বড় তরফগুলির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কোনো কোনো সময়ে মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কুলীন-কায়স্থ না হওয়ার কারণে দত্তরা সবসময়েই চেষ্টা করেছে কুলীন-কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করতে, এ-বাবদে রীতিমতো যৌতুক দিতেও রাজি ছিল। ফলে 'পুরানো বাড়ি'-র তালুক জমির এক বড় অংশ কুলীন-কায়স্থদের হাতে চলে যায়। প্রক্রিয়াটি যদি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলতে থাকত তাহলে অঞ্চলে দত্তদের ক্ষমতার ভিত যেত নড়ে। কীভাবে তারা এটা সামলে ছিল? মধ্যস্বত্ব আলোচনার সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। এখানে অন্য একটি বিষয়ে আসতে চাইছি। দত্তদের বংশলতিকার দিকে একবার নজর করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হবে ছোট তরফরা বড় তরফদের তুলনায় পুরুষ উত্তরাধিকারে আশীর্বাদধন্য নয় যেমন ('পুরানো বাড়ি') সে রকমই আবার 'দক্ষিণের বাড়ি'-র মতো উত্তরাধিকারীর সংখ্যা অতিরিক্ত ছিল। ফলত, নিজেদের তালুকদারি ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারেনি। পরিবারের অধিকাংশ পুত্রসন্তানরা যদি দীর্ঘায়ুও হতো তাহলেও তালুকদারি সামান্যই পড়ে থাকত, কেননা ইতিমধ্যেই তালুকদারির অংশ ভাগ হতে হতে শেষের মুখে এসে পৌঁছেছে। তালুকদারির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়েছিল বংশগত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্বাভাবিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, এরফলে বংশলতিকার শাখা-উপশাখার বহুধাবিস্তৃত সূত্রে উত্তরাধিকার রোধ করা গিয়েছিল।

সারণি ঃ ২.৫ কিশ্তওয়ারি জরিপে হরহর-এর খতিয়ান-এর সংক্ষেপসার

তালুকের চরিত্র		মালিকের ব্যক্তিগত জমি	ব্যক্তিগত নয় এমন জমি মালিকের		নির্দিষ্ট খাজনাপ্রদায়ী বায়ত	স্থায়ী বায়ত	দখলিস্বত্ব বায়ত	অনধিকারী বায়ত	নিষ্কর জমি				সাধারণের দখলিস্বত্ব	সাধারণের ঋণ দখলি স্বত্ব	মোট	বায়ত-এর অধীন		
									সেবামূলক		অন্যান্য					প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
									ভোগদখলি স্বত্ব	ইজারা স্বত্ব	ভোগদখলি স্বত্ব	ইজারা স্বত্ব						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)		(১১)		(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)		
খাজনা প্রদায়ী তালুকভুক্ত	১		৫৬	১৯		৩০৬		৬		২৭	১০	১	১		৪২৬	১৫		
(খতিয়ান সংখ্যা	২		৪.৯৯	১.৮৯		১৭২.৩৮		০.১০		১৪ ১১	১.৩৯	-	-		১৯৪ ৫৬	৬ ২০		
চাষযোগ্য জমি)	৩		২৯ ৫৭	৫ ৭৩		২৩৮ ৯৭		০.৬৩		১৮ ০০	৬.৩০	০ ১৭	০ ০৬		২৯৯ ৪৩	৬ ৭৪		
রাজস্ব-মুক্ত তালুকভুক্ত	১																	
	২																	
	৩																	
সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন	১												১		১			
সরকার-এর অধীনে	২												-		-			
	৩												৫ ০২		৫ ০২			
	১		৫৬	১৯		৩০৬		৬		২৭	১০	১	২		৪২৭	১৫		
মোট মৌজা	২		৪ ৯৯	১ ৮৯		১৭২ ৩৮		০ ১০		১৪ ১১	১ ৩৯		-		১৯৪ ৫৬	৬.২০		
	৩		২৯ ৫৭	৫ ৭৩		২৩৮.৯৭		০ ৬৩		১৮ ০০	৬.৩০	০.১৭	৫ ০৮		৩০৪ ৪৫	৬ ৭৪		

সারণি ঃ ২.১ অনুযায়ী, 'দক্ষিণের বাড়ি'-র পাঁচটি তালুক সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ 'পশ্চিমের' বা 'নূতন বাড়ি'-র অংশে চলে যায়। তালুকগুলির তৌজি নম্বর যথাক্রমে ৪৯৬, ৫১৭, ৬৪৯, ৮৮৪ ও ১২২৮। অংশভাগ বিষয়ে জানিয়ে, রায় বাহাদুর দ্বারিকানাথের চার ভাই ও অশ্বিনীকুমারের দুই ভাই মায়ের অংশ বাদ দিয়ে সমপরিমাণ জমি ভোগ করতেন, তাঁদর নিকট-আত্মীয়দের কারোই ভাগ ছিল না। এর থেকে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ 'দক্ষিণের বাড়ি'-র তালুক তাদের বাবার আমলেই বড় তরফদের কাছে হাতবদল হয়েছিল (হরনাথ ও ব্রজমোহন মারা গেলেন যথাক্রমে ১৮৫৭ ও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে)।

৩. হরহর-এ মধ্যস্বত্বভোগী

কিশ্‌তওয়ারি জরিপের তালিকানুযায়ী হরহর-এ মধ্যস্বত্বে ১৯টি খতিয়ান। মধ্যস্বত্বের অধিকারে মোট অঞ্চল ৫.৭৩ একর যার ১.৮৯ একর আবাদি জমি। এই মোট অঞ্চল রাজস্ব প্রদানকারী তালুকগুলির অন্তর্গত। এই পরিসংখ্যান মধ্যস্বত্বের মোট এলাকার ৩৩ শতাংশের সঙ্গে মেলে (সারণি ঃ ২.৫ দেখুন)। প্রতিবেশী গ্রামগুলির পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে (সারণি ঃ ২.৬) দেখা যাবে হরহর-এর রায়তি-স্বত্বাধিকারীরা সাধারণত কম জমি ভোগ করে। এই সারণি থেকে কয়েকটি গ্রাম বাছাই করে নিয়েও দত্তদের তালুকদারি ব্যবস্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো এক ধরনের নিরীক্ষায়ও বিশেষ সাহায্য করে না; কেননা তুলনায় বড় অঞ্চল নিয়ে গ্রামগুলি দত্তদের সদর অঞ্চল থেকে দূরে থাকায় এই তালিকার অন্তর্গত নয়। ৫৫টির বেশি গ্রামে ছড়িয়ে থাকা দত্তদের তালুকগুলি ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল — এই পরিপ্রেক্ষিত বিচারে এমন সিদ্ধান্তের প্রবণতা দেখা যায় যে মধ্যবর্তী-স্বত্বের উদ্ভবের কারণ, সহজে খাজনা আদায় করা। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় খাজনা আদায়-সংশ্লিষ্ট ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য এই মধ্যবর্তী-স্বত্ব জমিদাররা নিজেরাই সৃষ্টি করে থাকবেন। উপরন্তু, খাজনার একাংশ এই মধ্যবর্তী-স্বত্বাধিকারীদের আয় হিসাবে দিয়ে দেওয়ার মধ্যে জমিদাররা আশা করতেন, সময়ে সহযোগিতা পাবেন; উল্লেখ করার যে মধ্যবর্তী-স্বত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বজাতভুক্তদের দেওয়া হয়। খাজনা-স্বত্বের একাংশ ছেড়ে দেওয়ায় জমিদাররা তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। আপাতভাবে ন্যায়সংগত এই অনুমান বর্তমান গ্রামের প্রকৃত অবস্থার নিরিখে খুব কমই সাহায্য করে।

ফলে হরহর-এ মধ্যস্বত্বভোগীর স্বল্পতার কারণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করা উচিত। এক্ষেত্রে আমরা গ্রামের কায়স্থদের কথা বিচার করব। সাধারণত হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারী। হরহর-এ কোনো বৈদ্য ছিল না, ব্রাহ্মণ স্বল্পসংখ্যক এবং কায়স্থদের থেকে কম প্রভাবশালী। কিন্তু কায়স্থদের অনায়াসে শনাক্ত করা যায় না। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময়ে হরহর-এর কায়স্থদের বসতির ধরন মানচিত্র ঃ ২.৩-এ দেখানো হল। সম্ভবত কায়স্থকুলের যেসব পরিবারের এই গ্রামেই বাস্তুভিটা তারা চারটি পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত ঃ

(১) দত্তদের 'পশ্চিমের' বাড়ি ও 'নূতন' বাড়ি; (২) দত্ত পদবির ও নিঃসন্দেহে

মানচিত্র ঃ ২.৩ হরহর গ্রামে কায়স্থ পরিবার-এর বাসস্থান কেন্দ্র

মানচিত্র ঃ ২.৪ হরহর গ্রামে দাস পরিবারের জমি
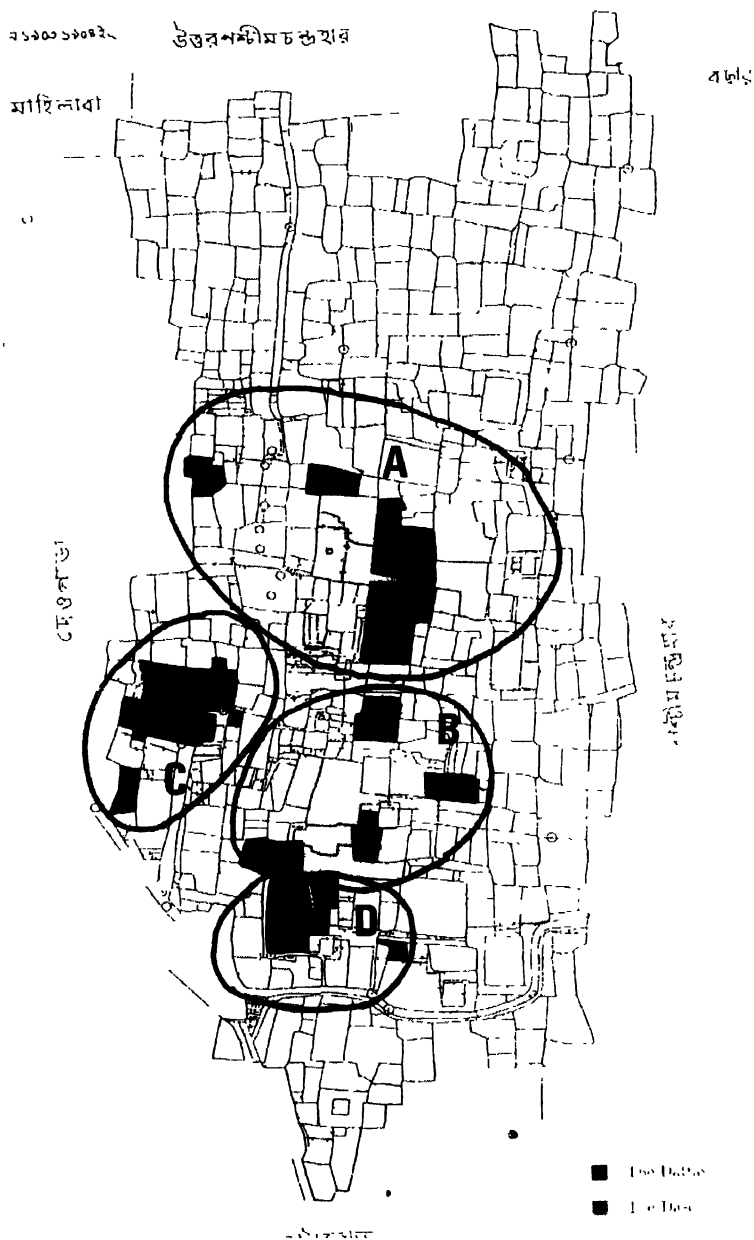
কায়স্থ বলা যায় এমন পরিবার; (৩) পদবির ভিত্তিতে অনুমান করা যায় এমন কায়স্থ পরিবার; (৪) দাস পদবির কায়স্থ পরিবার। মানচিত্র ঃ ২.৪ থেকে যেমন বোঝা যায় যে অনেক বসত-বাড়ই দাস পারবারগুলর।

সারণি ঃ ২.৬ হরহর ও প্রতিবেশী গ্রামগুলির দখলিস্বত্বের অধীনে এলাকা

গ্রাম	রাজস্বপ্রদায়ী তালুকগুলির অধীনে			
	মোট এলাকা (একরে) (১)	গ্রামের মোট এলাকার তুলনায় শতকরা হার (২)	আবাদি জমি (একরে) (৩)	শতকরা হিসাবে ১-এর তুলনীয় (৪)
হরহর	৫.৭৩	১.৯	১.৮৯	৩৩.০
দেওপাড়া	২৫.৩৯	-	৮.৫১	৩৩.৫
উত্তর লক্ষ্মণকাঠি	২৭.৫০	৮.৩	১৭.৫১	৬৩.৯
খেয়াঘাট	২২.৬৮	৮.৬	১০.২৪	৪৫.১
জয়সিরকাঠি	১৪.১০	১২.০	১.৪৯	১০.৬
চালপুর	২৫.১১	৯০.৮	২০.০৭	৭৯.৯
নোয়াপাড়া	১১.৪৭	৩.৪	১০.৫১	৯১.৬
দক্ষিণ বাহাদুরপুর	২২.৭১	৭.৮	১৩.৩০	৫৮.৬
পশ্চিম চন্দ্রহার	৩.০১	১.৬	৩.০১	১০০.০
চন্দ্রহার	১২.৯৭	৪.৬	৬.৩৮	৪৯.২
বাছার	০.৮২	০.৪	০.৮২	১০০.০
মাহিলারা	৪৭.৫৮	১১.৩	১৮.৫৩	৩৮.৯

সারণি ঃ ২.৭ আপাত কায়স্থ দাসদের প্রতি একরে দেয় খাজনা

বাস্তুভিটার প্লট নম্বর	কর্ষদার-এর নাম	কর্ষদার এর অধীনে জমি (একরে)	খাজনা (টাকায়)	প্রতি একরে খাজনা
২৭৯	প্রসন্ন কুমার দাস	৪.৮৬	৮.৩৪	১.৯৯
৪৭৪	রাজকুমার দাস	০.৩৮৫		
	নন্দকুমার দাস	০.৩৮৫		
	কালীকুমার দাস	১.৫৪ ০.৩৮৫	৫.৪৪	৪.৭৭
	গোপালচন্দ্র দাস	০.৩৮৫		
৪১২	ধনকৃষ্ণ দাস	২.৭৭	১০.০২	৩.৬২
	মাতঙ্গিনী দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	উমাচরণ দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	শ্যামাচরণ দাস	১.২৪	৩.২৩	২.৬১
	হরচরণ দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	অভয়াচরণ দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	কৃষ্ণকুমার দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	মনিরাম দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	বসন্তকুমার দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০
	মধুসূদন দাস	০.১২	০.৫৪	৪.৫০

দাস পদবির সমস্ত পরিবারকেই আমরা কয়েকটি কারণে কায়স্থ হিসাবে গণ্য করব ঃ (১) বর্তমান সময়ে হরহর-এ দাস পদবির তিনটি জাত দেখা যায়, যথাক্রমে 'কায়স্থ'

দাস, 'রজক' দাস বা 'ধোপা' দাস, 'বারুই' দাস। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বাংলায় 'দাস' পদবি সকল জাতের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কিশ্‌তওয়ারি জরিপের নথিতে 'রজক' দাস ধোপা বা ধুপি এবং 'বারুই' দাস 'দাস বার' হিসাবে সবিশেষ ধারাবাহিক উল্লেখ আছে। ফলে যেসব দাস পদবির ক্ষেত্রে এই বিশেষ উল্লেখ নেই তাদের 'কায়স্থ' দাস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

(২) সর্বস্তরের 'দাস' উপাধির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা এই গ্রামের স্থিতিবান রায়ত। ফলে, আমাদের পূর্ব-অনুমানবিরোধী যে, গ্রামে কায়স্থদের আবির্ভাব হয় জমিদার বা মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীরূপে। যা হোক, অন্তত তিনটি জমি 'দাস' পদবির কায়স্থদের। (ক) প্লট ৪১২-র ধনকৃষ্ণ দাস ও শ্যামাচরণ দাস অন্যতম। এখনও একই জমিতে ধনকৃষ্ণের ছেলে উমেশচন্দ্র ও শ্যামাচরণের ছেলে প্রফুল্লকুমার — শিবাই ডাকনামে অঞ্চলে পরিচিত — বসবাস করে। যদিও কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময়ে প্লট নম্বরের বদল হয়েছে। (খ) ২৭৯ নম্বর প্লটের প্রসন্নকুমার দাস গোপাল দাসের পিতামহ। যদিও গোপাল দাসের অন্যত্র বাড়ি আছে, রাজস্ব জরিপের সময়ে তিনি জানিয়েছেন যে এখনকার প্লট ৪৫১-৫৩ পূর্বেকার কিশ্‌তওয়ারি জরিপের ২৭৯ নম্বর প্লট একই। এইটি তার আদি বাসভূমি এবং তারই মালিকানাধীন। (গ) প্লট ৪৭৪ ঃ রাজস্ব জরিপে ৮০৩ নম্বর জনৈক কায়স্থের। বর্তমানে জমির স্বত্বাধিকারী আবদুল মজিদ শিকদার। তিনি আমাকে জানান, অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনের দপ্তরি রামকুমার দাসের থেকে এই জমি কেনেন। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের রায়তি খতিয়ানে এই রামকুমার দাসের নাম জমির স্বত্বাধিকারী হিসাবে নথিভুক্ত। এই তিনটি উল্লেখ প্রমান করে যে 'কায়স্থ' দাসেরা প্রকৃতপক্ষে কর্ষ বা চাষ জমির স্বত্বাধিকারী।

(৩) গ্রামে থাকার সময়ে এক প্রবীণ দফাদার আমাকে বলেন, ২২৪-২৭, ২২৯, ২৩৪, ২৭৬ ও ২৭৯ প্লটগুলিকে কায়স্থপাড়া বলা হতো। ফলে এই অঞ্চলের দাস পদবির সকলকে কায়স্থরূপে গণ্য করতে পারি।

(৪) গ্রামের দাস পদবির সকলকে যদি কায়স্থ হিসাবে ধরে নিই তাহলে একে অপরের থেকে আলাদা এমন চারটি অঞ্চল আমরা স্পষ্ট চিহ্নিত করতে পারি (মানচিত্র ঃ ২.২ দেখুন)। প্রত্যেকটি অঞ্চল কোনও প্রভাবশালী জমিদারের বসতবাড়ি কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

অঞ্চল ঃ ক ঃ প্লট নম্বর ২২৪ - ২৫ — ঘোষ পরিবারের; অঞ্চল ঃ খ ঃ প্লট ৪০১ — গুহদের; অঞ্চল ঃ গ ঃ প্লট ৩৩৩ — 'পশ্চিমের বাড়ি'; অঞ্চল ঃ ঘ ঃ প্লট ৪৮৬ — 'নূতন বাড়ি'।

হরহর-এ কায়স্থ জমিদাররা সরাসরি মধ্যবর্তী-স্বত্ব তৈরি করে স্বজাতের মধ্যে রাজস্ব আয় বন্টন করতেন না। সামাজিক বর্ণভেদে কায়স্থ দাসেরা ছিল নিচুজাতের কায়স্থ, গ্রামে তাঁরা মধ্যস্বত্বভোগীর মর্যাদাবঞ্চিত কর্ষদার বা চাষি। ঘোষ ও গুহরা ছিল 'কুলীন' কায়স্থ ও 'সিদ্ধ মৌলিক' হিসাবে দত্তরা ছিল সামাজিক স্তরে সর্বোচ্চ। সারণি ঃ ২.৭-এ দেখানো হয়েছে, এমনকি দাস 'কায়স্থ'রা অ-কায়স্থ কর্ষদারদের থেকে কম হারে খাজনা দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। হরহর-এ রায়তদের খাজনার হার ছিল ৩ টাকা ৭ আনা

অর্থাৎ ৩ টাকা ৪৪ পয়সা। এই দাসেদের মধ্যে যারা অবশ্যই কায়স্থ — রাজকুমার দাসেরা চার ভাই ০.৪০ একর নিষ্কর 'চাকরান' স্বত্ব বা 'মণ্ডলী' স্বত্বে বাগানের অধিকারী। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় 'মণ্ডলী' এমন এক ব্যক্তির উপাধি যিনি 'মণ্ডল' বা গ্রাম-প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। জমিদারদের প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও তাদের তদারকি করাও খুব সম্ভবত এঁদের হাতেই ন্যস্ত করা হতো। গ্রামসমাজের সঙ্গে 'মণ্ডল' পদের কোনো রকম সম্পর্ক তখন লুপ্ত হয়ে গেছে এবং জমিদাররা 'চাকরান' প্রথায় এই পদের পারিশ্রমিক দিতেন। সঠিকভাবে বলা যায় না, কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময়ে গ্রামে 'মণ্ডল'-এর কাজকর্ম কতদূর প্রসারিত ছিল। আমাদের অনুমান, সে কোনও কাজই আর করত না।

হরহর-এ সংকীর্ণ মধ্যবর্তী ভোগীর কারণ হিসাবে বলা যায়, অসংখ্য কায়স্থ 'দাস' মধ্যস্বত্ব রায়তির যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। 'কর্ষদার' রূপে একমাত্র 'চাকরান' স্বত্ব ছাড়া বিশেষ কোনো অন্য সুযোগসুবিধাও ভোগ করতে পারত না; আর 'চাকরান' স্বত্বে তাদের স্থান ছিল জমিদারের কর্মচারী হিসাবে। অর্থনৈতিক কারণ বাদেও সম্ভবত আরও কয়েকটি ব্যাপার কাজ করত; আর জমিদারের বসতবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বাস করার দরুন তার কর্ষদার ও জমিদারের মধ্যে মধ্যস্থতার সূত্র হিসাবে কাজ করত।

তাহলে হরহর-এ মধ্যস্বত্বভোগী কারা? সারণি ঃ ২.৮-এ খাজনা প্রদানকারী মধ্যস্বত্ব-ভোগী সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ২৬টি ছিল নিষ্কর স্বত্ব। এটা স্পষ্ট যে মধ্যস্বত্বভোগী বলতে তালুকভোগী ছাড়া আর কেউ নয়। ফরিদপুর জেলার কনকশার তালুক প্রসঙ্গে আলোচনায় ডঃ এন. নাকাজাতো উল্লেখ করেছেন, তালুকটি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিস্তৃত হয় জমির ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যের অনুমানের ভিত্তিতে ঃ আড়াআড়ি বা আনুভূমিক বৈশিষ্ট্য ও খাড়াই বা উলম্ব চরিত্রের।[২২] এলাকার বাইরে জমিদারের স্বত্বাধীন এমন জমি কেনার রীতি হল আড়াআড়ি পদ্ধতি; অন্যদিকে মধ্যস্বত্ব অধিকারী জমি কেনার পদ্ধতিকে খাড়াই বা উলম্ব বলা যেতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বের ভিত্তি নতুন সৃষ্ট তালুকের ক্ষেত্রে যেখানে এই নতুন তালুকদার কি ভিতরে কি বাইরে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের প্রসারে আপ্রাণ সচেষ্ট; পুরানো তালুকগুলির ক্ষেত্রে নির্বিশেষে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না। হরহর-এর ক্ষেত্রেই দেখা যায় মধ্যবর্তী-স্বত্ব জমিদারের এই খাড়াই বা উলম্ব রীতির ফল নয়।

বরিশাল-এ জমিস্বত্বের জটিল চেহারা সর্বজনবিদিত; এই কারণেই হরহর গ্রামের মধ্যস্বত্বভোগী চেহারা যতটা দূরপ্রসারী আশা করা গিয়েছিল ততটা নয়। সাতটি তালুকে মালিক ও বর্গাদারের মধ্যস্থ হকিয়তদার বা মধ্যস্বত্বভোগীরা তিন স্তরে বিভক্ত ছিল। মধ্যস্বত্বভোগীর ক্ষেত্রে হরহর-এ এই ত্রিস্তর পর্যায়ই সর্বোচ্চ। তালুকগুলি হল ঃ তালুক জয়নারায়ণ দত্ত, তৌজি নম্বর ৬৮৪; তালুক রুদ্রনারায়ণ দত্ত, তৌজি ১২২৮; দেখা যাচ্ছে ৫টি তালুক এক ও একই স্বত্বের শাখা-উপশাখা; তালুক হায়াতন্নেসা খাতুন, তৌজি নম্বর ৪৮১; সাবানুল্লা, তৌজি ৫১৫৮; মাহেরজোব বিবি, তৌজি ৫৫৫২এফ; নেয়ানতুল্লা, তৌজি ৫৫৫৩এফ; সোনাউল্লা, তৌজি ৫৫৫৪এফ। তালুকগুলির কোনোটিরই গ্রামে ৬ একরের বেশি জমি ছিল না। উল্লেখ করার, মুসলমান নামের যে পাঁচটি তালুক সেগুলির মোট জমির পরিমাণ ২.২৩ একর মাত্র। এই তালুকগুলির চিত্র ঃ ২.১ দেওয়া হল এবং সঙ্গে (চিত্র ঃ ২.২) তালুক নন্দকিশোর দত্ত পেশ করা হল প্রাসঙ্গিক নজির হিসাবে। প্রতি-

বেশী গ্রামগুলির মধ্যস্বত্ব হকিয়তদারি চরিত্র কম-বেশি হরহর-এর মতোই। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় পূর্ব চন্দ্রহার ও দক্ষিণ বাঁকড়ায়, যেখানে হকিয়তদারি স্বত্ব পাঁচ স্তরের। কিন্তু আধুনা ও বেতগর্ভ যথাক্রমে ৬ ও ৯ পর্যায়ের হকিয়তদার; এই গ্রামদুটি হরহর থেকে মাত্র দুই মাইল পূর্বে। আমরা আগেই জেনেছি, হরহর-এর জমিদাররা হকিয়ত বা খাজনা বাবদে আয় স্বজাতির জ্ঞাতিদের ভাগ করে দিতেন না, পরিবর্তে দিতেন 'কর্ষ' বা চাষজমি। খাজনা আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বের আদৌ কোনো প্রয়োজন জমিদারদের ছিল না, সে কারণেই মনে হয় ব্যাপারটিই পরিত্যজ্য ছিল।

স্বত্বাধিকারীদের নাম থেকে প্রকাশ পায় যে এদের অধিকাংশই সম্প্রতিকালের। বংশের প্রতিষ্ঠাতার নামে দখলিস্বত্বের উল্লেখ করা হতো। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময় (সারণি ঃ ২.৮) মোট ৬৮টি হকিয়ত স্বত্বের মধ্যে ২৬টি বর্তমান প্রজন্মের, ১৯টি পূর্ববর্তী সময়ের। প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে বাকি ২৩টি হকিয়ত স্বত্বের উদ্ভবের সময় নির্ধারণ করা যায় না। এমনকি এ বলা যেতে পারে অন্ততপক্ষে ৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ৪৫টি হকিয়ত স্বত্ব ১৮৫০-পরবর্তী সময়ের সৃষ্টি। উল্লেখ্য হকিয়ত স্বত্ব তৈরিতে জমিদাররা নিজেই উৎসাহী ছিলেন। অশ্বিনীকুমার নিজেই এই রীতি সজ্ঞানে মেনে চলতেন।

কোনো নতুন হকিয়ত স্বত্বের পত্তন বলতে বোঝায় তালুকটির এক বিশিষ্ট ধরনের হাত-বদল। উত্তরাধিকার মোতাবেকেই তালুক স্বত্বের বদল — এই হল চলতি রীতি। কিন্তু এছাড়াও বিক্রির মাধ্যমে বা মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসাবেও মালিকানা বদল হতো।

আর্থিক সংকটের কারণে নিজস্ব ভূসম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে, এমন একটি ঘটনা হল দত্তদের 'পাঁচ আমিন বাড়ি'র ক্ষেত্রে। সম্ভবত এরকমই কোনো সংকটের কালে তাঁদের দুটি তালুক — গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত তৌজি ৫৮৮ ও জয়নারায়ণ দত্ত তৌজি ৬৮৪ — নিলামে ওঠে। তালুক দুটি কেনেন সুন্দরানির সমাদ্দাররা, খুব সম্ভব এঁরা জাতে বণিক।[২৫] এই দুটি সম্পত্তি একই তালুক লতিকার অন্তর্গত। দুই ভাই অশ্বিনীকুমার ও রাজেন্দ্রকুমার সমাদ্দারের অধীনে প্রথম পর্যায়ের/স্তরের মধ্যস্বত্ব, দুটি 'মিরাস হাওলা', দুটি 'আসত তালুক' ও একটি 'মিরাস ইজারা' ছিল। চিত্র ঃ ২.৩-এ দেখা যায়, হকিয়তের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল খুবই লাভজনক; শুধুমাত্র 'আসত তালুক' দুর্গাদাস চক্রবর্তীর (খেওয়াত নম্বর ৬৯) ব্যতিরেকে। হকিয়তটি বারো আনার ঘাটতি পড়ে। সমস্যাচিহ্নিত এই 'আসত তালুক'-এর অধীনে ছিল 'নিম-আসত তালুক' যা আবার আলাদা ছয় ভাগে বিভক্ত। এই ছয়টি ভাগের চারটি দত্তদের, দুটি অন্য দুই কায়স্থের। এদের অধীনে ছিল একটি 'সদর মিরাস ইজারা' যা-কিনা স্বত্বলতিকার সর্বনিম্ন স্তর — অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে। মধ্যবর্তী স্বত্বের পরবর্তী দুটি স্তর / পর্যায়-এ লাভ এতই সামান্য যে এ-দুটির কোনো রকম অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। আপাতদৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যহীন জমিস্বত্ব মনে হলেও সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যায় এই ধরনের মধ্যবর্তী-স্বত্বের দৌলতে জমিদাররা কর্ষদারদের সম্পূর্ণত নিজেদের কবজা করে রাখতেন। এ-কারণেই মনে হয় অশ্বিনীকুমার নিজেই দত্ত পদবি নয় এমন দুজন কায়স্থ ও অন্যজন স্বগোত্র দত্ত নয় এই তিনজনের 'নিম-আসত তালুক'-এর অধীনে 'সদর মিরাস ইজারা' তৈরি করে থাকবেন।

চিত্র ঃ ২.১ হরহর মৌজার জমি মালিকানার স্বরূপ (৩৬)

<Abbreviations> T. = Taluk, Br. = Brahmattar, Kh. Br = Kharja Brahmattar
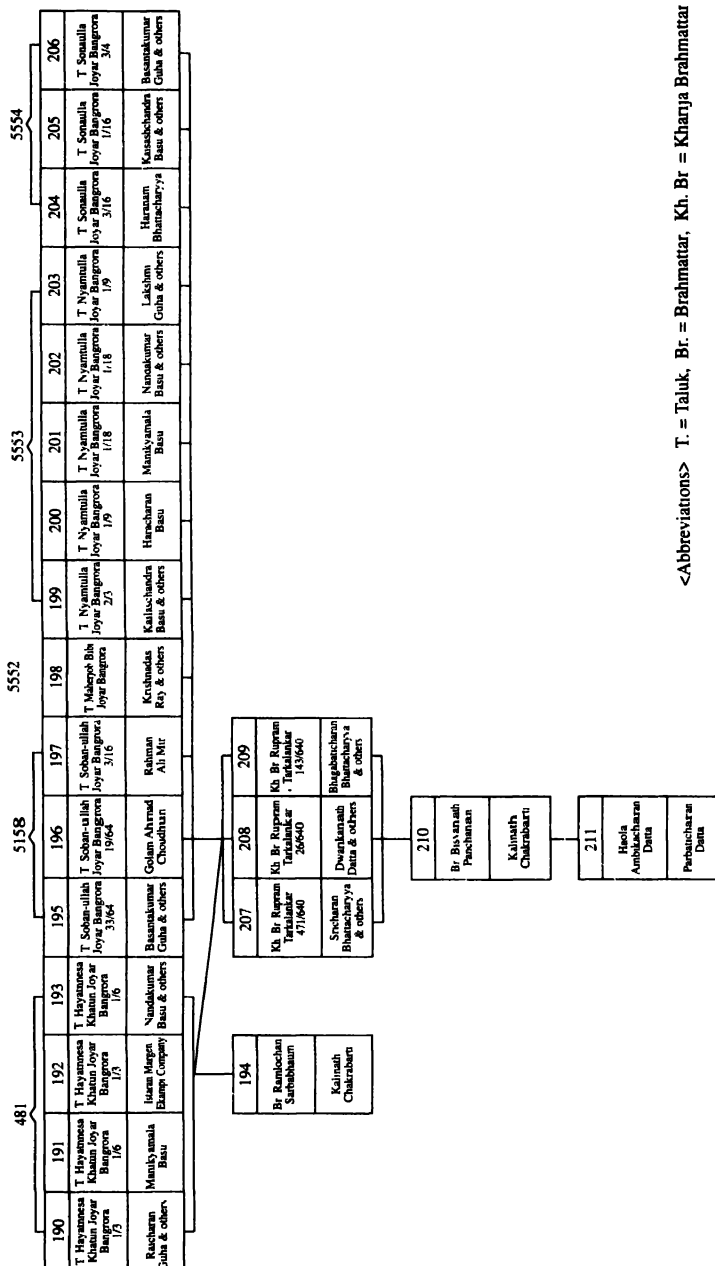
চিত্র ঃ ২.২ হরহর মৌজার জমির মালিকানা (১৮)
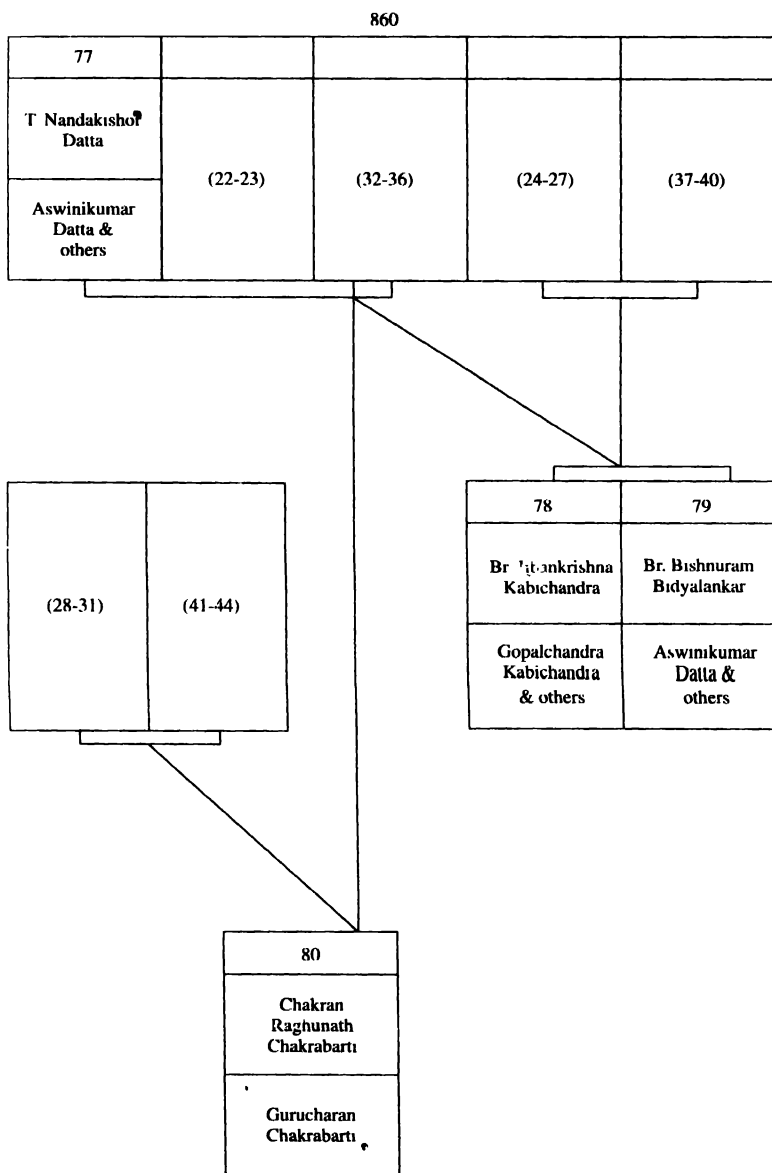
<Abbreviations> T = Taluk, Br. = Brahmattar

চিত্র ঃ ২.৩ হরহর মৌজার জমি মালিকানার স্বরূপ এবং দেয় খাজনার খতিয়ান
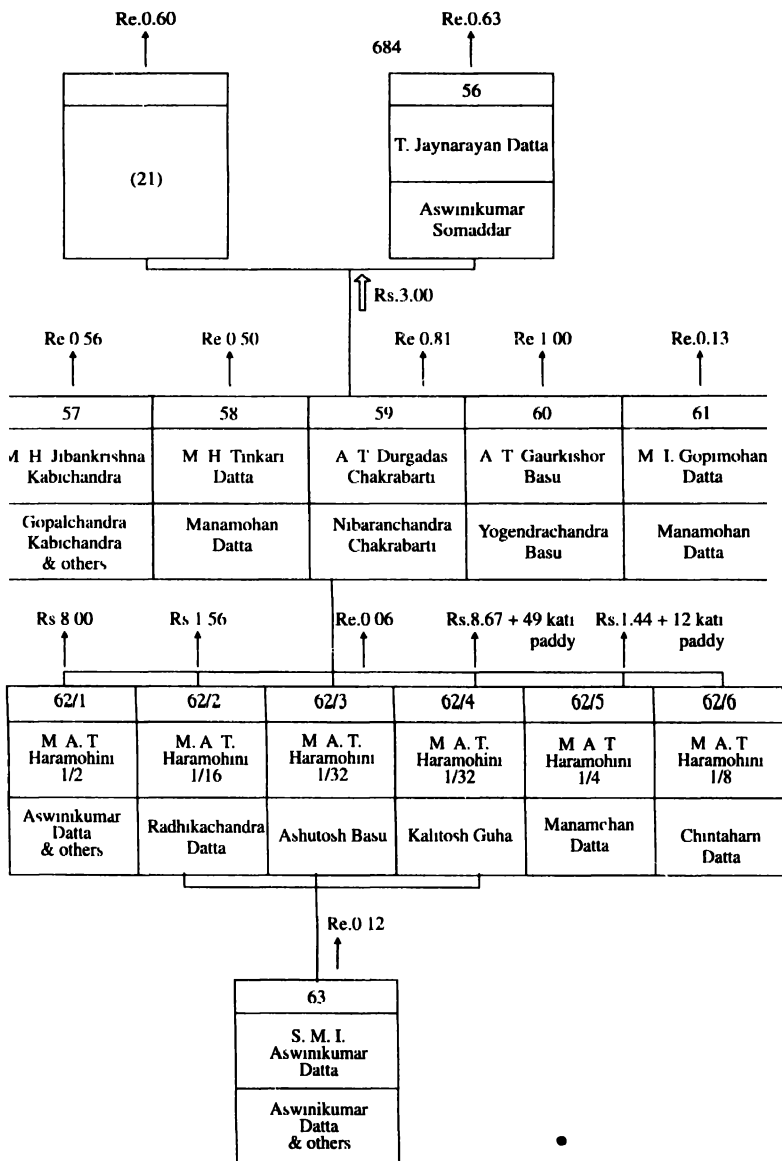
<Abbreviations> T. = Taluk M.H. = Miras Haola M.A T = Miras Asat Taluk
A T = Asat Taluk M.I. = Miras Ijara S M I = Sadar Miras Ijara

সারণী ঃ ২.৮ হরহর-এ মধ্যস্বত্বভোগী খাজনা প্রদায়ী
(কিশতওয়ারি জরিপের ভিত্তিতে)

তৌজি নম্বর (১)	খত নম্বর (২)	ভোগদখলির নাম (৩)	স্বত্বাধিকারী (৪)	জমির মাপ (একরে) (৫)	ভোগদখলির দেয় খাজনা টাকা.আ.পা. (৬)	ভোগদখলিকে দেয় খাজনা টাকা.আ.পা. (৭)
৪৯৬	২	হাওলা হরনাথ দত্ত	(প.বা.) দ্বারিকানাথ ও তাঁর তিনভাই	৩.৬৯	০-৮-০	৬-৬-৬
	৩	নিমনাস্তো তালুক রামকানাই দত্ত	ঐ	১.৩১	০-১-৪	০-৪-০
৫১০	১২	মিরাস ইজারা দুখিচরণ দত্ত	(দ.বা.) দুখিচরণ ও বীরেশ্বর দত্ত		০-৮-০	০-৪-৩
৫৭৩	২০	জোত রূপচন্দ্র দত্ত	ঘেয়াঘাটের দত্ত পরিবার	০.৫৭		৮ কাঠি ধান*
৬০১	২৮	স.মি.ই. অশ্বিনীকুমার দত্ত	(নৃ.বা) অশ্বিনীকুমার ও তাঁর তিন ভাইপো	০.৩০	৪২.০০	০-৮-৩
	২৯	- ঐ -	ঐ	২.১৭	০.০৪	৪-১৩-৬
	৩০	- ঐ -	ঐ	০.৩০	১.৬০	০-৮-০
	৩১	স.মি.ই. কাশীনাথ দত্ত	(প.বা.) দ্বারিকানাথ ও তাঁর তিন ভাই	০.২৪	৩৬-৬.৮	০-১৩-৯
	৩১-এ	ঐ		০.০৩	১২.২.২	০-৪-৮
৬০২	৪১	স.মি.ই. অশ্বিনীকুমার দত্ত	(নৃ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও তাঁর তিন ভাইপো		০-৪-০	০-২-৬
	৪২	ঐ	- ঐ -		৬.৫.০	০-৮-৮
	৪৩	ঐ	- ঐ -		০.৩-১০	০-৮-৭
	৪৪	স.মি.ই কাশিনাথ দত্ত	(প.ব.) দ্বারিকানাথ ও তাঁর তিন ভাই		৬-১২.০	০-১-৫
	৪৪-এ	ঐ	চাঁদিসির গুহ পরিবার		২.৪.০	০-০-৬
৬৪৯	৫০	আ.তা. শ্যামাচরণ দত্ত	(দ.বা.) শ্যামাচরণ ও ব্রজবাসী দত্ত		১.৮০	০-০-০
	৫১	হাওলা চন্দ্রমণি	চাঁদসির বসু-মজুমদাররা		০.০.৬	০-০-৭(+)**
	৫২	ঐ	(দ.বা.) শ্যামাচরণ দত্ত ও অন্যান্য		০.০৬	০-০-৭(+)
	৫৩	ঐ	(দ.বা.) মহানবাসী ও ব্রজবাসী দত্ত		০.০৬	০-০.৭(+)

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	৫৪	ঐ	(দ.ব.) দুর্গাচরণ ও বিশ্বেশ্বর দত্ত		০.০.৬	০-০.৭(+)
	৫৫	আ.তা দুর্গাচরণ দত্ত ও অন্যান্য	(দ.ব.) - ঐ -		০.০.৬	০-০-০
৬৮৪	৫৭	মি.হা. জীবনকৃষ্ণ কবিচন্দ্র	বাটাজোর-এর কবিচন্দ্ররা			৮-০-০
	৫৮	মি.হা তিলকচন্দ্র দত্ত	(নূ.বা.) মনোমোহন দত্ত			১-৯-০
	৫৯	আ.তা. দুর্গাদাশ চক্রবর্তী	নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী ও অন্যান্য			০-১-০
	৬০	আ. তা. গৌরকিশোর বসু	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুপ ও অন্যান্য			৮-১০-৪
	৬১	মি. হা. গোপীমোহন দত্ত	(নূ.বা.) মনোমোহন দত্ত			১২ কাঠি ধান*
	৬২/১	নি. আ. তা. হারামোহিনী	(নূ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য			০-১৩-৯
	৬২/২	নি.আ.তা. - ঐ -	(নূ.বা.) রসিকচন্দ্র দত্ত			০-০-১
	৬২/৩	- ঐ -	চাঁদনিসর আশুতোষ বসু			০-০-১১
	৬২/৪	- ঐ -	জাঁদসির কালীতোষ বসু			০-০-১১
	৬২/৫	- ঐ -	(নূ.বা) মনোমোহন দত্ত			০-৮-০
	৬২/৬	- ঐ -	(নূ.বা.) চিন্তাহরণ দত্ত			
	৬৩	স.মি.ই অশ্বিনীকুমার দত্ত	(নূ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও তাঁর তিন ভাইপো		০.১.১১	০-৫-০
৭০৮	৬৭	মি.ক বীরেশ্বর দত্ত	(দ.বা.) বীরেশ্বর দত্ত		২	১০-০-০
৭২৭	৭০	আ.তা. গোবিন্দ্রচন্দ্র দত্ত	মাহিলাবার দাসেরা		২৫কাঠি ধান* ও বর্গা	
৮৭৭	৮৩		মথুরানাথ দত্ত		২	
	৮৪		(প.বা.) পার্বতীচরণ দত্ত		২	১৬-২-৬
৮৮১	৮৮		(প.বা.) - ঐ -		২	০-১৩-৯
৮৮৪	৯৫	আ.তা. রজনীনাথ গুহ	হরহর ভার রজনীনাথ গুহ	২.৫৭		২-১৩-৬
১০৭৯	১০৩	আ.তা. শশিকুমার গুহ ও অন্যান্য	শশিকুমার ও বসন্তকুমার গুহ (হরহর)	০.১৩		(+)**
১১১৪	১১৫	স.মি.ই পূর্ণচন্দ্র সেন	মাহিলারার সেন-তারা	০.২০	০-৫-৩	(+)**
১১২৩	১১৭	আ.তা.হরনাথ দত্ত	(প.ব.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই		০-০-৯	৪-২-০

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১১১৪	১১৫	স.মি.ই পূর্ণচন্দ্র সেন	মাহিলারার সেন-তারা	০.২০	০-৫-৩	(+)**
১১২৩	১১৭	আ.তা.হরনাথ দত্ত	(প.ব.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই		০-০-৯	৪-২-০
১১৩১	১১৯	আ.তা. প্রসন্নময়ী	(নূ.বা) অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য	০.৮৬		২-১০-৩
১১৯৮	১২৩	হাওলা প্যারীমোহন ভট্টাচার্য	বাণেশ্বর ভট্টাচার্য	০.৯৯		(+)
	১২৪	- ঐ -	বীরেশ্বর ভট্টাচার্য	০.৬৯		(+)
	১২৫	আ.তা. দ্বারিকানাথ দত্ত ও অন্যান্য .	(প.ব.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই	০.০২		০-২-০
১২১১	১৩০	আ.তা. স্বরূপচন্দ্র শীল	(নূ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও তিন ভাইপো	১.৯৬		৭-০-০
	১৩১	আ.তা. রাধানাথ শীল	(নূ.বা) - ঐ -			
	১৩২	আ.তা. বঙ্গচন্দ্র দত্ত	(প.বা.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই			
	১৩৩	আ.তা. - ঐ -	রজনীনাথ গুহ (হরহর)			০-১-০
	১৩৪	আ.তা. হরনাথ দত্ত	(প.ব.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই	০.৪৫		১-১৪-৩
	১৩৫	আ.তা. রামকমল গুহ	শশিকুমার ও বসন্তকুমার গুহ (হরহর)	০.৪৫		০-১৪-৩
	১৩৬	আ.তা. গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস	মাহিলারা-ব দাস-রা		০-৬-০	১৯কাঠি ধান*
	১৩৭	তা.তা. হরনাথ দত্ত			০-৪-০	০-১২-০
	১৪১	হাওলা রামকানাই দত্ত	(দ.বা.) দুর্গাচরণও বিশ্বেশ্বর দত্ত	০.০৪		(+)
১২২৮	১৪৪	আ.তা. পার্বতী নাথ দত্ত	(প.বা.) রামতারা দত্ত	০.৫৮	০-৬-০	০-১৩-৬
	১৪৫	আ.তা. - ঐ -	(?) কৃষ্ণনাথ দত্ত; (প.ব?) সতীশচন্দ্র দত্ত		০-১-০	
	১৪৬	- ঐ -	(প.বা.) দ্বারিকানাথ ও তিন ভাই	০.৫৩	০-৮-০	১-৭-৯
	১৪৭	হাওলা মদ্দামনি	(প.ব.) রামতারা দত্ত	০.০৯		(+)
	১৪৯	জোত শশিকুমার গুহ	শশিকুমার গুহ (হরহর)			৩-০-০
১২৮৩	১৫৩	স.মি.ই রসিকনাথ দত্ত	.(প.বা.) দ্বারিকানাথ ও তিনভাই			০-২-৩
১৩২৪	১৬৬	- ঐ -	(নূ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও তিন ভাইপো	০.০২	০-৮-০	০-০-৭
	১৬৭	- ঐ -	ঐ	০.০২	০-৩-৯	০-০-৭

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	১৬৮	স.মি.ই শসিনাথ দত্ত	(প.বা.) দ্বারিকনাথ ও তিনভাই	০.০৫	০-৮-০	০-১-১
	১৬৯	স.মি.ই অশ্বিনীকুমার দত্ত	(নূ.বা) অশ্বিনীকুমার ও তিন ভাইপো	০.০৬	০-০-৩	০-১-১
	১৭০	মি.হা. গৌরীকিশোর বসু	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও অন্যান্য		০-৬-০	৩-০-০
১৩৭৬	১৮৫	মি.হা স্বরূপচন্দ্র শীল	কৃষ্ণনারায়ণ ঘোষ	০.৪১	০-৫-৭	২-০-০
	১৮৬	মি.হা. - ঐ -	(নূ.বা.) অশ্বিনীকুমার ও তিন ভাইপো		০.১০.০	৪-০-০
৫৫৫২ ও	২১১	হাওলা অম্বিকাচরণ দত্ত	(প.বা.) পার্বতীচরণ দত্ত			
আরও ৪টি তালুক						

* কাঠি = ধানের মাপ বিশেষ; ৩২সের = ১সের = ১ কাঠি। তুলনীয়, ধানমাপার পাত্র 'কাঠা' = ১ পাঁচ বা দশ সের পরিমাণ চাল মাপার বেতের পাত্র।

* (+) = একেবারে নিজস্ব প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের জমি।

সংকেত সূচি ঃ প.বা = পশ্চিমবঙ্গ বাড়ি; দ.বা. = দক্ষিণের বাড়ি; নূ.বা = নূতন বাড়ি; স.মি.ই = সদর মিরাস ইজারা; আ.তা. = আসৎ তালুক; মি.হা. = মিরাস হাওলা; নি.আ. তা = নিম আসৎ তালুক; মি.ক = মিরাস কর্ষ;

এই নতুন মধ্যবর্তী-স্বত্ব তৈরি করে 'আসত তালুক' দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর অধীনে সমস্ত কর্ষদার দত্ত পরিবারে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে। কোনো পরিস্থিতিতে এই মধ্যবর্তী-স্বত্বের কোনো অংশ হাতছাড়া হয়ে গেলে দত্তরা নতুন মালিকানা স্বত্ব তৈরি করে লভ্যাংশ তুলে নেওয়ার চেষ্টা করত। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা কখনও কখনও নিজেরাই অন্যান্য তরফের উপর প্রভাব খাটাতো।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অন্য একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। তৌজি ৭০৮-এর কালিকাপ্রসাদ দত্তের তালুক ছিল 'পুরানো বাড়ি'-র অন্তর্গত। কালিকাপ্রসাদের ছেলে রামপ্রসাদ অপুত্রক হওয়ার দরুন তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। রামপ্রসাদের কন্যা সন্তান। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমা ভাঙা থানার অন্তর্গত আবদুল্লাবাদের চৌধুরী পরিবারে রামপ্রসাদের মেয়ের বিয়ে হয়। বৈবাহিক সূত্রে রামপ্রসাদের তালুকের উত্তরাধিকার পায় চৌধুরী পরিবার। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময় কালিকাপ্রসাদের তালুক অধীন ছিল নিষ্কর 'মহাপ্রাণ' জমি, যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন দ্বারিকানাথ দত্ত ও তাঁর তিন ভাই। সাধারণভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দেবোত্তর করা এই 'মহাপ্রাণ' কীর্তিচন্দ্র বসু ছিলেন 'পশ্চিমের বাড়ি'র চার ভাইয়ের অধীনে। লক্ষ্য করার, এই 'মহাপ্রাণ' জমিতে 'মিরাস কর্ষ'-এর এক তরফ ছিল 'দক্ষিণের বাড়ি'র বীরেশ্বর দত্তের অধিকারে। কর্ষদার থেকে বীরেশ্বর আদায় করতেন ১০ টাকা যার তিন টাকা দিতেন জমিদারকে, লাভ হিসাবে নিজের হাতে থাকত ৭ টাকা। বলা বাহুল্য, 'মহাপ্রাণ' বাবদে আয় ছিল ৩ টাকার কম। কোনোভাবেই এখন আর দত্তদের দখলিস্বত্ব নয় এমন তালুকে রায়তি স্বত্বের জন্য পশ্চিমের ও দক্ষিণের বাড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। ফলস্বরূপ এক ধরনের সমঝোতা/বোঝাপড়া স্থির হয়, স্বত্বাধি-কারীর বড় তরফ মুনাফা কম নিত।

এ-রকমই আরও একটি বিশেষ রীতির স্বত্ব বদলের উল্লেখ করব। এ-ক্ষেত্রে বৈবাহিক সূত্রে স্বত্ব বদল হয়। যৌতুকের বিনিময়ে কুলীন পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করা আমাদের এই 'অকুলীন' দত্ত পরিবারের দীর্ঘদিনের রীতি। চাঁদসীর বসু পরিবারের তিন ভাইয়ের অধীনে ছিল গঙ্গানারায়ণ দত্তের সম্পূর্ণ তালুক[২৪] (খেওয়াত নম্বর ২৪-২৫)। তালুক গঙ্গানারায়ণের (তৌজি ৬০১) সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ আনা ৩ গণ্ডা ২ ক্রান্তি অর্থাৎ ৭.৪ শতাংশ প্রায়। এই অংশ চাঁদসীর বসু পরিবারের তিন ভাই তাঁদের পিতা গোবিন্দচন্দ্র বসুর থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করে। 'নূতন বাড়ি'-র রামকুমার দত্তের মেয়ে স্বর্ণময়ীর সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের বিয়ে হয়। নিশ্চিন্তেই বলা যায় 'নূতন বাড়ি'র তালুক থেকে এই অংশ যৌতুক হিসাবে দান করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে 'নূতন বাড়ি' বসুদের অংশের ইজারাদারের অধীনে 'সদর মিরাস ইজারা' অশ্বিনীকুমার দত্তকে হাজির করে। খাজনা হিসাবে তাদের দিতে হতো খেওয়াত ২৮-এর জন্য ৪২ টাকা, খেওয়াত ৩০-এর জন্য ১ টাকা ৫ আনা; বদলে তারা খুব কম খাজনা হিসাবে ৮ আনা ৩ পাই ও ৮ খানা পেত। এমন একটি স্বত্ব তৈরি করা তাঁদের পক্ষে ক্ষতিই হয়েছিল। কিন্তু এমন ভুল কেন করল? সম্ভবত, এই কথা মনে রাখা হয়েছিল যে, সাধারণ দান হিসাবে তালুকের এক ভাগ দেওয়ার উপরে যৌতুকের উদ্দেশ্যে তৈরি লাভজনক স্বত্ব সংযোগ করলে আরও সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। সম্ভাব্য আরও একটি কারণ হতে পারে আর্থিক

নক্সা ঃ ২.১ ৬০১ এবং ৬০২ নম্বর তালুকের ভাগ
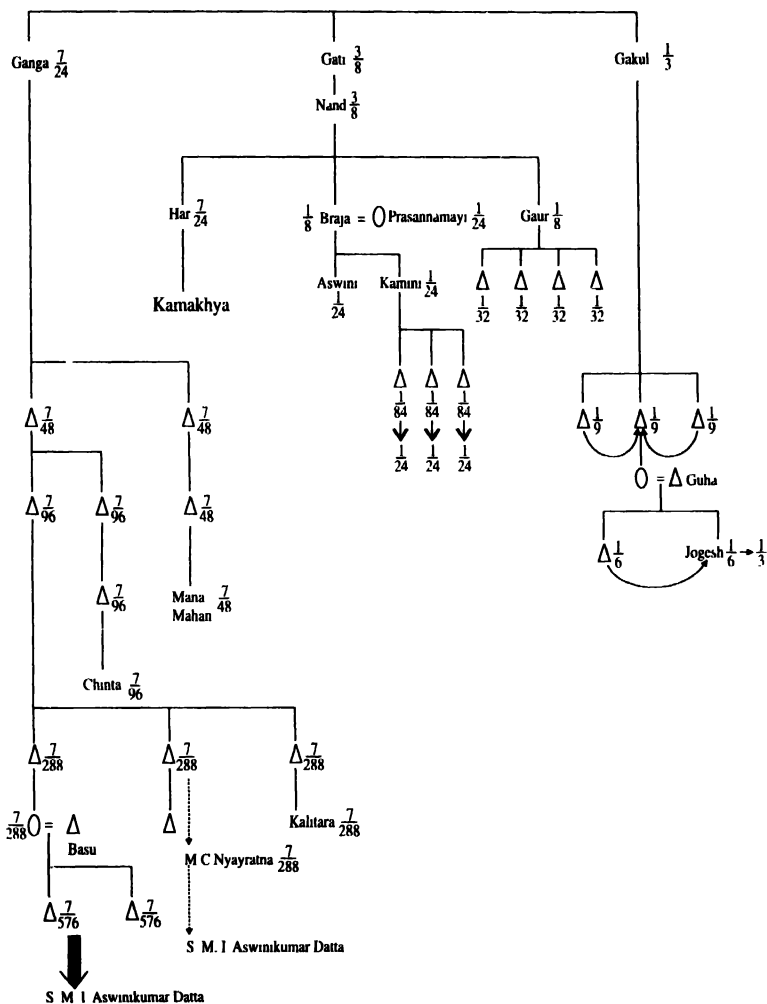
নক্সা ঃ ২.২ ৬৮০ তালুকের ভাগ (নন্দ কিশোর দত্ত)
Nanda Kisor Datta
(1/3)
(1/3)
= Prasannamayi 1/9
(1/3)
Kamakhya 1/3
Aswini 1/9
(1/9) Kamini
Rajani 1/9
Nalini 1/9
Ruhini 1/9
Mohini
Sukumar 1/27
Sushil 1/27
Saral 1/27
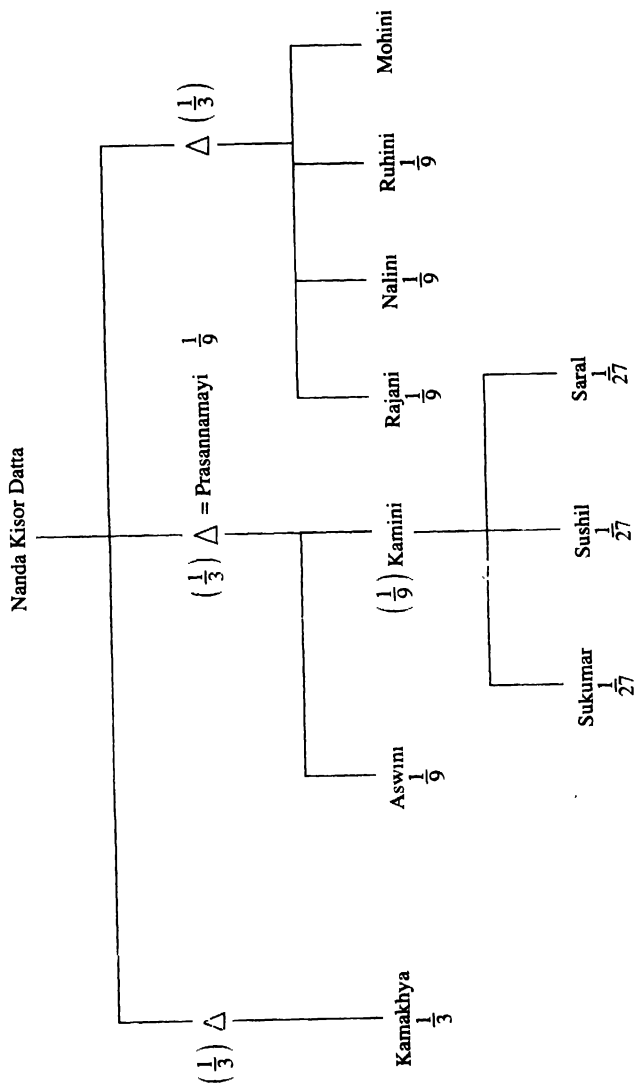
লোকসান সত্ত্বেও তালুকের দান করা অংশে নতুন মধ্যবর্তীস্বত্ব প্রকৃতপক্ষে অন্যের রায়তদের ওপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখা। খুব সম্ভব এই দুই প্রক্রিয়া একইসঙ্গে বা ধারাবাহিক-ভাবেই গ্রহণ করা হয়। কেন তাঁরা এই ধরনের অলাভজনক পদক্ষেপ নিয়েছিল তার একটি কারণ ব্যবসায়িক হিসাবে প্রভূত আয়ের অন্য এক সূত্র হতে পারে। তালুকের কোনো অংশের বৈবাহিক সূত্রে মালিকানা বদলের ধারা প্রকৃতপক্ষে বংশানুক্রমিক স্বত্বের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ক্রম খণ্ডিত হয়ে যাওয়াই ত্বরান্বিত করছিল। এই ঘটনা জমিদারদের অবশ্যই

সারণি ঃ ২.৯ ৪৮৬ নম্বর প্লটে অধিকারের / স্বত্বের অংশ

অংশীদারদের নাম	মোট এলাকা	খত অনুযায়ী ভাগ	খত নম্বর	অধিকার জড়িত
মনোমোহন দত্ত	০.৮৩	০.৬৬	২২	তা. ৬০১
		০.১৭	৩৫	তা. ৬০২
চিন্তাহরণ দত্ত	০.৩৯	০.৩২	২৩	তা. ৬০১
		০.০৭	৩৬	তা. ৬০২
অশ্বিনীকুমার দত্ত	০.৩০৭	০.০৭	২৯	স.মি.ই. / তা. ৬০১
		০.০৪৭	৩২	তা. ৬০২
		০.০৩৫	৪২	স.মি.ই. / তা. ৬০২
		০.০৩৫	৪৩	ঐ
		০.১২	৭৭	তা. ৮৬০
সুকুমার দত্ত	০.৩০৭	০.০৭	২৯	স.মি.ই. / তা. ৬০১
সুশীলকুমার দত্ত		০.০৪৭	৩২	তা. ৬০২
সরল কুমার দত্ত		০.০৩৫	৪২	স.মি.ই. / তা. ৬০১
		০.০৩৫	৪৩	ঐ
		০.১২	৭৭	তা. ৮৬০
প্রসন্নময়ী	০.১৬৭	০.০৪৭	৩২	তা. ৬০২
		০.১২	৭৭	তা. ৮৬০
কামাখ্যাকুমার দত্ত	০.৫০	০.১৪	৩২	তা. ৬০২
		০.৩৬	৭৭	তা. ৮৬০
রজনীকুমার দত্ত	০.৫০	০.১৪	৩২	তা. ৬০২
নলিনীকুমার দত্ত		০.৩৫	৭৭	তা. ৮৬০
রোহিনীকুমার দত্ত				
মোহিনী কুমার দত্ত				
যোগেশচন্দ্র গুহ	০.৩৫		৩৩	তা. ৬০২
কালীতলা দত্ত	০.১৩	০.১০	২৭	তা. ৬০১
		০.০৩	৪০	তা. ৬০২

সংকেত সূত্র ঃ তা.= তালুক ; স.মি.ই. = সদর মিরাস উজারা।

সচেতন করে থাকবে। সারণি ঃ ২.৯-এ প্লট নম্বর ৪৮৬-তে 'নূতন বাড়ি' বসত অঞ্চলের অংশের ভাগ দেখানো হয়েছে। ৬০১, ৬০২ ও ৮৬০ — এই তিনটি তালুকের মোট জমি ৩.৪৮ একর; তালুকগুলি 'নূতন বাড়ি'র সৃষ্ট। অশ্বিনীকুমারের প্রপিতামহের দুই ভাই গঙ্গানারায়ণ দত্ত (৬০১) ও গোকুলনারায়ণ দত্ত (৬০২) তালুক দুটির প্রতিষ্ঠাতা। অশ্বিনীকুমারের পিতামহের দিক থেকে তালুক নন্দকিশোর দত্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। নক্সা ঃ ২.১ ও ২.২-এ এই তিনটি তালুক বিভাজনের যে ছকটি দেওয়া হয়েছে তার থেকে

সমস্যা বোঝা যায় ৬০১ নম্বর তালুকটি প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গানারায়ণ দত্তের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীর হাতে যায়; ৬০২ তালুকটি গোকুলনারায়ণের নামে হলেও আসলে তাঁর পিতা রমাকান্তর সম্পত্তি। সমানাধিকারে ভাগ না হলেও তালুকটি গোকুলনারায়ণের তিন ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। তালুকের তিনভাগের একভাগ কনিষ্ঠ পুত্র গোকুলের, ৭/২৪ অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গনারায়ণের, সর্বাধিক ৩/৮ অংশ মধ্যম পুত্র গতিনারায়ণের। তাঁদের পরে, তিন ভাইয়ের অংশই পরবর্তী বংশধরেরা পায়। তালুকটির ভাগাভাগির কারণে 'নূতন বাড়ি'র আবাসিক এলাকার বেশ ক্ষতি হয়। যেমন আবাসিক অঞ্চলের কিছু অংশ অন্যের হাতে চলে যায়। তালুক ৬০১-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে — তালুক অন্তর্গত ১/৬ অংশ জমি অন্যরা অধিকার করে। সঠিকভাবে বলতে গেলে চাঁদসীর বসু পরিবারের দুই ভাইয়ের স্বত্বে ১/২৪ অংশ, ১/১২ অংশ চলে যায় মহিমচন্দ্র ন্যায়রত্নকে বিক্রির মাধ্যমে। তালুক ৬০২-এ চাঁদসীর কালীতোষ বসু এবং মহিমচন্দ্র ন্যায়রত্ন দুজনেই ৭/২৮৮ করে অংশ পায়। এছাড়া, এই তালুকের অন্যতম অংশীদার যোগেশচন্দ্র গুহর অধিকারে ছিল ১/৩ অংশ। অস্বস্তিকর হলেও অন্যের জমিতে 'নূতন বাড়ি'র লোকজন বসবাস করতে বাধ্য হয়। এইসব অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াবার জন্য 'নূতন বাড়ি'র নেতা হিসাবে অশ্বিনীকুমার 'সদর মিরাস ইজারা' পত্তন করেন। যেমন হয়েছিল যোগেশ গুহর অংশে — শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জমির এক অংশ অন্যের হাতে থেকেই গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ৩.৪৮ একরের মধ্যে যোগেশ গুহর স্বত্বে ছিল মাত্র ০.৩৫ একর। এভাবেই নতুন মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয় যা আদতে জমিদারদেরই আত্মরক্ষার ঢাল ছাড়া কিছু নয়।

মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি ঃ নতুন গঠিত তালুকগুলির মতো নয়, প্রতিষ্ঠিত পুরানো জমিদাররা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ জমিদারি স্বত্বের অংশীদার হিসাবে অনুপ্রবেশ রোধ করতে, স্বত্ব বদলের সম্ভাব্যতা থেকে বিবাহ বা আর্থিক সংকটে তালুকের অংশ বিক্রি ইত্যাদি অপরিহার্য ঘটনাবলি থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যেই মধ্যস্বত্ব-এর সৃষ্টি করেছিলেন।

৪. জমিদারবর্গ ঃ অন্যান্য কয়েকটি সমস্যা

'জমিদার' অর্থে আমরা জমির মালিক ও মধ্যস্বত্বভোগী দুই-ই বুঝব। এ-যাবৎ আলোচনায় স্পষ্টত বোঝা গেছে, এই দুই পক্ষ আসলে এক ও সমগোষ্ঠীভুক্ত। তালুকের অধিকারী ও জমির খাজনা দেওয়া হকিয়তদার ছাড়াও জমির সঙ্গে আরও দুই ধরনের সম্পর্ক ছিল জমিদারদের। এই ধরন দুটির প্রথমটি 'আপন দখলিয়া জমি' বা প্রত্যক্ষ মালিকানা, অন্যটি নিষ্কর স্বত্বাধিকারী।

হরহর-এ ৩৫.৩ একর জমি ছিল জমিদারদের প্রত্যক্ষ মালিকানায়। এই মোট জমি দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ ২৯.৫৭ একর জমিদারদের খাসজমি এবং মধ্যস্বত্ব অধিকারে ৪.৯৯ একর। এরমধ্যে আবাদি জমি, সম্ভাব্য মাপে যা পাওয়া যায়, যথাক্রমে ৪.৯৯ একর বা ১৬.৯ শতাংশ ও ১.৮৯ একর বা ৩৩ শতাংশ। এই পরিমাণ অবশ্যই বিশেষ বড় নয়। বোঝা যায়, হরহর-এ জমিদারের 'আপন দখলিয়া জমি'-তে কৃষিজ উৎপাদন বিশেষ কিছু ছিল না। জমিদারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবেশী গ্রামগুলির কৃষিজমি সাধারণভাবে ৩০ শতাংশের সামান্য বেশি।

নল জমি অর্থাৎ ধান খেত বাদে হরহর-এ মাত্র ৩.১ একর কৃষিজমি। এই সামান্য জমির ইতস্তত আবাসিক এলাকা, বাগান, পুকুরপাড়। এই জমিগুলির কৃষিজ গুরুত্ব ভিটাজমির (বা যে জমিতে ধান উৎপন্ন হয় না অঞ্চল/এলাকা) সমতুল্য। সারণি ঃ ২.১০-এ যেমন দেখানো হয়েছে যে এই গ্রামে জমিদারদের 'আপন দখলিয়া জমি' তাদের নিত্যকার কাজকর্মের অন্তর্গত অঞ্চল। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের বসতবাড়ির অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ বড় পুকুর বা দিঘি। বনেদি জমিদারদের সামাজিক মর্যাদার অন্যতম চিহ্ন হল দিঘি। সিংহদরজা পেরিয়ে জমিদারদের দুই বা তিনতলা চকমিলানো পাকা দালান, কাছারিবাড়ি ও পারিবারিক মন্দির বা দেবমণ্ডপ — বসতবাড়ির চারপাশ বাগান ও জঙ্গলে ঘেরা।

সারণি ঃ ২.১০ স্বত্বাধিকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে / অধীনে জমি

জমির বৈশিষ্ট্য	আয়তন (একরে)	শতাংশ	মন্তব্য
বাস্তুজমি	১৯.০৮	৪৫.৮	পরিত্যক্ত বাসস্থান সহ
পুকুর	৯.৭৬	২৩.৪	
নলজমি	১.২৮	৩.১	
মাছের বাজার	০.০৬		
কালীবাড়ি	০.১১		
জয়দুর্গা খানা	০.১৪	১.১	
ডাক্তারখানা	০.১৫		
কাছারি	০.০১		
অন্যান্য	১০.৪৫	২৫.১	বাগান, পরিত্যক্ত ভিটা,
পুকুরধার,			চলার পথ
শনাক্ত করা যায়নি এমন	০.৬৩	১.৫	
মোট	৪১.৬৭	১০০.০	

আকৃতিতে ছোট হলেও পূজাপার্বণের জন্য কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি (জয় দুর্গাখানা) এবং জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র অর্থাৎ ডাক্তারখানা জমিদাররা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতেন। উল্লেখ করার মতো ছিল মাছের বাজার যার অর্ধেক অংশ 'পশ্চিম বাড়ি'-র দখলে, বাকি অর্ধেক 'নূতন বাড়ি'-র অংশ। বাটাজোর বাজার ছিল পোস্টঅফিসকে বিভাজন রেখা মেনে নিয়ে, দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরের অর্ধেক ছিল 'পূবের বাড়ি' বা 'নূতন বাড়ি'-র অংশে, 'পশ্চিমের' বা 'উত্তরের বাড়ি'-র অংশে দক্ষিণের অর্ধেক। গ্রামের জনৈক প্রবীণের বিবরণের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। অঞ্চলের কর্তৃত্বের চিহ্ন হিসাবে বাজারের মালিকানা স্বত্ব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূসম্পত্তির পরিমাণ একবার আলোচনা করে দেখব। সারণি ঃ ২.১১ অনুযায়ী গ্রামে ১১ টি ব্রহ্মোত্তর, ১টি দেবোত্তর ও ১টি চাকরান জমিস্বত্ব ব্রাহ্মণদের দান করা হয়। এই নিষ্কর জমির পরিমাণ ১১.৪৭ একর। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে কয়েকটি ব্রহ্মোত্তর জমির অংশ জমিদাররা ফেরত নিয়ে নেয়। যেমন তালুক ৬০১,৬০২ ও ৮৬০-এর অর্ধেক অংশ ব্রহ্মোত্তর হিসাবে কৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কারকে দান করা হয়; তালুকগুলি ছিল 'নূতন বাড়ি'-র অংশ। দেখা যায়, এই ব্রহ্মোত্তর অংশ শেষাবধি 'নূতন বাড়ি'র পরিবারভুক্ত পাঁচজন লোকের হাতে ফিরে আসে। কখনো কখনো আবার ব্রহ্মোত্তর অংশ ফেরত নেওয়ার বদলে জমিদাররা ব্রহ্মোত্তর-এর অধীনেই মধ্যস্বত্ব তৈরি করতেন। যেমন হয়েছিল 'পশ্চিমের বাড়ি'র অম্বিকাচরণ দত্তের অধীনে ব্রহ্মোত্তর বিশ্বনাথ

পঞ্চাননের স্বত্ব। অম্বিকাচরণের এক হাওলা বাড়ি ছিল। এই হাওলার অধীনে জনৈক ঈশ্বরচন্দ্র পালের 'কর্ষ' অধিকার ছিল, খাজনা হিসাবে সে 'ধান্যকরারি' অর্থাৎ নির্দিষ্ট উৎপন্ন-খাজনা দিত। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ব্রাহ্মণের নামে এই নিষ্কর ভূমিস্বত্ব

সারণী ঃ ২.১১ ব্রহ্মোত্তর ও সমরূপ স্বত্ব, হরহর গ্রাম (কিশ্‌তওয়ারি জরিপ)

খত নম্বর (১)	স্বত্বভোগী (২)	স্বত্বাধিকারী (৩)	অংশ (৪)	তালুক বিজড়িত (৫)	আয়তন (একরে) (৬)
৭৮	ব্রহ্মোত্তর জীবনকৃষ্ণ কবিচন্দ্র	কবিচন্দ্রের পাঁচ সদস্য	১	তা. ৬০১, ৬০২, ৩৬০	০.২২
৭৯	ঐ কৃষ্ণরাম বিদ্যালংকার	নূতন বাড়ির পাঁচ সদস্য	১/২	ঐ	০.৩৫
		তারাচন্দ্র ভট্টাচার্য	১/২		
৮০	চাকরাণ রঘুনাথ চক্রবর্তী	চক্রবর্তীদের পাঁচ সদস্য	১	ঐ	০.৫৯
৯৪	ব্রহ্মোত্তর যোগীরাম বিদ্যাভূষণ	দেওপাড়ার ভট্টাচার্যদের ৮ সদস্য	১	তা. ৮৮৪	০ ৯৪
১৩৮	ব্রহ্মোত্তর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়দের ২ সদস্য	১	তা. ১২১১	০.৭৮
১৩৯	ব্রহ্মোত্তর রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ	পশ্চিমের বাড়ির ৫ সদস্য	৫/৬	ঐ	০.১৭
		আনন্দমোহন ভট্টাচার্য	১/৬		
১৪০	ব্রহ্মোত্তর রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়	দেওপাড়ার পার্বতীচরণ দত্ত	১	ঐ	০.৫০
১৮৭	ব্রহ্মোত্তর রামরত্ন বিদ্যাভূষণ	বাটাজোর এর ভট্টাচার্যদের ২ সদস্য	১	তা. ১৩৭৬	৩.৮৫
১৮৮	ব্রহ্মোত্তর রামগোপাল দাসভোগ	শ্রীচরণ ভট্টাচার্য	১১/২৪	তা. ১৩৭৬	০.৩৪
		চক্রবর্তীদের ২ সদস্য	১৩/২৪		
১৯৪	ব্রহ্মোত্তর রামলোচন সার্বভৌম	মহিমচন্দ্র ন্যায়রত্ন	১/২	তা. ৪৮১	০.০৮
		মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য	১/২		
২০৭	খারিজ ব্রহ্মোত্তর রূপরাম তর্কালংকার	ভট্টাচার্যদের ৭ সদস্য	১৩/৩২০	তা. ৪৮১, ৫১৫৮, ৫৫৫২এফ, ৫৫৫৩এফ, ৫৫৫৪এফ	১.২৫
২০৮	খারিজ ব্রহ্মোত্তর ঐ	পশ্চিমের বাড়ির ৪ সদস্য	১৩/৩২০	ঐ	০.১০
২০৯	ঐ	দেওপাড়া ভট্টাচার্যদের ৯ সদস্য	১৪৩/৬৪০	ঐ	০.৫০
২১০	ব্রহ্মোত্তর বিশ্বনাথ পঞ্চানন	দেওপাড়া কাশীনাথ	১	ঐ	০.৯৫
১৫০	দেবোত্তর লক্ষীনারায়ণ ঠাকুর	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী (বাটাজোর)	১	তা. ৪৯৬, ৫১০, ৫১৭, ৬৪৯, ৮৮৪, ১১২৩, ১২২৮	০.৮৫
					১১.৪৭

দেওয়া আছে তাঁরই বংশধর উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির অধিকারী হতো। নিজের জমিতে প্রতিষ্ঠিত দেবস্থানে জমিদাররা পূজাপার্বণের আয়োজন করতেন যেখানে পূজার্চনা করতেন ব্রাহ্মণরা। অঞ্চলে জমিদারের নিজস্ব প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে ব্রহ্মোত্তর ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ করার যে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর জমির ১৩টি স্বত্বের মধ্যে ৩টির স্বত্বাধিকারীরা হয় বর্গায় নয়ত ধান্যকরারি চুক্তি ব্যবস্থায় চাষীদের থেকে উৎপন্ন খাজনায় জমি দাদন দিয়ে দেয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণরা এমন কাউকে নিষ্কর দিতেন যারা পূজাকৃত্যাদিতে সহকারী রূপে কাজ করতেন, যেমন ব্রহ্মোত্তর যোগীরাম বিদ্যাভূষণের জমিতে নিষ্কর কর্ষদার ছিল জাতে নাপিত।

৫. কর্ষদার

রায়তি-খতিয়ান থেকে আমরা যতখানি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় বিশ শতকের প্রথম দশকে হরহর-এ দু'ধরনের রায়ত ছিল ঃ কর্ষদার ও কোরফা অর্থাৎ রায়তের অধীন। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর পরেও কয়েকঘর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর থাকার কথা; কেননা 'গ্রাম মন্তব্যে' আছে এই গ্রামে দুটি মুসলমান পরিবার আছে, অথচ রায়তি খতিয়ানের কোথাও তার উল্লেখ নেই।

কর্ষদাররা, আক্ষরিক অর্থে চাষা, হয় স্বত্বভোগী রায়ত অথবা নিষ্কর জমির ভোক্তা। সারণি ঃ ২.৫-এ স্বত্বভোগী নয় এমন ছয়জন রায়তের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে পাঁচজন কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন বাণিজ্য কর্ষদার, বাকি একজনের চাষের জমি এতই কম, ০.১০ একর, যে উল্লেখ করার মতো নয়।

নিষ্কর জমির স্বত্বাধিকারীদের প্রথমে দেখা যাক। রায়তি খতিয়ানে স্বত্বাধিকারীদের তরফগুলি দেওয়া আছে হয় 'কর্ষ'- জাগির হিসাবে অথবা 'কর্ষ' চাকরান রূপে। এই দুইয়ের পার্থক্যরেখা আসলে যা-ই থাকুক না কেন আদতে সমশ্রেণীভুক্ত হিসাবে তাঁদের গণ্য করা হতো এবং নির্বিঘ্নেই তারা জমির মালিকের উত্তরাধিকারীকে স্বত্ব বদল করত। সারণি ঃ ২.১২ তে নিষ্কর 'কর্ষ' জমির বিস্তারিত বিবরণ আছে; মানচিত্র ঃ ২.৫-এ জমিগুলির অবস্থান দেখানো হল। ছয়টি জাতের মধ্যে নিষ্কর কর্ষ বণ্টন করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আলোচিত কায়স্থরা বাদে বাকি পাঁচটি বর্ণের লোক জমিদারদের পরিবার-সহ অন্যান্য গ্রামবাসীরাও নির্দিষ্ট ধরনের কাজ করত। এরা জমিদারের বসতবাড়ির হাতার মধ্যেই বাস করত, একমাত্র নাপিতদের ঘর ছিল গ্রামের উত্তর দিকে।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, দত্তদের দুই প্রতিপক্ষ শরিকের বিভাজনরেখা ধরেই নিষ্কর 'কর্ষ' স্বত্বাধিকারীরা বিভক্ত ছিল। যেমন, প্লট ৪৭৩-এর প্রসন্নকুমার ভুঁইমালি ছিলেন 'নূতন বাড়ি'র পক্ষে আর কালীকুমার ভুঁইমালির পরিবার (প্লট ৩৪৫) বাস করতেন 'পশ্চিমের বাড়ি'র আওতায়। কাহার ও ধোপাদের ক্ষেত্রে একই বিভাজন রেখা অনুসরণ করা হয়েছে। 'নূতন বাড়ি'র অধীনস্থ ছিলেন নট্টরা।[২৫] 'পশ্চিমের বাড়ি'-র তালুক অঞ্চলে ছিল নাপিতদের জমি। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। স্বজাতের ক্ষেত্রে আরও দুটি কি

তিনটি নাপিত পরিবার এই গ্রামেই ছিল। এদের মধ্যে দুটি সদ্য আসা পরিবার ছিল। নিষ্কর স্বত্ব চালু হওয়ার পরে এসে বসবাস শুরু করে। 'নূতন বাড়ি'র লোকজন এই নাপিত পরিবার থেকে সহজেই নিত্যকার কাজ নিতে পারত এমনকি পুরানোরা অস্বীকার করলেও। নট্টরা গ্রামে বহু পুরানো, খুব সম্ভব দত্তদের শরিকি দ্বন্দ্বের বহু আগে থেকেই তাঁরা এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। নিষ্কর চাকরান স্বত্বের অধিকারী নট্টরা মুলত সংগীতশিল্পী, অভিনেতা; পৃষ্ঠপোষকের অনুমতি ছাড়াই আমন্ত্রিত নট্টরা সর্বত্র যাতায়াত করতে পারত — যদি সে আমন্ত্রণে স্বজাতের কোনো বাধানিষেধ না থাকে। নট্টদের স্বাধীন চলাফেরায় যদি যে-কোনো জমিদারের কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই হতো দোষের ভাগী। শুধুমাত্র কর্তৃত্বের মাপকাঠিতে জমিদার-প্রজার সব সম্পর্ক বিচার করা যায় না।

গ্রামের মোট এলাকার ৬.১ শতাংশ অর্থাৎ ১৮.৫১ একর জমি নিষ্কর কর্ষজমি। আবাদি জমির পরিমাপ ১৪.৬৮ একর বা ৭৯.১ শতাংশ; জমি নিষ্কর কর্ষদারদের। আবাদি জমির ৪.২৩ একর বা ২২.৮ শতাংশ আবাসিক এলাকা বা বাগান। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবাসিক এলাকায় ভালো চাষ হওয়ার দরুন এই এলাকার আংশিক চাষের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। নিষ্কর কর্ষজমি ছিল কর্ষদারদের নিজস্ব অধিকারে। এছাড়া ০.৩০ একর পরিমাণ ৫২৮ নম্বর প্লটের জমি যা দেওয়া ছিল কাহারদের — অবশ্য এই জমিটি কোল-কর্ষস্বত্বে জনৈক ধোপাকে ঠিকা দেওয়া হয়েছিল।

নিষ্কর জমি স্বত্বাধিকারী জাতগুলির অধিকাংশই কোনো-না-কোনো ভাবে ধর্মীয় আচারকৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বিবাহ ও জন্মের সময়ে অপরিহার্য ছিল নাপিতেরা। বিবাহের মূল আসর বা ছাঁদনাতলা তৈরি করত ভুঁইমালিরা, এছাড়া তাঁরা ছিলেন মশালবাহক।[২৬] ধোপাদের সম্পর্কে কিশ্‌তওয়ারি জরিপের 'মন্তব্যে' হলা হয়েছে (ধোপা/ধুপি) ডঃ ওয়াইস-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করে রিজলে জানিয়েছিলেন ঃ "পূর্ববঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানে ধোপার উপস্থিতি অপরিহার্য। বিয়ের দিন সকালে নিজের 'পাট' থেকে গণ্ডুষ ভরে জল এনে কনে এবং বরকে ছিটিয়ে দেয়; গায়েহলুদের পর ধোপা কনেকে স্পর্শ করবে, প্রমাণিত হল কনে অপাপবিদ্ধা শুদ্ধ।"[২৭] বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নট্টরা সঙ্গীত, অভিনয় প্রদর্শন করত। কাহাররা ছিল পালকি-বেহারা — অতীতে কোনো একসময়ে বিহার প্রদেশ থেকে জমিদাররা তাদের নিয়ে আসে; অনুষ্ঠানে তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না জমিদারদের আভিজাত্য ও পদমর্যাদার সূচক মাত্র।

নাপিতরা বাদে চাকরান স্বত্বাধিকারী অন্যান্যরা জমিদারদের খানাবাড়ি অর্থাৎ আবাসিক অঞ্চলের কাছাকাছি থাকত। জমিদারদের অধীনে গ্রাম-সহ সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা পালন করত চাকরান স্বত্বাধিকারীরা। এর থেকে বোঝা যায় গ্রামসমাজের সকল কাজে জমিদাররা মুখ্য ভূমিকা পালন করতেন। অঞ্চলের উন্নতির স্বার্থে যে-দায়ভার চাকরান স্বত্বাধিকারীরা বহন করতেন তারই সুবাদে ক্ষমতা ও সম্ভ্রমের অন্তত একাংশ তাঁরা অর্জন করতেন। গ্রামীণ উৎসবের প্রায় পুরো দায়ভার চাকরান স্বত্বাধিকারীদের ন্যস্ত করা হতো একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে উৎসবের প্রতিটি পর্যায়েই পরমতম মূল্যবোধ গ্রামবাসী ফিরে পাবে, পরিবর্তে জমিদারদের দাবি ছিল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা।

মানচিত্র ঃ ২.৫ হরহর গ্রামের চাকরাণ জমি

সারণী ঃ ২.১২ হরহর-এ নিষ্কর কর্ষস্বত্ব (কিশ্‌তওয়ারি জরিপের ভিত্তিতে)

খাতিয়ান নম্বর (১)		স্বত্বাধিকারীর জাত (২)	'নল' (৩)	বাস্তুভিটা (৪)	বাগান (৫)	পুকুর (৬)	পুকুরপাড় (৭)	মোট (একরে) (৮)	প্লট নম্বর (৯)	বড় তালুক (তৌজি নম্বরে) (১০)	মন্তব্য (১১)
৫	চাকরান কর্ষ (চা.ক.)	ধোপা	০ ৯৬	-	-	-	-	০.৯৬	৪৩১	৪৯৬,৫১০,৫১৭ ৬৪৯.৮৮৪	
৬	চাকরান জাগির (চা.জা.)	কাহার	১.৭৬	-	-	-	-	১.৭৬	১০৩,১০৮, ১৬২	ঐ	
৭	চা.জা.	নাপিত	১.৭৬	-	-	-	-	১.৭৬	১০৪,১১০,	ঐ	রায়তাধীনে
২৬	চা.জা.	কাহার	০.৩০	-	-	-	-	০.৩০	৫২৮	৫৫১	
৩০	চা.ক	ধোপা	০.৩০	-	-	-	-	০.৩০	৫২৯	৫৭৩	
৪৬	চা.জা.	ধোপা	০.৪৬	-	-	-	-	০.৪৬	১৮৪, ৫৩০		
৬১	চা.জা.	ভুঁইমালি	-	০.২৯(০.১৪)	-	-	-	০.২৯(০.১৪)	৪৭৩	৬০১,৬০২,৮৬০	
৬২	চা.ক	নট্ট	-	০.৩৬(০.১৮)	-	-	-	০.৩৬(০.১৮)	৪৭৮	ঐ	
৬৩	চা.ক	ধোপা	০.২৫	১.৯১(০.৪৭)	-	০.৪৩	০.২৩	২.৮২(০.৪৭)	৪৭১, ৪৭২, ৪৭০, ৪৬৯	ঐ	
৬৪	চা.ক	কাহার	-	১.০০(০.৫০)	-	-	-	১.০০(০.৫০)	৩৫৪	ঐ	
৭০	চা.ক	নট্ট	-	-	০.৭৫(০.৭৫)	-	-	০.৭৫(০.৭৫)	৪৫৭	ঐ	
৭১	চা.জা	ভুঁইমালি	-	-	০.৩৪(০.৩৪)	-	-	০.৩৪(০.৩৪)	৫৪০	ঐ	
৭২		কাহার	-	-	০.৮০(০.৮০)	-	-	০.৮০(০.৮০)	৩৬৩, ৩৬৯		
৭৬	চা.জা.	কায়স্থ	-	-	০.৪০(০.৪০)	-	-	০.৪০(০.৪০)	৩৫৬	৬০১	
৭৭	চা.কা.	কাহার	-	-	০.১৪(০.১৪)	-	-	০.১৪(০.১৪)	৩৬৫, ৩৬৬	৬০১, ৬০২, ৬০৩	
৯৯	চ'.কা.	ধোপা	০.৯৬	-	-	-	-	০.৯৬	৪১৮, ৪৬০, ৫৩৭	ঐ	

(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১০০	চা.ক.	কাহার	০.১৩	-	-	-	-	০.১৩	৩৬১	৫৮৮, ৬৮৪	
১১৯	চা.জা.	নাপিত	-	-	-	-	-	০.৯৩(০.২৪)	৬৯.১০৭	৬৮৯	
১২০	চা.ক.	ধোপা	০.৪১	০.৪৯(০.২৪)	-	০.৪৪	-	০.৪১	২৫৯	ঐ	
১৯১	চা.ক.	ভুঁইমালি	-	০ ৫৪(০.২৭)	-	-	-	০.৫৪(০.২৭)	৩৪৫	৩৯১	
১৯২	চা.ক.	নাপিত	০.৯২	-	-	-	-	০.৯২	১৩৫	ঐ	
১৯৪/এ	চা.ক.	ধোপা	০.১২	-	-	-	-	০.১২	১৮৩	ঐ	
২১৯	চা.ক.	নাপিত	০.৪০	-	-	-	-	০.৪০	১০৯	৮৮৪	ব্রহ্মোত্তর
২২০	চা.ক.	নাপিত	০.৫৪	-	-	-	-	০.৫৪	২৩	ঐ	ঐ
২২২	চা.ক.	ধোপা	০.৫৬	-	-	-	-	০.৫৬	২৪৮	ঐ	আসৎ তালুক
২২৩	চা.ক.	নাপিত	০.৫৪	-	-	-	-	০.৫৪	১০১	ঐ	ঐ
২৬০	চা.জা.	নাপিত	০.০৮	-	-	-	-	০.০৮	১২৭	১১৯৮	
মোট			১০.৪৫	৪.৫৯(১.৮০)	২.৪৩(২.৪৩)	০.৮৭	০.২৩	১৮.৫৭(৪.২৩)			

বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা বলতে বুঝতে হবে নলজমি নয়, কিন্তু কর্ষিত জমি।

ব্যবসায় ব্যবহৃত অর্থাৎ 'বাণিজ্য-কর্ষ' ও গ্রামবাসীদের এলাকা বাদে রায়তি স্বত্বে জমির পরিমাপ ছিল ২৫৭.৯৪ একর বা ৮৪.৭ শতাংশ। এই মোট অঞ্চলের ৭২.৪ শতাংশ বা ১৮৮.২১ একর আবাদি জমি। ৯৬.৬৫ একর 'নল' জমি; অবশিষ্ট ৯১.৪৬ একর হয় বাস্তুজমি, অথবা বসতবাড়ি, বাগান বা পুকুরের পাড় ইত্যাদি।

এই গ্রামের বাসিন্দা নয় এমন লোকেদের গ্রামের মধ্যে ৪৪.০৩ একর বা ১৪.৫ শতাংশ জমি ছিল। এর মধ্যে ৪০.৪৬ একর আবাদি জমি। এই জমির অধিকাংশ 'নল' শ্রেণীভুক্ত (মানচিত্র ঃ ২.৬) অর্থাৎ সমস্ত নল জমির ২/৫ ভাগ তাদের দখলে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের নল জমি ছিল গ্রামটির সীমানায়। যেমন গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বের সীমানায় অধিকাংশ নল জমির স্বত্ব ছিল বাটাজোর গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের। ফলে হরহর-এ মুসলমান প্রভাবের ফল বাড়ে সংলগ্ন গ্রাম বাটাজোর থেকে। অন্যদিকে উত্তরের বিস্তীর্ণ নল অঞ্চল ছিল 'বাছার', উত্তর-পশ্চিম চন্দ্রহার, মাহিলারা ও দেওপাড়া গ্রামের প্রসারিত নল খেতের অংশ। বাজার এলাকা থেকে সরু আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধার পথ ধরে বসতিঘেরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এই এলাকায় এসে যখন পৌঁছালাম, ভাবলাম

সারণি ঃ ২.১৩ জাত / বর্ণ অনুযায়ী জমি-র বিন্যাস

জাত/বর্ণ	(১) আয়তন (একরে)	(২) কর্ষিত জমি	(২) থেকে (১) শতকরা
বারুই	১৭.৯২	১২.১৯	৬৮.০
নমশূদ্র	২১.২০	১৬.৯৭	৭৬.৪
দাস	৫২.৪২	৩৮.১৮	৬৫.২
অন্যান্য কায়স্থ	৪১.৩১	২৭.০৮	৬৫.৭
কায়স্থ (মোট)	৯৩.৬০	৬১.২৪	৬৫.৪
নাপিত	১৪.৫১	১১.৮১	৮১.৪
কাহার	৬.৬২	৫.২৯	৭৯.৯
রজক বিপলা	১.৯১	০.৮১	৪২.৪
নট্ট বিপলা	০.৬২	০.৩৫	৫৬.৫
নট্ট	১.১১	০.৯৩	৮৩.৮
ভুঁইমালি	১.১৭	০.৭৫	৬৪.১
বৈরাগী	০.৭৬	০.১৪	১৮.৪
ছুতার/সূত্রধর	০.৫৫	০.৫৫	১০০
ছাদ/ছড়	১.৪০	০.৭২	৫১.৪
চাঁদ	১.৩৮	১.১০	৭৯.৭
শনাক্ত করা যায়নি গোষ্ঠী	১.০৬	০.৫৫	৫১.৯
মালাকার	৬.৫৫	৩.৩১	৫০.৫
গোপ	১১.৫০	৯.০৮	৮০.০
ধোপা/ধূপী	৩১.০৫	২১.৮৬	৭০.৪
মোট	২১৪.০৪	১৪৭.৬৭	৬৯.০

গ্রামের গভীরতম স্থলে এসে পড়েছি; স্মরণে ছিল না গ্রামের সেই দিকটি প্রতিবেশী গ্রামগুলির সীমারেখা ছুঁয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিস্তীর্ন নল জমি ছিল এইসব গ্রামবাসীরই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া আবাদি জমি। এখনও পর্যন্ত তাই চলছে। কিন্তু হরহর-এর বাসিন্দাদের গ্রামসীমার বাইরেও নিশ্চয় অনল্প পরিমাণ জমি থাকবে। তাই, শুধুমাত্র হরহর-এর খতিয়ান বিশ্লেষণ করে জমিস্বত্বের সমস্যার সমাধান করা যাবে না, কেননা খতিয়ানে গ্রামসীমার বাইরে জমি সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই।

মানচিত্র ঃ ২.৬ গ্রামের বাইরে বাসবাসকারীদের অধিকৃত জমি
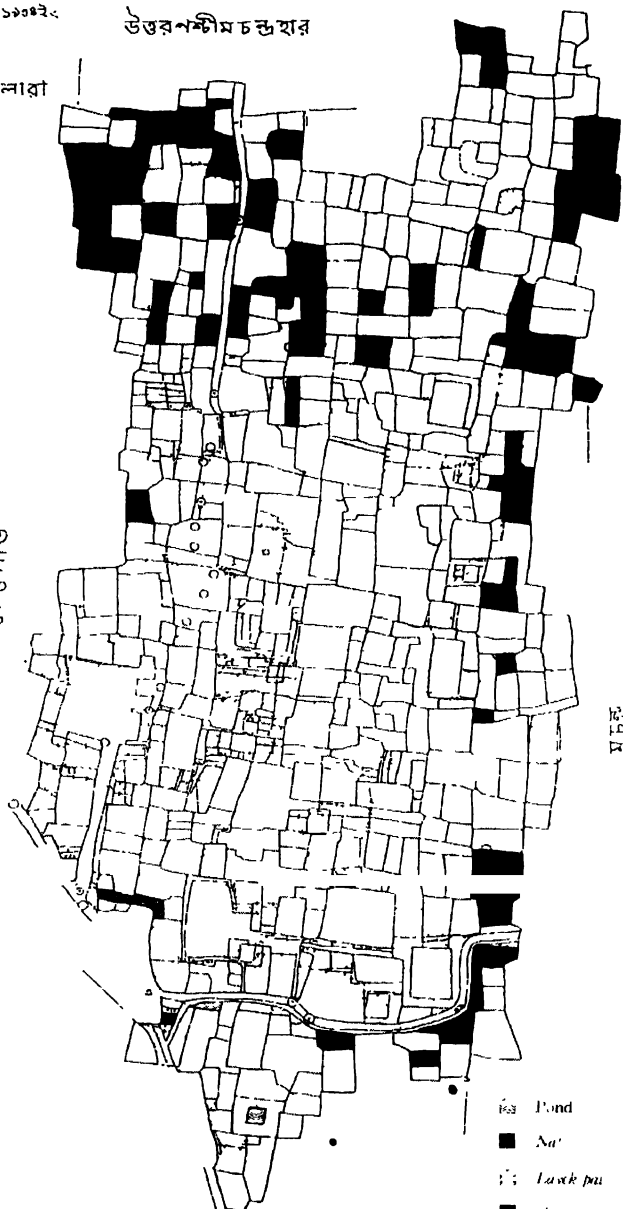
জমি বণ্টনের বিবরণ সারণি ঃ ২.১৩-য় দেওয়া আছে। গ্রামের রায়তি স্বত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সবচেয়ে বেশি কর্ষজমি কায়স্থদের দখলে। গ্রামবাসীদের জমির পরিমাণ ৯৩.৬০ একর অর্থাৎ ৪৩.৮ শতাংশ। শুধুমাত্র কর্ষজমি স্বত্বের মাপকাঠিতেও নিশ্চিত করে বলা যায়, হুরহুর কায়স্থ প্রধান একটি গ্রাম।

আন্তর-বর্ণ সম্পর্কের বিচারে স্ব-স্ব পরিবারের জমিস্বত্বের উল্লেখ প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রয়োজনীয় কাজটি এই সমীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে একমাত্র কারণে যে খতিয়ানের তথ্যের ভিত্তিতে পরিবারগুলি শনাক্তকরণে বেশ ঝুঁকি থেকে যায়। পূর্বেকার রীতি ছিল পুরুষ উত্তরাধিকারের মধ্যে পারিবারিক জমি সমান ভাগে বন্টিত হবে এবং সেই মতোই কোনো নতুন পরিবার সৃষ্টি করা হতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পারিবারিক জমি, সম্পূর্ণ বা অংশগত, একত্রে সাধারণভাবে সবাই মিলেই তদারকি করছে। বর্তমানে আমরা, নিজেরা, তথ্যের দিক থেকে এমন জায়গায় নেই যার ভিত্তিতে প্রকৃত পরিবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। অধিকন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও এক খণ্ডচিত্র মাত্র দেয়; তাই আমাদের আলোচনা এ পর্যন্তই সীমায়িত করা উচিত।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কায়স্থদের জমিস্বত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, জমিদার পরিবারগুলির কয়েকজন সদস্য যেমন, বসু, ঘোষ, গুহ, সেন (বৈদ্য সেন এই গ্রামে নেই) ও দত্তরা এই বর্গভুক্ত। ঈশানচন্দ্র দত্ত, 'পাঁচ আমিন বাড়ি'-র একমাত্র উত্তরাধিকার, ১.৫৮ একর জমির এক কর্ষদার মাত্র। কিন্তু তাঁর জমি সম্পূর্ণ বাস্তু জমি, কোনো কৃষিজমি ছিল না। এরকমই 'দক্ষিণের বাড়ি'-র দুর্গাচরণ দত্ত ও বিশ্বেশ্বর দত্তের জমিস্বত্ব এঁদের বাস্তুজমির একাংশ কর্ষদার স্বত্ব।

জমিস্বত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে এক বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কায়স্থদের ক্ষেত্রে। রামচন্দ্র সিংহ ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে বেশি কর্ষজমির স্বত্বাধিকারী, প্রায় ১০.০১ একর। ৯৬জন খতিয়ান স্বত্বের কায়স্থদের মধ্যে মাত্র ৫ জনের জমির পরিমাণ ৩ একরের বেশি। ১ একর কি তারও কম জমি ৬৮ জনের। ১৬ জনের ১.০১ থেকে ২ একরের মতো, বাকি ৭ জনের জমি ২.০১ থেকে ৩ একরের মধ্যে। বসবাসের জন্য ১১টি পরিবারের সামান্যতম একটি জমি। এঁদের কেউই জমিদারের কাছারিতে চাকরি করেন না, অকৃষি সূত্র থেকেই তাঁদের উপার্জন। পূর্বপুরুষের আমলে কয়েকটি পরিবারের বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল, কিন্তু উত্তরাধিকারীর ভাগ-বাঁটোয়ারা কারণে আগেকার অবস্থার অবনতি ঘটেছে। যেমন, কামিনীকুমার দাস ও তাঁর দুইভাই প্রত্যেকে এখন ১.৮৩ একর জমির মালিক, অথচ এঁদের বাবা ঈশ্বর দাসের একারই জমি ছিল ৫.৪৮ একর। ভাগ বাঁটোয়ারার ফলে তাঁরা ভীষণই ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে এমন কর্ষ জমি ছিল না যা নিয়ে তাঁরা জীবন শুরু করতে পারেন, পরন্তু ভাগ-বাঁটোয়ারায় তাঁদের ছোট জমি ক্রমশ ছোট হয়েছে। এদের অর্থনৈতিক জীবনেও অকৃষি ক্ষেত্র উপার্জনই একমাত্র সম্বল। এর অর্থ, তাদের জীবনযাপনের রীতিনীতি 'ভদ্রলোক'- জীবনযাপনের অনুসারী হয়ে পড়ছিল। অতএব এও সম্ভব যে, তাদের এই ছোট কৃষি জমিতে অন্যেরা, হয় বাড়ির ভৃত্য বা জন খাটে মুনিষ, কেননা এই গ্রামে উপস্বত্বভোগী বিশেষ ছিল না।

স্বদেশি পর্বে, বিশেষত ১৯০৭-এর শুরুর দিকে, এই জেলায় আংশিক মন্বন্তরের

কারণে বিশেষ ক্ষতি হয়। জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর দাবি, 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর মধ্যে যারা দুর্বলতর সে-শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা ভাবতে পারি যে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর দুর্বলতর অংশ অর্থে মধ্যস্বত্বভোগী নিচুতলার মানুষ নয়, এঁরা ছিলেন 'কর্ষ' অধিকারভোগী একেবারেই অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ জমির অধিকারী ভদ্রলোক। এঁদের বাঁচার একমাত্র পথ খোলা ছিল কেরানি হওয়া। এই অবস্থার লক্ষ্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে গ্রামে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় ও জেলা সদরে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়। উপরোক্ত ঘটনা থেকে বেড়িয়ে আসে যে জমিদারদের মধ্যে দুর্বলতর অংশ ক্রমশই কর্ষজমিতে চলে যেতে বাধ্য হয়, এই প্রক্রিয়াই ধীরে ধীরে জমিদারশ্রেণীকে স্পর্শ করতে থাকে।

জমিস্বত্বের নিরিখে পরবর্তী বর্ণ ধোপা, যাদের অধিকারের ৩১.০৫ একর জমির ২১.৮৬ একর আবাদি জমি। ৬.১৮ একর নিষ্কর চাকরান স্বত্বের জমি বাদে, ধোপারা ২৪.৮৭ একর রায়তি স্বত্বের অধিকারী ছিল। তাদের বসত অঞ্চল থেকে কৃষিক্ষেত্র খুব দূরে ছিল না (মানচিত্র ঃ ২.৭ দেখুন)।

১৯০১-এর জনগণনানুযায়ী গৌরনদী থানার মোট জনসংখ্যার ২৪.৯ শতাংশ নমশূদ্র অর্থাৎ মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৪৯.১ শতাংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ নমশূদ্ররা এই অঞ্চলের পরিশ্রমী কৃষক। কিন্তু কায়স্থ প্রধান হরহর-এ নমশূদ্র সংখ্যায় বিশেষ বেশি ছিল না, ৭টি পরিবার ও ১৬ জন কর্ষদার। ফলে বেশি জমিও ছিল না ঃ ২২.২০ একর জমির মধ্যে ১৬.৯৭ একর কর্ষিত খেত। খুব সম্ভব গ্রামের আবাসিক এলাকার উত্তরপ্রান্তে নমশূদ্রের আদি ভিটা ছিল। সে-কারণেই তাদের নল জমির অঞ্চল উত্তরের ধানখেতমুখি। পরবর্তী সময়ে আসা অন্যান্য পরিবারগুলির জমির পরিমাণ ছিল খুবই কম, এমনকি অনেক পরিবারের জমিই ছিল না। নিকটবর্তী গ্রাম দেওপাড়া থেকে 'পশ্চিমের বাড়ি'-র উত্তর দিকের কীর্তনিয়া পরিবার এই গ্রামে আসে, বাপদাদার সময় পর্যন্ত তাঁরা পূর্বের গ্রামেই বাস করতেন (মানচিত্র ঃ ২.৮)। নমশূদ্ররা সমাজে প্রান্তিক ছিলেন, তাঁদের পূর্বনাম 'চণ্ডাল', ক্রিয়াকর্মের যে অনুষঙ্গে অপরিচ্ছন্নতা, অশুদ্ধতার ইঙ্গিত ছিল, তা ১৯২০ পরবর্তী সময়ে গ্রামের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

পানের চাষে নিযুক্ত ছিলেন বারুই বর্ণের মানুষেরা, স্থানীয় উচ্চারণে 'বারই' বলা হতো তাঁদের।

রিজলির *ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল* (১৯৮১) থেকে বহু পংক্তি বারুইদের সম্পর্কে উদ্ধার করে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ঃ "পানচাষ এক বিশিষ্ট রীতির উন্নতমানের ব্যবসা, এতে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গেই প্রয়োজন এই বিশিষ্ট লতা জাতীয় গাছটির সযত্ন পরিচর্চা।"[২৮] বিভিন্ন পানের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

> "বাখরগঞ্জে উৎপন্ন পানের মধ্যে সেরা পান হল দেশী, বাংলা, ধলাডগা, ঘাসপান।"[২৯]

বারুইদের সামাজিক পদমর্যাদার প্রসঙ্গে রিজলের বক্তব্য ঃ

> "বারুইদের সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তারা নবশাখ-ভুক্ত। ... জমির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান রীতিমতো উচ্চ পর্যায়ে। কেউ কেউ জমিদারদের মতো, অন্যান্যদের মধ্যে কেউ মালিকানা স্বত্বভোগী, কেউ বা রায়তি স্বত্বভোগী।"[৩০]

মানচিত্র ঃ ২.৭ ধোপাদের অধিকৃত জমি
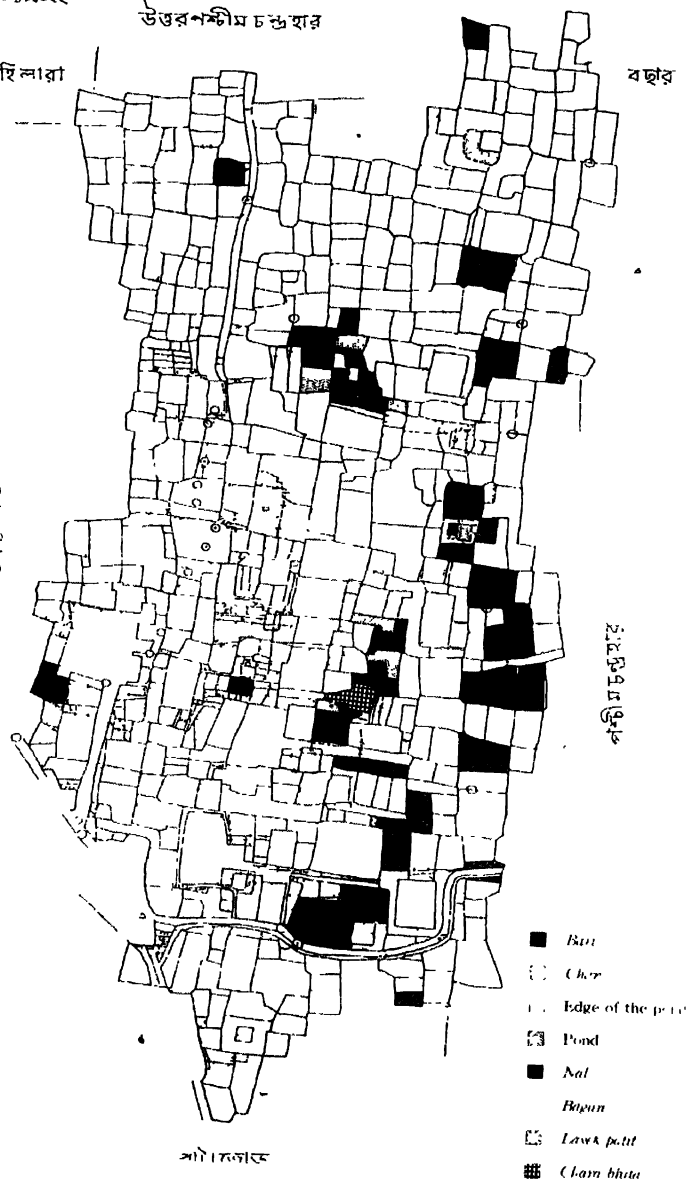
মানচিত্র ঃ ২.৮ নমশূদ্র অধিকৃত জমি নল বাড়ী চান পুকুর, পুকুর সীমানা, লায়েক পতিত, পুকুর
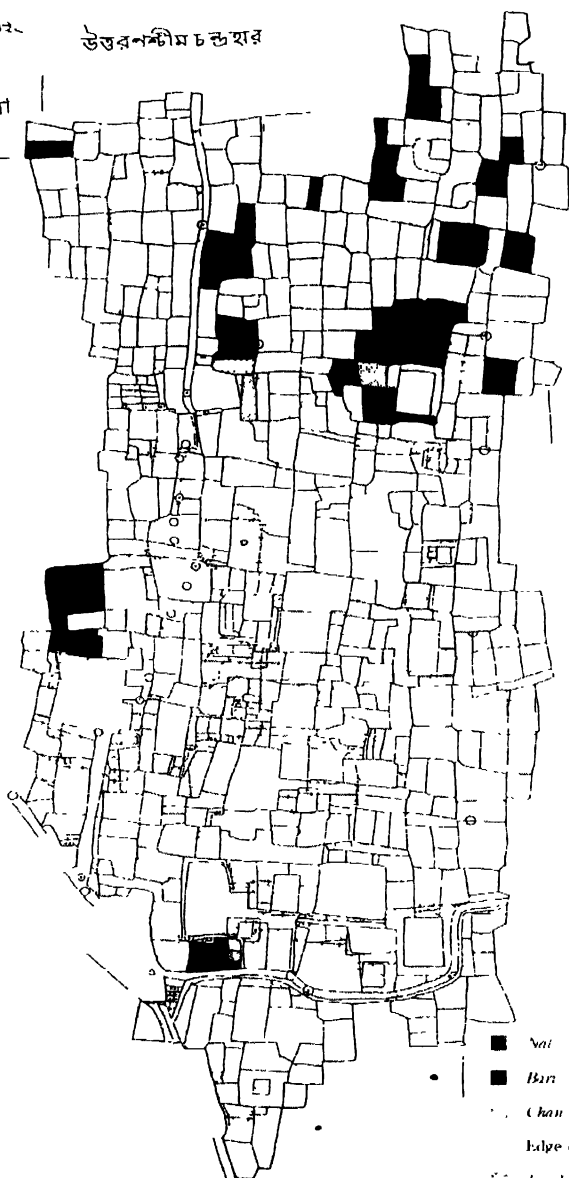
মানচিত্র ঃ ২.৯ বারুইদের অধিকৃত জমি
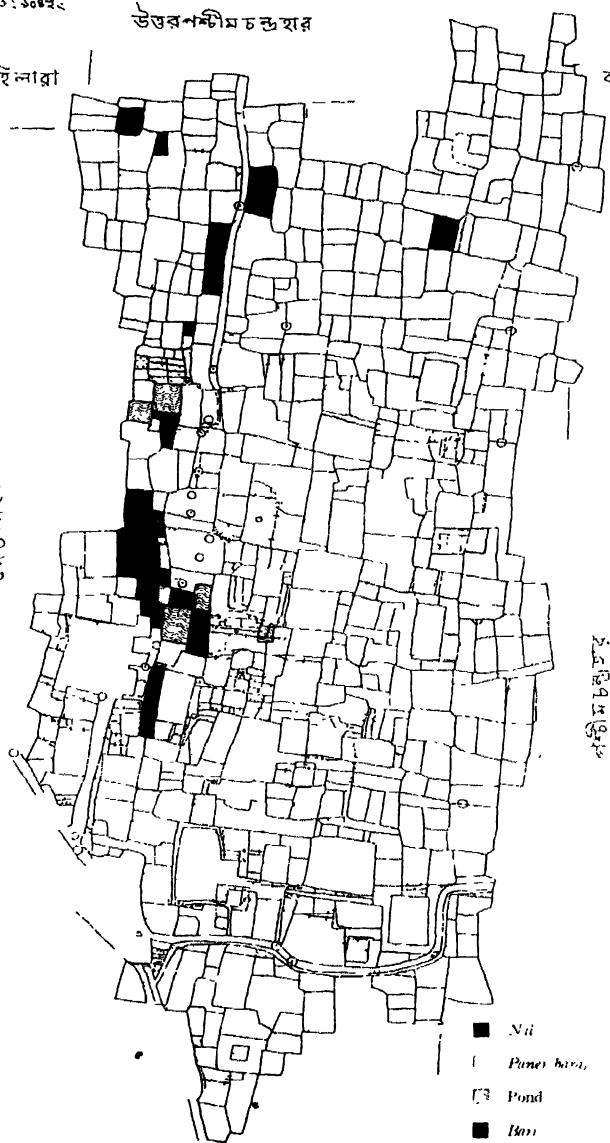
মানচিত্র ঃ ২.১০ নাপিতদের অধিকৃত জমি

মানচিত্র ঃ ২.১১ গোপদের অধিকৃত জমি

মানচিত্র ঃ ২.১২ মালাকার অধিকৃত জমি

হরহর-এ বারুইরা এখনও পর্যন্ত তাদের চিরায়ত বৃত্তি অনুসরণ করে চলেছে। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময় গ্রামের মধ্যে তাদের জমি ছিল ১৭.৯২ একর, এর মধ্যে আবাদি অংশ ১২.১৯ একর। মানচিত্র ঃ ২.৯ দেখলে বোঝা যাবে, বারুইদের জমিবণ্টন ব্যবস্থায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। 'পশ্চিমের বাড়ি'-পথ ধরে বারুইদের বসতি এলাকা ছিল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। একইভাবে তাদের পানের বরজও নল জমি বিস্তৃত, মূলত খালের পশ্চিম পাড়ে। পানের বরজগুলি উঁচু দেওয়াল ও বাঁশের ছাঁচের ছাউনি দিয়ে সুরক্ষিত থাকত। রিজলির কথা মনে করিয়ে দেয় উত্তর-দক্ষিণ দিকের রীতি মেনে চলার নীতি। তাঁর কথায় ঃ

> "ডঃ ওয়াইস বলেন, পানের বরজকে প্রায় পবিত্র স্থান রূপে গণ্য করা হয়। বরজের সর্বাধিক বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণমুখী, প্রবেশপথটি অবশ্যই পূর্ব-পশ্চিমে।" যদিও দত্ত পরিবারের কয়েকটি বরজ এই অক্ষীয় রীতি ভেঙে পূর্বমুখী। পানের চাষ এতই লাভজনক ব্যবসা যে বারুইদের আর্থিক অবস্থা তাদের স্বত্বজমির আয়তনের তুলনায় ঢের-ঢের ভালো।[৩১]

গ্রামের উত্তরদিকে নাপিতদের বাস, তাদের মোট জমির পরিমাণ ১৪.৫১ একর। উত্তরের ধান খেতের দিকে নাপিতদের নল জমি বিস্তৃত, মাঝখানে চাকরান স্বত্বের জমি। তাদের স্বত্বের আবাদি জমি (১১.৮১ একর), মোট জমির অনুপাতিক হারে ৮১.৪ শতাংশ। দত্তদের 'পুরান বাড়ি' থেকে বহুদূরে নাপিতদের বসতপাড়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করে গ্রামে তাঁরা পুরনো অধিবাসী, কোনও এক অতীতে তারা কিছু অংশ নিষ্কর জমি দান হিসাবে পেয়েছিলেন (মানচিত্র ঃ ২.১০)।

গ্রামের মধ্যে গোপ ও মালাকারদের জমির পরিমাণ রীতিমতো বেশি। গোপ অর্থাৎ গোয়ালারা প্রথমে গ্রামের দক্ষিণ দিকে বসত শুরু করে, পরে ক্রমশ উত্তরের দিকে ছড়িয়ে পড়েন। 'খতিয়ান'-এর বিবরণ থেকে এ-সত্য প্রমাণ করা যায়। উত্তরের দিকের গোপদের বসতি অঞ্চলে প্লট নম্বর ৩২৫-এ সতীশ গোপ ও তার দুই ভাইয়ের বাড়ি ছিল, কিন্তু তাঁদের নল জমি (প্লট ৪৬১.৫৩১ ও ৫৩২) ছিল গ্রামের দক্ষিণে। এই গোপ পরিবারের চাষের জমির কাছেই ছিল অন্যান্য গোপদের জমি যারা থাকত গ্রামের দক্ষিণ দিকে। মনে হয়, 'পশ্চিমের বাড়ি'-র কোনো সদস্যেরই গোপগোষ্ঠীর কেউ নিকটবর্তী না থাকায় তাঁরা সতীশ গোপদের বাবা পটুরামকে ডেকে এনে বসায়। বাসস্থানের জায়গাসহ নল জমি (প্লট ঃ ৩২৩) দান করে। গোপদের স্বত্বে জমির পরিমাণ ১১.৫০ একর যার ৯.০৮ একর আবাদি জমি (মানচিত্র ঃ ২.১১)।

বাজারের দক্ষিণ সীমার ঠিক পেছনেই গ্রামের দক্ষিণে মালাকারদের ঘনবসতি। ৬.৫৫ একর মাত্র তাদের জমি। কিন্তু বাজারের সঙ্গে লাগোয়া থাকার কারণ মালাকার-গোষ্ঠী বেশ সচ্ছল ছিল (মানচিত্র ঃ ২.১২)।

বিতর্কিত কাগজপত্র (বর্তমান প্রবন্ধে ৫-এর অংশ দেখুন) থেকে আমরা দেখতে পারি, মালাকারদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে অশ্বিনীকুমার দত্তের সম্পর্ক ভালো ছিল না, যদিও মালাকারদের জমি ছিল 'নূতন বাড়ি'-র তালুকের এক্তিয়ারে (বিতর্কিত নথি ঃ ৮৮)। এ-কারণ প্রসঙ্গে স্বদেশি পর্বের একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বদেশিদের আন্দোলন স্বত্বেও ১৯০৬-এর নভেম্বর মাসে বিদেশি পণ্যের আমদানি বেড়ে যায়। অশ্বিনী-

কুমার প্রস্তাব দেন, বিদেশি পণ্য 'বয়কট'-এর আহ্বানে বাটাজোর বাজারে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হোক। ইচ্ছা প্রকাশ করেন পরবর্তী যে দু'দিন তিনি এই অঞ্চলে থাকবেন সেই সময়ে বিদেশি পণ্য বিক্রি যেন বন্ধ থাকে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। লোকেরা অশ্বিনীকুমারকে ঠাট্টা করতে থাকে, "তোমার নিজের বাজারেই করতে পারোনি, আমাদের তুমি আর কী করবে?"

দত্তরা ছিলেন বাটাজোর বাজারের মালিক। দুই অংশের বাজারের উত্তরদিক ছিল 'নূতন বাড়ি'-র এক্তিয়ারে, 'পশ্চিমের বাড়ি'-র ছিল দক্ষিণ অংশ। সে-সময়ে দক্ষিণ অংশের বাজার বেশ রমরমা, গুরুত্বপূর্ণও, এই ভাগেই ছিল মালাকারদের দোকানপাট। বাজার-সূত্রে মালাকারগোষ্ঠী সরকারপক্ষের বন্ধু 'পশ্চিমের বাড়ি'-র দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বলা হয়, এখনও পর্যন্ত মালাকারগোষ্ঠী ভালো ও মন্দের সময়োপযোগী বিবেকী বন্ধু বা সেবক। 'পশ্চিমের বাড়ি'-র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কাজ করতে অবশ্যই অনিচ্ছুক ছিল, যেহেতু তারা এই তরফের এক্তিয়ারে। খালের অপর পারে ছিল বণিকদের বাস, বাটাজোর বাজারে তারা এখনও সমান প্রভাবশালী। চতুর ব্যবসায়ী হিসাবে এইসব লাভজনক বিদেশি পণ্য বিক্রি বয়কটে তাদের রাজি না হওয়ারই কথা। বণিকদের দোকানগুলির বর্তমানের অবস্থান এই আভাস দেয় যে, তারাও 'পশ্চিমের বাড়ি'-র অধীনে ছিল। স্বদেশি আমলে বাটাজোর বাজার অশ্বিনীকুমারের প্রভাবাধীন ছিল না।

মানচিত্র ঃ ২.১৪-তে দেখা যায় দত্তদের দুই তরফের মালিকানাধীন বাজারের দুটি অংশ দত্তদের বাসস্থান থেকে বহু দূরে হলেও দুই তরফের পারস্পরিক রেষারেষি থেকে দূরে ছিল না। বাজারের স্থান যেখানেই হোক না, বাজারের নিয়ন্ত্রণে একের সঙ্গে অপরের দ্বন্দ্ব ছিল; গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর অদৃশ্যেই এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। স্বদেশি প্রচার গ্রামস্তরে নেমে এলেও শুধুমাত্র দেশাত্মবোধের মহান কথায় গ্রামবাসীদের আন্দোলিত করতে পারেনি। অশ্বিনীকুমারের প্রস্তাবে মালাকারদের বিরোধিতা এবং অশ্বিনীকুমারের বিদেশি পণ্য বয়কটে সমাজ রাজনীতিক যৌক্তিকতা বোঝানোর ব্যর্থতা, আসলে নিহিত ছিল দত্তদের দুই তরফের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক রেষারেষিতে। স্থানীয় স্বার্থের জটিল বুনটের মধ্যে দিয়েই গ্রামবাসীর কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজন ছিল।

হরহর-এ রায়তদের চলতি খাজনার হার ছিল একর পিছু ৩ টাকা ৭ আনা। গ্রামের খাজনার হার জেলার হার, ৪ টাকা ৮ আনা, থেকে কম ছিল; কিন্তু গৌরনদী থানার হারের, ২ টাকা ৯ আনা, চেয়ে বেশি। জে.সি.জ্যাক-এর মতে ঃ "বাখরগঞ্জের রায়তদের খাজনার গড় স্বাভাবিক এবং প্রাপ্ত খাজনা শস্যের প্রকৃত মূল্যের ১/১০ ভাগের বেশি নয়" নিকটবর্তী বাটাজোর মৌজার চলতি হার ছিল একর প্রতি ৩ টাকা ৬ আনা।

হরহর-এ উৎপন্ন খাজনা দেওয়া হতো ১৫ কর্ষজমিতে। যে-অঞ্চলের জন্য উৎপন্ন খাজনা দেওয়া হতো তার পরিমাণ মোট রায়তি অঞ্চলের ১২.৩২ একর বা ৪.৮ শতাংশ। জেলার গড়, ৫ শতাংশ, থেকে এই পরিমাণ সামান্য কম, কিন্তু মহকুমার গড় ৮ শতাংশের বেশ নিচে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় উৎপন্ন খাজনা ব্যবস্থা মূলত যেসব অঞ্চলে 'ভদ্রলোকদের' বসতি সেসব ক্ষেত্রে সফল। কিন্তু, হরহর-এ 'ভদ্রলোক' প্রাধান্য সত্ত্বেও উৎপন্ন খাজনা সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু করা যায়নি। এই গ্রামে কেন উৎপন্ন খাজনা কম

সারণী ঃ ২.১৪ হরহর-এ কর্ষদারদের শস্যের বিনিময়ে খাজনা প্রদান (কিশ্‌তওয়ারি জরিপের ভিত্তিতে)

ক্রমিক সংখ্যা (১)	প্লট নম্বর (২)	জমির বৈশিষ্ট্য (৩)	আয়তন (একরে) (৪)	আবেদনকারী (৫)	আবেদনকারীর চরিত্র (৬)	বর্গজমির পরিমাণ (৭)	প্রাপক-এর নাম (৮)	প্রাপক-এর চরিত্র (৯)	খাজনা (১০)
১.	৫৫২	নল	০.৫৪	বিনোদাসুন্দরী বৈষ্ণবী	কর্ষদার	০.৪২	দ্বারিকানাথ দত্ত ও অন্যান্য	তালুকদার	ধান্য করারি (ধা.ক), ৬ কাঠি ধান
২.	৮২	ঐ	০.৫৭	রামচন্দ্র গাইন (দেওপাড়া)	ঐ	০.৯০	রজনীকানাত দত্ত ও অন্যান্য	হরিয়তদার	ধা. ক, ৮ কাঠি ধান
৩.	৫৩৬	ঐ	০.১৭	বাচেরদি ও আরও ৩ জন মুসলমান	ঐ	০.৭৬	মনোমোহন দত্ত ও অন্যান্য	তালুকদার	ধা. ক, ৪ কাঠি ধান
৪.	৪৫১	ঐ	১.৪৪	১/২ গুরুচরন ধুপি	ঐ	৩.০২			
				১/২ রামচরণ ধুপি	ঐ	২.৫৯	যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু	হরিয়তদার	ধা.ক, ২২ কাঠি ধান
৫.	৩৫৮	ঐ	১.৫৮	নিতাই নন্দী (পশ্চিম চন্দ্রহার)	ঐ	১.৫৮	ঐ	ঐ	ধা.ক, ২৭ কাঠি ধান
৬.	৮৫	ঐ	০.৩৫	১/২ শ্রীনাথ মণ্ডল (দেওপাড়া)	ঐ	০.৭০	দ্বারিকানাথ দত্ত ও অন্যান্য	তালুকদার	ধা.ক, ৪ কাঠি ধান
				১/২ রজনী মণ্ডল (দেওপাড়া)	ঐ				
৭.	১৭৫	ঐ	০.৪৭	মোহন ধুপি	ঐ	২.৯৫	সতীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্য	হরিয়তদার	ধা.ক, ৩ কাঠি ধান
৮.	১৭৪	ঐ	০.৮০	হারাজন্দ্র ব্যাপারি	ঐ	৮.৫৭	ঐ	ঐ	
৯.	১৯	ঐ	০.৩৫	গোবিন্দ মেস্তারি (দেওপাড়া)	ঐ	১.১৯	জগৎচন্দ্র দাস ও অন্যান্য	ঐ	ধা.ক, ৫ কাঠি ধান
১০.	১৩	ঐ	০.৪৭	ইশ্বরচন্দ্র বারুই (মাহিলারা)	ঐ	১.০৪	ঐ	ঐ	বর্গা
১১.	১৭১	ঐ	০.২৭	গুরুচরন ধুপি	ঐ	১.৩১	রমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	দা.ক, ৩৫ কাঠি ধান
১২.	৫৩৪	ঐ	০.৫৯	বাচেরদি ও আরও ৩ জন মুসলমান	ঐ	০.৭৬	গুরুচরণ চক্রবর্তী ও অন্যান্য	ব্রহ্মোত্তর	বর্গা
১৩.	১৩৪	ঐ	০.৫৬	ধোনাই বৈদ্য (দেওপাড়া)	ঐ	২.১৬	মথুরানাথ দত্ত	ঐ	বর্গা
১৪.	৫৬৮	ঐ	০.৩৮	গোবিন্দ মেস্তারি (দেওপাড়া)	ঐ	১.১৯	জগৎচন্দ্র দাস ও অন্যান্য	চাকরান	ধা.ক, ৫ কাঠি ধান
১৫.	৪	ঐ	০.৫২	বলাই সর্দার (দেওপাড়া)	ঐ	১.৭২	ঐ	হরিয়তদার	"
১৬.	৯৫	ঐ	০.৫৬	বেচারাম দাস (মাহিলারা)	ঐ	০.৫৬	ঐ	ঐ	ধা.ক, ৫ কাঠি ধান
১৭.	৯৩	ঐ	০.৬০	ঈশ্বরচন্দ্র বারুই (মাহিলারা)	ঐ	১.০৪	ঐ	ঐ	বর্গা

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১৮.	২৫	ঐ	০.৭০	গোবিন্দ চন্দ্র দাস (মাহিলারা)	ঐ	০.৭০	ঐ	ঐ	বর্গা
১৯.	২৪৬	ঐ	০.৪২	সনাতন ধুপি	ঐ	৩.২৪	অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ধা.ক., ৩ কাঠি ধান
২০.	৪১	ঐ	০.০৮	দুর্গাচরন সর্দার (দেওপাড়া)	ঐ	০.০৮	মহিমচন্দ্র ন্যায়রত্ন	ঐ	বর্গা
				শ্রীনাথ সর্দার (দেওপাড়া)	ঐ			ঐ	ধা.ক., ৪ কাঠ ধান
২১.	১৪৪	ঐ	০.৯০	ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাপারি (বাছার)	ঐ	০.৯০	পার্বতীচরণ দত্ত		ধা.ক., ১৭ কাঠি ধান

মানচিত্র ঃ ২.১৩ মুসলমান অধিকৃত জমি
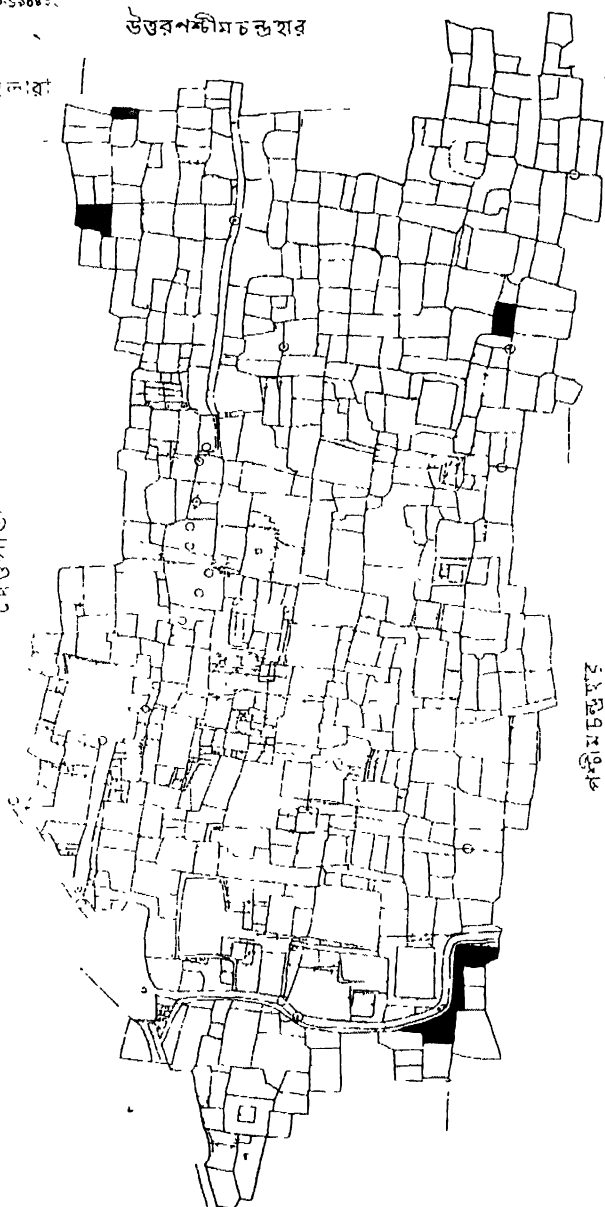
সেই কারণটা বোধ হয় এই যে, এখানে যে প্রভাবশালী তালুকদারের প্রাধান্য তাদের অধীনস্থ ভদ্রলোক গোষ্ঠীর সঙ্গে চাষবাসের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত গৌণ।

সারণি ঃ ২.১৪-এ গ্রামবাসী নয় এমন অনেকের নাম আছে যারা কর্ষদার রূপে পণ্যে খাজনা দিত। এর থেকে মনে হয় উৎপন্ন খাজনা গণ্য হতো এমন একটি ব্যবস্থা হিসাবে যা-কিনা এই গ্রামের বাসিন্দা নয় এমন অথবা অহিন্দু যারা চাইলে গ্রামের চাষের জমিস্বত্ব পেতে পারত। অন্যদিকে, যদি কোনো গ্রামবাসী তাঁর খাজনা পণ্যে দিতে রাজি হয়ে থাকেন তাহলে অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে সে রীতিমতো ধনী কর্ষদারে পরিণত হয়ে আবাদি জমি বাড়িয়ে নিতে আগ্রহী (ক্রমিক ৪, ৭, ৮ এবং ১৯ ও সারণি ঃ ২.১৪ দেখুন)।

অত্যাধিক আবওয়াবের জন্য বাখরগঞ্জ কুখ্যাত ছিল। আবওয়াবের পরিমাণ ছিল মোট খাজনার এক চতুর্থাংশ। কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সময়ে খাজনার হার স্বাভাবিক থাকার কারণে সন্দেহ হয় আবওয়াব সত্যি অসহনীয় বোঝা ছিল কিনা। অস্বীকার করা যায় না অবশ্য যে জমিদাররা বিভিন্ন রকমের আবওয়াব চাপিয়ে এক বড় পরিমাণ উদ্বৃত্ত টাকা আত্মসাৎ করত। কিন্তু তাদেরও সামাজিক-রাজনৈতিক গূঢ়ার্থ। জে.সি.জ্যাক-এর স্মরণীয় উক্তি ঃ "অনেক জমিদার আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে আবওয়াব নেওয়ার মজা অন্যায় দাবির স্বেচ্ছাচারে।" এরপরেও বৃত্তান্তের আর একদিক আছে। প্রজাদের কাছে আবওয়াব অর্থে নিছক আর্থিক চাপ — এছাড়া কী আরও কোনও অর্থ ছিল না? হরহর-এ সমীক্ষার কাজে তখন আমি বসবাস করি, দেখি যে পূজার চাঁদা তোলা হচ্ছে। পূজা কমিটির সদস্যরা প্রায় জবরদস্তি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসাবে গ্রামবাসীদের থেকে তুলছে; কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম সেই ব্যক্তির বাঁকা মুখেও কেমন পরিতৃপ্তির ছাপ। অতীতে গ্রামবাসীরা নিশ্চয় পূজার 'খরচ' দিত — সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় যতই চাপিয়ে দেওয়া হোক না কেন, নিজধর্মের এই উৎসবে গ্রামবাসীরাও নিজেদের ফিরে পেত সমাজের অন্যতম হিসাবে। যদিও 'গ্রাম মন্তব্য'-এ পূজা খরচ বলে কোনো উল্লেখ নেই। বাৎসরিক জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে এই 'খরচ' নেওয়া হতো। গ্রাম মন্তব্যে 'টাকুরি', 'শাদিয়ানা', জরিমানা গ্রামবাসীদের ওপর চাপানো আবওয়াব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'টাকুর' ছিল জমিদারের কর — সরকারের জন্য দেয় তোলা — টাকা পিছু এক আনা হিসাবে, শাদিয়ানা অর্থে বিবাহ করা।

৬. কোল-কর্ষদার

রায়তের অধীনস্থদের বলা হতো কোল-কর্ষদার। হরহর-এ কোনও দ্বিতীয় ও নিচের পর্যায়ের রায়ত অধীনস্থ ছিল না। কর্ষ-স্বত্বাধিকারীর অব্যবহিত অধিকারে সব মিলিয়ে ১৫টি কোলস্বত্ব ছিল। রায়ত অধীনরা ৬.৬৪ একর বা ২.৫৭ শতাংশ রায়তি জমি ভোগ করত। এই গড় জেলার গড়ের ৬ শতাংশ, তুলনায় বেশ কম। ১৫টি কোল-কর্ষস্বত্বের গড় ০.৪৪ একর, যা কিনা জেলার গড় অনুপাত থেকে বেশ কম মাপের। জেলার পরিমাপ এক একরের সামান্য বেশি। রায়ত-অধীনরা একর পিছু গড়ে খাজনা দিত ৫ টাকা ২৮ পয়সা, এই খাজনা পণ্যের দেওয়া খাজনা বাদে। রায়তদের খাজনা থেকে, ৩ টাকা ৭ আনা, রায়ত অধীনের হার ছিল বেশি; কিন্তু জেলার খাজনার গড় ৭ টাকা ৩

মানচিত্র ঃ ২.১৪ দুই দত্ত পরিবারের যোগাযোগ স্থল

সারণী ঃ ২.১৫ হরহর-এ কোল-কর্ষস্বত্ব

ক্রমিক সংখ্যা (১)	প্লট নম্বর (২)	জমির বৈশিষ্ট্য (৩)	আয়তন (একরে) (৪)	কোল-কর্ষদারদের নাম (৫)	কর্ষ জমির পরিমাণ (৬)	উন্নত কর্ষদারদের নাম (৭)	কর্ষ জমির পরিমাণ (৮)	ভাড়া (৯)	মন্তব্য (১০)
১.	২৫৪	নল	০.৬৮	প্রসন্নকুমার দাস	৪.১৮	নিবারণ দাস	১.৩১	বর্গা	প্লট ৫২৮-এর বাকি অংশে (০.৯৬ একর)
২.	৫২৮	ঐ	০.৩০		২.৩৪	বিলাস কাহার (জাগির)	১.৭৫	১-১০-৬	তারাচরণ গোপ ওর স্বত্ব
৩.	৫২৫	লায়েক পতিত সনায়ৎ	০.০৭	বনরাম রজক বিপ্র	০.৯৬	গোপালদাস বৈরাগী	০.৩৪	০-১২-৯	বাস্তুজমি প্লট ঃ বলরাম ৫২৩; গোপাল ৫২৪
৪.	৮৪	নল	০.৪৬	ছাদাই হাওলাদার	?	মহিম/হারাচরণ/যোগেশ পাল পাল	০.৯৫ প্রত্যেকে	ধান্য করারি ৬ ধান	
৫.	১৬৪	ঐ	০.৮৩	বলরাম ব্যাপারি	-	হারাচন্দ্র ব্যাপারি	৮.৫৭	২-১০-০	বলরাম-এর ভাই এর স্বত্বে ১ একর কর্ষ জমি।
৬.	৩	ঐ	০.৯০	প্রসন্নকুমার বালা (মাহিলারা)	-	রাজমোহন ভদ্র	১.৩৬	ধান্য করারি ৬ কাঠি ধান	হারাচন্দ্র এদের টাকা।
৭.	৪৫৬	ঐ	১.১৬	১/২ গুরুচরন ধুপি ১/২ নিবারণ ধুপি	২.৩৯ ৩.০২	দীননাথ দাস	৪.৫৭	৮-০-০	
৮.	২৬৯ ২৭২	ঐ চান	০.১৩ ০.২৫	বৃন্দাবন ধুপি	৬.৫৭	অটলমণি নিবারণ দাস	১.৩১ ১.৩১	বর্গা	
৯.	৪০৫	বাড়ি	০.০২ (০.১২)	হরিচরণ দাস	০.৪০	দুর্গাচরণ দত্ত বিশ্বেশ্বর দত্ত	০.২৯ ০.২৯	০-১-৩	
১০.	৩৩১	ঐ	০.০৮ (০.১৬)	সতীশচন্দ্র দাস	০	রামধন দত্ত বর	৪.৩০	০-৯-০	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১১.	২১৩	নল	০.০৬	দুর্গাচরণ দাস	২.০৩	চন্দ্র কুমার দাস	০.৬৩	০-১১-০	কর্ষদার রূপে ২১৩ ও ২১৪
	২১৪	লায়েক	(০.২৮)						নম্বর প্লট দুটিতে দুর্গাচরণ-এর
		পতিত	০.০৬						০.০৬ একর জমি
		সনায়ৎ	(০.২৮)						
১২.	৫৯৭	নল	০.০৪	১/২ দুর্গাচরণ দাস	২.০৩	দীননাথ দাস	১.৪৫	০-২-৬	প্লট ঃ ৫৯৭-এ দুর্গা ও অশ্বিনী-র
			(০.২৬)	১/২ অশ্বিনীকুমার দাস	২.০৩				০.০৭ একর জমি
১৩.	৯৮	ঐ	০.৫৬	১/২ রামকুমার শীল	২.২৩	দুর্গাচরণ দাস	২.০৩	বর্গা	প্লট ঃ ১০১ সংলগ্ন ৯৮ প্লটটি
				১/২ গোপাল শীল	১.৪৬	অশ্বিনীকুমার দাস	২.০৩		শীল ভাইদের স্বত্ব
১৪.	১৩৭	ঐ	০.৬৪	হরচন্দ্র ব্যাপারি	৮.৫৭	মণিচরণ চাঁদ	১.০৮		
১৫.	৫২১	ঐ	০.৪০	বনমালি রজক বিপ্র	০.৯৬	মহিম মালাকর	২.১৩	১-৬-০	প্লট ঃ ১৩৬ সংলগ্ন ১৩৭ প্লটটি
			৬.৬৪						হরচন্দ্র-এর স্বত্বে

আনা ৯ পাই-এর তুলনায় কম। এই সকল তথ্য থেকে বোঝা যায়, গ্রামে কোল-কর্ষ তেমনই প্রচলিত ছিল না।

এক নজরে সারণি ঃ ২.১৫ দেখলে বোঝা যায় কোল-কর্ষদাররা কর্ষদারদের তুলনায় দরিদ্রতর এমন কখনোই নয়। বাস্তবে ১৫ জন কোল-কর্ষদের মধ্যে ৮ জনের রায়তি-স্বত্ব, তাদের থেকে ধনী কর্ষদারদের জমিস্বত্বের তুলনায় বেশি ছিল। তাছাড়াও দু'জনের নাম পাওয়া যায়, হারাচন্দ্র ব্যাপারি ও দুর্গাচরণ দাস, যাদের কর্ষদার ও কোল-কর্ষদার উভয়-রূপেহ দেখানো আছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাবে আমাদের অনুমান করে নিতে হয় যে হরহর-এ দারিদ্র্যই শুধুমাত্র নয় কোল-কর্ষের উদ্ভব অন্যান্য আরও কারণে। জনৈক ধনী মালাকার এই ব্রাহ্মণ পরিবার তত্ত্বাবধানের কারণে কোল-কর্ষ (নম্বর ১৫) বনমালী রজক বিপ্র (বর্ণব্রাহ্মণ) সৃষ্টি করতে পারেন। অপরাপর কোল-কর্ষের উদ্ভবের পিছনে অন্যান্য কারণ দেখানো যেতে পারে।

প্রথমত, কোনো কোনো রায়ত যাদের ২ একরের বেশি জমি তারা নিজস্ব জমিখণ্ড বা সংলগ্ন কর্ষজমি অথবা তাদের বসতবাড়ির অঞ্চলের জমি বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করত। (ক্রমিক ২, ১১, ১২, ও ১৩, ১৪ এবং ৮)।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো কায়স্থ 'ভদ্রলোক' চাষা শ্রেণীর কাছে তাদের কর্ষজমি কোল-কর্ষ করে দিতেন উৎপন্ন খাজনার কড়ারে (ক্রমিক নং ৪ ও ৮)।

তৃতীয়ত, বাসস্থানের জমি পেয়েছিলেন নিঃসম্বল কায়স্থরা। ধনী চাষি জমিদার পরিবারের কোনও সদস্য কোল-কর্ষ স্বত্বে তাদের ক্ষুদ্র জমি দান করে (ক্রমিক সংখ্যা ৯ ও ১০)।

অন্য দুটি ক্ষেত্রে হয় প্রতিবেশীদের মধ্যে সীমানা বিভাগ নিয়ে, নয়ত একই পরিবারের মধ্যে জমি সংক্রান্ত কোনো নিষ্পত্তি (ক্রমিক ৫)।

প্রকৃতপক্ষে কোল-কর্ষ উদ্ভবের পিছনে ছিল রায়তিস্বত্বের অন্তর্গত উপস্বত্বের বিস্তার। এই একই মানসিকতা কাজ করেছিল মধ্যস্বত্বভোগী উদ্ভবের ক্ষেত্রে। সরাসরি কিনে নেওয়ার তুলনায় কোল-কর্ষই ছিল পছন্দসই আবিষ্কার।

৭. বিতর্কিত কাগজপত্রে গ্রাম জীবন

বরিশাল মহাফেজখানার 'গ্রাম বান্ডিল; হরহর'-এর মধ্যে এক ধরনের নথিপত্র আছে 'বিতর্কিত' কাগজপত্র' বা 'ডিস্পিউট শীটস্' শিরোনামে। জে.সি.জ্যাক, 'সার্ভে অ্যান্ড সেটল্মেন্ট রিপোর্ট ঃ বাখরগঞ্জ'-এ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "খানাপুরী সময়ে (ঘরকাটা কাগজের বিভিন্ন ঘরে প্রজার জমি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা) জরিপ দপ্তর বা সেটেল্মেন্ট দপ্তরের অন্যতম কাজ ছিল বিভিন্ন বিবাদ-বিসংবাদ ও গণ্ডগোলের সিদ্ধান্ত নেওয়া। জমির সীমানা সংক্রান্ত বিতর্কের সংখ্যা ছিল ৩৩৭টি, অভ্যন্তরীণ বিবাদের সংখ্যা ছিল ৪৬,৭৭৪টি। এই সমস্ত বিতর্ক জরিপ চলাকালীন সময়ে পেশ করা হয় এবং এই সময়েই কানুনগো ও ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা বিতর্কগুলির নিষ্পত্তি করেন। মাত্র ১১৮টি মামলার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি। সিদ্ধান্তগুলির সঠিক মান বিচারের ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি, সীমানা বিতর্ক বা জমিস্বত্ব সম্পর্কিত বিবাদে ঘটনাস্থলেই নিষ্পত্তি করা হতো।"

মহাফেজখানায় হরহর সংক্রান্ত নথিপত্র সযত্নে রক্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণ মনে হয়, এই অঞ্চলে অজস্র গণ্ডগোল ছিল। ৩০৪.৪৫ একর বিস্তৃত হরহর-এ বিবাদের সংখ্যা ছিল ১১৮; প্রতি ১০০ একরে বিবাদের ঘনত্ব হিসাবমতো ৩৮.৭৬, যেখানে সারা জেলায় ছিল ১.৯২ মাত্র।

এই ১১৮টি বিবাদে বা সমস্যাকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায় (সারণি ঃ ২.৬ দেখুন) গ্রাম জুড়েই সমস্যা ছিল; জমিদাররা নিজেদেরই জমি নিয়ে, তালুকের অংশ নিয়ে বা হকিয়ত বা রায়তদের নিয়ে। দেখা যাচ্ছে কর্ষদাররা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, যে জমি জমিদার দাবি করছেন প্রকৃতপক্ষে তা কর্ষস্বত্বের অধীনে কর্ষদারের নিজের জমি। জমিদারদের পাল্টা দাবি, জমিটি আদতে জমিদারের 'খাস', কোনো কর্ষস্বত্ব দেওয়া হয়নি। রায়তপক্ষের যুক্তি, এই দুজনের মধ্যে কে প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। এক্ষেত্রে প্লট নম্বর ৯৭, ১৩৬ ও ১৬২-র বিবাদ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। শ্রীনাথ ব্যাপারি ও তার ভাই রামচন্দ্র দাবি করে এই তিনটি জমির দুটিতে তাদের সমান ভাগ। অন্যদিকে, এদের কাকা হরচন্দ্র ব্যাপারির দাবি, রামকমল ভট্টাচার্যের ব্রহ্মোত্তরস্বত্বের অধিকারে জমিগুলি তাদের। ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানের সময়ে হরচন্দ্রের অন্য এক ভাইপো দাবি করে জমিগুলি তালুক শ্রী নারায়ণ ঘোষের মালিকানাস্বত্ব। শ্রীনাথ-রামচন্দ্র-হরচন্দ্র ব্রহ্মোত্তরের পক্ষে, অন্যদিকে তালুকদারের পক্ষে বলরাম। বলরামের দাবিতে সন্দেহ প্রকাশ করে 'খানাপুরী হাকিম', কেননা তিনি বাছারের দিনগুলিতে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছিলেন। ঘটনাক্রমে, অ্যাসিট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার রামকমলের বক্তব্য গ্রাহ্য করেন যে, ১৬২ নম্বর প্লটটি ব্রহ্মোত্তর নয়। তিনি নির্দেশ দেন যে প্লট ৯৭ ও ১৩৬-এর মধ্যে শ্রীনাথ (১/৪), রামচন্দ্র (১/৪), হরচন্দ্র (১/২) ব্রহ্মোত্তর স্বত্ব ভোগ করবে এবং ১৬২ নম্বর প্লটে হরচন্দ্র (১/২), শ্রীনাথ (১/৬), রামচন্দ্র (১/৬) ও বলরাম (১/৩) তালুক শ্রীনারায়ণ ঘোষের স্বত্বে ভাগ করে নেবে। অনেকক্ষেত্রে কর্ষজমির অধিকার নিয়ে জমিদাররা পারস্পরিক রেষারেষিতে লিপ্ত হতেন।

সারণি ঃ ২.১৬ কিশ্‌তওয়ারি জরিপকালীন হরহর-এ জমিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিবাদ

	বিবাদ-এর চরিত্র	বিবাদের সংখ্যা
১	সাধারণ জমিসংক্রান্ত	১
২	সীমানাসংক্রান্ত	৪
৩	জমিদারবর্গের মধ্যে	২৬
৪	জমিদার এবং রায়ত-কর্ষদারদের মধ্যে	১৫
৫	রায়তদের মধ্যে	৩৮
৬	বিবাদমূলক জমিটির বড় রায়তদের কার পক্ষে	২৬
৭	কোল-কর্ষর দাবি	৮
	মোট	১১৮

হরহর-এর মতো একটি গ্রামে যেখানে তালুকগুলি জটিলভাবে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেক্ষেত্রে কোনো একখণ্ড জমি কোন্ তালুকের অন্তর্গত এ-খুবই বিতর্ক-সাপেক্ষ। সারণি ঃ ২.১৬-র কর্ষদারদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও কোন্ উর্ধ্বতন পদাধি-কারীর জমির স্বত্ব আসলে এক ও অভিন্ন বিষয়; কিন্তু যেখানে দুই কর্ষদার জড়িত সেক্ষেত্রে

পূর্বেকার বর্গে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, যখন একজন কর্ষদার দাবি করে তার স্বত্ব নির্দিষ্ট এক জমিদারের অধীনে আর-এক জমিদার যা দাবি করছেন তা নয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বর্গে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। হকিয়ত থেকে কোল-কর্ষ পর্যন্ত এই ধরনের বিবাদ বিস্তৃত ছিল। বিবাদের চরিত্র ছিল এই রকম। রায়ত নগেনের দাবি রায়ত খগেন তার অধীনে কোল-কর্ষ জমি ভোগ করে, কিন্তু রায়ত খগেন জানায় সে একজন কর্ষদার। সে-সময়ে তত্ত্বাবধায়ী অফিসার বিনা আপত্তিতে রায়ত খগেনের স্বত্ব অনুমোদন করেন, ফলে কোল-কর্ষর অস্তিত্বই রইল না। জমি জরিপ ব্যবস্থার ফলে গ্রামে কোল-কর্ষ স্বত্বের প্রাদুর্ভাব সংশয়াতীতভাবে রোধ করা গিয়েছিল। এই অংশের শেষে পাঠকদের উৎসাহ যোগাতে পারে এমন একটি ঘটনার কথা বলব। ঘটনাটির জন্ম একটি পুকুর ও চারটি পাড় ঘিরে। এক সামান্য সম্পত্তি নিয়ে রায়ত পরিবারের দুই তরফের রেষারেষি কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রথম পক্ষ অশ্বিনীকুমার ও দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারিকানাথ দুজনেই এই বিতর্কিত জমির দাবিদার। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের বয়ান থেকে উদ্ধৃতি ঃ

> "১৯০০ সালে প্রথমপক্ষ বাওলা জমি কেনে, পরবর্তী কোনো একসময়ে ১/৪ বিঘা ১ কাঠা চন্দ্রকুমার শীলকে বিক্রি করে দেওয়া হয়, চন্দ্রকুমার শীলের প্রপিতামহীর যে-কোনো কারণে হোক নাতির সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকায় দ্বিতীয় আর একজনকে ঐ জমি বিক্রি করে দেন। বিতর্কিত জমিটি ছিল একটি পুকুর ও চারটি পাড় ঘিরে। দেখা যাচ্ছে দুপক্ষই মালিকানার জন্য সচেষ্ট। চন্দ্রকুমার প্রথমপক্ষের কাছে তার অংশ বিক্রি করে দেন যেহেতু তাঁর ঠাকুমা দ্বিতীয়পক্ষের সহায়তায় নাতির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। সমস্ত ঘটনার বিচারে প্রমানিত হয় যে, এই জমিতে কোনো বিবাদ না থাকায় আমি এই রায় দিচ্ছি যে যেহেতু প্রকৃত মালিকের থেকে জমি কেনা হয় সে কারণেই প্রথমপক্ষ এই জমির স্বত্বাধিকারী।"

তৃতীয় ভাগ ঃ কিশ্‌তওয়ারি জরিপ-পরবর্তী সামাজিক রদবদল

১. গ্রামে সামাজিক বিরোধের পরিব্যাপ্তি

কিশ্‌তওয়ারি জরিপের সমীক্ষা-সংলগ্ন নথির যতখানি গভীর পর্যালোচনা বর্তমান নিবন্ধে রয়েছে, ঠিক তেমন বিন্যাসে সংশোধনী বন্দোবস্ত এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নথিপত্র গাঁথা গেল না। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এই কারণেই সংশোধনী বন্দোবস্ত আর রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ পর্বের দলিল-দস্তাবেজের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা এবং কর ঠিক করার জন্য যে জমি-জরিপ সমীক্ষা, তার পরবর্তী রদবদলগুলোতে বর্তমান নিবন্ধের চৌহাদ্দিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেঁধে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ হবে।

সংশোধনী বন্দোবস্তের খতিয়ান থেকে এক নজরে যা বোঝা যায়, তাহল, মালিকানার অনবরত বিভাজন তার প্রাকৃতিক আবর্তনের একেবারে প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এইখানেই মনে পড়ে ব্রহ্মচর্যের পক্ষে অশ্বিনীকুমার দত্তের সওয়াল। জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কোনো নিঃস্বার্থ কর্মী হিসাবে একজন ব্রহ্মচারীর ভূমিকা যে কী হতে পারে — এই ছিল অশ্বিনীকুমারের বক্তব্যের মূলকথা। তিনি বলেছিলেন,"তুচ্ছ ঘরোয়া বন্ধনে যদি বাঁধা থাকেন কেউ, তবে কীভাবে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করবেন জাতির মুক্তির মতো বিরাট লক্ষ্যের পূর্তিকল্পে?" অথচ বিষয়টিকে যদি স্থানীয় প্রেক্ষিতে দেখি, এমন ভাবনা এড়ানো যাবে না যে, এই আত্ম-অবসর পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের উত্তরাধিকারী থাকার সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন অশ্বিনীকুমার; পুনর্বিভাজন থেকে তার পৈতৃক সম্পত্তি বাঁচিয়ে তা দিতে পারেন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

যে সময়সীমার মধ্যে এই পর্যালোচনার পরিধি সে-সময়ে এক সক্রিয় প্রজা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। আর প্রজাদের বিভিন্ন দাবি প্রকাশ পেয়েছিল জমিদারি বন্দোবস্তোর বিলোপ-সাধনের মতো এক সর্বজনিন চাহিদায়। হরহরের উপরে তার প্রভাব পড়েছিল। একটা মতপার্থক্য এখানে খুব বড় হয়ে উঠল কায়স্থ এবং নমশূদ্র প্রজাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে ধোপা প্রভৃতি অন্যান্য নিম্নবর্ণের লোকেদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এই পরিস্থিতিতে মধ্যবর্ণের বারুইরা ছিলেন আবার কায়স্থদেরই পক্ষে।

সময়ের বিভিন্ন তরঙ্গের অন্তর্বর্তী ব্যবধান এমনি যে সুদীর্ঘকালব্যাপী সেই প্রক্রিয়ার পুণর্নির্মাণ কার্যত অসম্ভব। অথচ ওই প্রক্রিয়ার যোগসাজশেই উল্লিখিত মতভেদের কার্যকারণ নির্দেশ করা যায়। সবচেয়ে পুরানো প্রমাণ যা শনাক্ত করা যায়, তা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সমকালীন। বাংলায় বিধানসভার এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে পটুয়াখালি কেন্দ্রে এ. কে. ফজলুল হক এবং নিজামুদ্দিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভূত গুরুত্ব পায়। নথিভুক্ত করবার মতো বিষয় হল, গৌরনদী থানা সংলগ্ন এলাকায় নমশূদ্র উকিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং যশস্বী অশ্বিনীকুমার দত্তের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সরলকুমার দত্তের মধ্যে প্রবল রেষারেষি দানা বাঁধে। উত্তপ্ত প্রচার, আর তা থেকেই ভোটগ্রহণের সময় দত্তবাবুর গোষ্ঠী আর নমশূদ্রগোষ্ঠী যাঁরা চলতি কথায় 'নমো' অভিধায় চিহ্নিত — তাদের মধ্যে জোর মারদাঙ্গা লেগে যায়। আর তার পরেও নির্বাচনক্ষেত্র

থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল জয়ী হন।

এই খবরটি কয়েকজন নমো গ্রামবাসীর কাছে পাওয়া। ওই একই সূত্র পরবর্তী বিবরণসমূহের ভিত্তি। আর গ্রামবাসীদের মুখের কথায় যেমনটা সচরাচর ঘটেই থাকে, যে, সব ঘটনার দিনক্ষণ হয় পুরোপুরি লোপাট, না-হয় তো সেই তারিখ ঐতিহাসিক নথিপত্রে ব্যবহারের পক্ষে বড় বেশি অনিশ্চিত। হাতে তথ্য পরিসংখ্যান যেটুকু আছে, নানান্ উপায়ে সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। সুতরাং ওই তথ্যের সূত্রে যে কাহিনী এখানে নথিভুক্ত হল, তা খোলা রইল সবরকম ভবিষ্যৎ সংশোধনের জন্য। একটা কথা পর্যালোচনার পক্ষে জরুরি যে এই কাহিনীর সংলগ্ন স্মৃতি এতখানিই স্নেহাসিক্ত যে, সে গল্প যেন পরিণত হয় এক ধরনের অর্ধ-পৌরাণিক রূপক-আখ্যানে।

গৌরনদীতে নির্বাচনি প্রচারের সময় জিতেন্দ্রনাথ তালুকদার, বিপিনবিহারী সিংহ, রামকৃষ্ণ মণ্ডল আর হরলাল মিস্ত্রির মতো মানুষ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন নমশূদ্র তথা সাধারণের মুখের কথায় নমো সমাজকে পথ দেখাতে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যেহেতু বাংলা সরকারের মন্ত্রি-পদের মনোনয়ন পেলেন, এই অঞ্চলের বর্ণহিন্দুরাও নমোদের বিরুদ্ধে একজোট হলেন। নমোদের প্রতি নিদারুণ বিরক্তি তাঁদের। অবস্থা সামাল দিতে বাটাজোর অঞ্চলের নমোরা আমন্ত্রণ জানালেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে; আর আয়োজন করল এক বিশাল জনসভার; সভা হবে দেওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিদ্যালয় শিক্ষক বিপিনবিহারী সিংহের বাড়ির লাগোয়া ঘেরা জমিতে।

সেই জনসভায় নমো গ্রামবাসীরা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে জানিয়েছিলেন অঞ্চল-ব্যাপি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কথা। প্রত্যুত্তরে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল আলোচনা করলেন গীতা, উদ্দেশ্য — তাঁদের শান্তি ফেরানো। তাই তাঁর নির্দেশ-অনুযায়ী, বিভাজন-যোগ্য দুটিমাত্র পৃথক জাতির অস্তিত্ব আছে — আর্য এবং অনার্য। যাঁরা ঈর্ষাকাতর, স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর, তাঁরা অনার্য, অসুর। অন্যদিকে আর্যরা — কথায় এবং কর্মে যাঁরা যথার্থ। এরকমই যোগেন মণ্ডলের বক্তব্য। বর্তমান দুনিয়ায় সামাজিক বিভাজনের কোনো দ্বিতীয় মানদণ্ড প্রাসঙ্গিক নয়। তাই নমো সমাজকে তিনি উপদেশ দেন আর্যপক্ষে থাকতে। বাটাজোরের অনুকরণে অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের জনসভা চলল। কিছুদিন পরে যোগেন্দ্র মণ্ডল পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে; আর এই অঞ্চলের রাজনীতি এক অস্বস্তিকর মোড় নিল। যদিও মনোরঞ্জন ধুপী (জাতিতে ধোপা), হীরেন দত্ত (কায়স্থ), বেণু মুখোপাধ্যায় (ব্রাহ্মণ) এবং অন্যান্যরা নমোদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তবু নমোদের অবস্থার অবনতি ঠেকানো যায়নি। অনেকসময়েই তাঁরা অসম্মানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

মীমাংসার উদ্দেশ্যে সম্মুখসমরে আহ্বানকারী নিম্নবর্ণের মানুষ; এবং আত্মরক্ষা-কল্পে পরিপূর্ণ নিবেদিত উচ্চবর্ণের মানুষ। এই দুই পক্ষের পরস্পর সামাজিক বিরোধের ঘূর্ণিস্রোতের অভ্যন্তরে প্রাণ হারালেন এক বিধুবাবু। নিম্নবর্ণের মানুষদের পাশে দাঁড়ানোটাই তাঁর অপরাধ। ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এই ঘটনার মিল বিস্তর। হত্যার অভিযোগ আনা হল মনোরঞ্জন ধুপীর বিরুদ্ধে এবং যথানিয়মে মামলা রুজু হল তাঁর নামে। যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ না-থাকার সুবাদে তিনি বেকসুর খালাস পেলেন।

পুজোর ছুটির মধ্যে কখন যেন, মোটামুটি এইরকম সময়ে বিদেশ থেকে ফিরলেন এক তরুণী ডলি দত্ত, দুর্গাপুজোয় যোগ দেবেন বলে। ফুলরেণু দত্ত নামে তিনি আরো বেশি পরিচিত। রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা তিনি, রায়বাহাদুর দ্বারিকানাথ দত্তের পৌত্রী। স্নাতকোত্তর খেতাব পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়া কলকাতায়, আর সোরবোন থেকে পেয়েছেন ডি. লিট উপাধি। নাট্যামোদী তিনি, প্রস্তাব দিলেন, পুজোর পরে *রাবণ বধ* নাটক করবার। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের দায়িত্ব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার জন্য একটা পরীক্ষামূলক মহড়ার ব্যবস্থা হল। স্থির হল, ডলি নিজে মন্দোদরীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন আর মনোরঞ্জন ধুপী সাজবেন রাবণ। শিক্ষিত বারুইরা, যাঁরা নিজেদের ভাবেন সংস্কৃতিতে অগ্রাধিকারী, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁদের জমিদারের উচ্চশিক্ষিতা কন্যার মুখের উপরে এ-অসন্তোষ প্রকাশ করা গেল না। বরিশাল থেকে তিনজন মাস্টারকে আনা হল, মহড়ায় দলটিকে পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে। মনোরঞ্জনকে রাবণের ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করতে বিরোধীপক্ষ দাবি তুললেন যে, একমাত্র তারাই মঞ্চে উঠতে পারবে, যাদের নিজের পোশাক নিজে কিনবার ক্ষমতা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা গেলেন মনোরঞ্জন, কিনে ফেললেন এক প্রস্থ জাঁকালো পোশাক। চ্যালেঞ্জের মুখে মনোরঞ্জনের দ্রুত প্রত্যাঘাত থমকে দিল বিরোধীদের। মহড়ার চারদিন পরে নাটক মঞ্চস্থ হলে, অসাধারণ অভিনয়ের জন্য মনোরঞ্জন প্রশংসাও পেলেন।

পরের ঘটনা 'সিনেমা কেলেঙ্কারি'। গ্রামবাসীদের একজনের মতে এ-ঘটনা ঘটেছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দ। মনোরঞ্জন ও তার বন্ধুদের পরিকল্পনা ছিল, বাটাজোর বাজার এলাকায় একখানা বাড়ি নিয়ে সেখানে সিনেমা দেখাবেন। প্রয়োজনীয় মূলধনের আধাআধির দায়িত্ব নমোরা নিতে রাজি হন। সিনে-প্রোজেক্টার কেনার জন্য জনৈক ব্যবসায়ীকে বায়নার টাকা দেওয়া হল। প্রাথমিক প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের পশ্চিমের বাড়ির একখানা আটচালা ঘরে (আট ছাদওয়ালা দেওয়ালবিহীন খড়ের বাড়ি) চলচিত্র প্রেক্ষাগৃহ বসাল বিরোধীপক্ষ।

এক প্রবীণ নমশূদ্র প্রত্যক্ষদর্শী মনে করতে পারেন যে, মনোরঞ্জন আর তাঁর মুখ্য সহকারী বিপিনবিহারী সিংহের মুখ রাখতে, তফশিলি কার্যালয়ে একটি সভা হয়েছিল। প্রাথমিক প্রস্তাব যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের একজনের ছেলের কাছে জানলাম, এ-কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়। শোনা যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত একসময় হা-হুতাশ করেছিলেন — ছোটলোকদের জন্যই প্রেক্ষাগৃহটি দাঁড় করানো গেল না। স্বভাবতই এই মন্তব্যে তাঁর অবাধ্য প্রজারা ক্ষুব্ধ হন। এরকম সময় দিয়ে একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি ষাঁড় মনোরঞ্জনের বাড়ির লাগোয়া বাগানে ঢুকে পড়ে। লোকেরা সেখানে ষাঁড়টাকে বল্লম নিয়ে আক্রমণ করে। সেটি পালিয়ে ভূস্বামীর জমিতে ফিরে আসে এবং সেখানেই মারা যায়। ক্রোধে আগুন ভূস্বামী বলেন, তাঁর জমিতে মনোরঞ্জনকে তিনি আর পা ফেলতেই দেবেন না। মনোরঞ্জনের পরিস্থিতি এমন নয় যে বড় রাস্তা থেকে জমিদারের জমি সংলগ্ন পথ না-পেরিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারেন। এই অসুবিধার কথা শুনে, বিপিনবিহারী সিংহ নিজের বর্ণসম্প্রদায়ভুক্তদের একত্রে ডেকে, রাতারাতি নিজের জমির উপর দিয়ে

রাস্তা বানিয়ে দিলেন। সে-পথ মনোরঞ্জনের বাড়ি আর বড় রাস্তার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হয়ে রইল। এই ঘটনায় জড়িত মানুষেরা কেউই আজ আর নেই। কিন্তু পথটি এখনো আছে সর্বসাধারণের ব্যবহার্যের উপমায়।

ঘটনা পরম্পরা চরমে উঠল ১৩৫২ বা ১৯৪৫-৪৬ সাল নাগাদ। পনেরো বছর আগে চন্দ্রহার গ্রামে ১.২ একর বিটা জমিতে বারুইরা পানবরজ বানিয়েছিলেন। চুক্তি ছিল পানের টাকায় খাজনা দেবেন তাঁরা। সে-বছর এমনি দুর্বিপাক যে শ্রাবণ বা জুলাই-আগস্ট মাসে জলের মাত্রা অস্বাভাবিকরকম বাড়ল, নষ্ট হল পানগাছ। আর ভাদ্র বা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় বরজের আর কিছুই রইল না। বরজ যতক্ষণ মাটির উপরে থাকবে, চুক্তি অনুযায়ী ততক্ষণ বারুইরা খাজনা দিতে বাধ্য। কিছু গরিব মালে (দ্রাবিড়ের কৃষিজীবীগোষ্ঠী) তাঁদের দিনমজুর খাটতেন। রুজির উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানালেন গ্রামের নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে। অবিলম্বে বিপিনবিহারী সিংহ এবং মনোরঞ্জন ধুপী চার গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করতে সঙ্ঘের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে গেলেন। আশ্বিন বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মালেরা মুলো লাগিয়েছিলেন। অগ্রহায়ণ বা অক্টোবর-নভেম্বর মাসের এক রাত্রে বারুইরা সেই জমির সিকিভাগ জুড়ে বরজ তুললেন। প্রতিবাদে মালেরা পুনরায় বিষয়টি নিয়ে গেলেন বিপিন আর মনোরঞ্জনের দরবারে। বিপিন - মনোরঞ্জন তাঁদের লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে, অর্থাৎ যেখানে তৈরি হচ্ছে বরজ, গিয়ে বরজের দফারফা করে এলেন। কদিন বাদে বারুইরা ফের বানালেন সেই বরজ। বিষয়টি দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের অবগতিতে আনলেন বিপিন-মনোরঞ্জনের দল। সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি অবশ্য তাঁদের বললেন যে, এ-ঘটনার উপরে তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিপিনের দলের সিদ্ধান্ত হল যে, সেই রাতেই তাঁরা আবার শেষ করে দেবেন ওই বরজের গঠন। দলমতের বালাই না মানা এক সুবিধাবাদীর সূত্রে এই সিদ্ধান্ত পৌঁছে গেল বারুইদের কানে। নিজেদের মধ্যে শলা পরামর্শ করে বারুইরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ডাকাই মনস্থ করেন। এখবরও গোপন থাকল না। দত্তদের পেয়াদা মহম্মদ আহম হাওলাদার বিপিনের দলের কাছে এই গোপন কথা ফাঁস করে দেন।

সেই রাতে প্রচণ্ড সংঘর্ষে এক পুলিশ প্রাণ হারায়। বিপিনের দল হাজারখানেক লোকসমেত অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। বারুইরাও এসেছিল পুলিশবাহিনী নিয়ে। ততক্ষণে জমায়েত হয়ে গেছে সেই নিম্নবর্ণের গ্রামবাসীরা, যাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ চেহারাটার মুখোমুখি হতে বারুইরা ভয় পান, পুলিশবাহিনী নিয়ে পিছু হটলেন তাঁরা। সেই জায়গা থেকে খনিকটা পিছিয়ে গুলি চলায় পুলিশ। নিম্নবর্ণের দল সেই গুলির জবাব দিল সঙ্ঘবদ্ধ আর্তনাদ - উল্লহ। এই ধ্বনির তোড়ে ভয়ার্ত বারুইরা সরে গেল অকুস্থল থেকে। ভোর তিনটে নাগাদ তিনজন বারুই ধরা পড়লেন। পরে অবশ্য তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হল নিজের নিজের বাড়িতে — তিনজনের একজনেরও গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। বিজয়ী গ্রামবাসীরাও চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে যার বাড়ি ফিরল।

একটা কথা নমো গ্রামবাসীরা আজও বিশ্বাস করেন। বিশৃঙ্খলার ভিতরে জান খুইয়েছিলেন যে পুলিশটি, তার মৃত্যু নাকি হয় প্রভাবশালী পাঁচ বারুই ভাইয়ের দলটার

কোনো একজনের হাতে। ওই ভাইদের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল, অপরাধে নমোদের ফাঁসিয়ে দেওয়া। যাই হোক, জোর অনুসন্ধান চালান হল প্রকৃত অপরাধীকে ধরবার জন্য। পরদিন সকাল আটটা নাগাদ দলনেতার প্রযত্নে পুলিশের একটি দল চারটি পৃথক গাড়িতে চেপে বরিশাল থেকে উপস্থিত হলেন, ঘিরে ফেললেন বাটাজোর বন্দর এবং গ্রেপ্তার করলেন বিপিনবিহারী সিংহ আর কার্তিক সরকারকে (কার্তিক আমাদের মুখ্য সংবাদ-দাতাদের একজন)। তাঁরা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন অকুস্থলে। এই ঘটনায় বাজারজুড়ে আতঙ্ক নেমে এল।

মহম্মদ আহম হাওলাদার গুপ্তচর পাঠালেন খবরটা নিম্নবর্ণের নেতাদের জানাতে। অন্যদিকে লাল পাগড়ি অর্থাৎ পুলিশবাহিনী এসে পড়ল বাটাজোর আর গৌরনদী থেকে, যোগ দিল বরিশালের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে। উচ্চবর্ণের যুবকরা পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘেরাও করল বাটাজোর আর চন্দ্রহার, সঙ্গে ছিল গ্রামের মানুষদের উপরে লুটতরাজ হিংসার হামলা। এই দৌরাত্ম্যের শিকার হয়েছিলেন সবাই — নারী-পুরুষ, সাবালক-নাবালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে। ছয় কি সাতজন ধরা পড়ে। যাঁরা গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের উপরে তিনটে নাগাদ পুলিশ শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। ঘন্টা দুয়েকের ভিতরে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, নির্যাতিতদের কেউ কেউ মৃত্যুর কিনারে পৌঁছে যান। এরই মধ্যে সোনামুদ্দিন মিয়া, সিরাজ মিয়া, মেনাজুদ্দিন মিয়া, বীরেন দত্ত, বেনুগোপাল মুখোপাধ্যায় আর মহেন্দ্র ঠাকুরের মতো সমর্থকেরা লোকেদের অনুসন্ধান করতে থানায় যান; এবং সমগ্র ঘটনার পর্যবেক্ষণে, দুর্নীতির অভিঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়েন, তারা সরাসরি চলে যান মাফিজুদ্দিন সাহেবের কাছে। ওই এলাকার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন মাফিজুদ্দিন। তাঁকে জানানো হল পুলিশি অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ। সঙ্গে সঙ্গে মাফিজুদ্দিন গেলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে, তাঁকে বললেন, একজন অভিযুক্তকেও যদি হত্যা করা হয়, বিপদে কিন্তু পড়বেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। অতঃপর তিনি যান পুলিশ ফাঁড়িতে, উদ্দেশ্য ছিল, যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া। দেখলেন, তাঁরা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন। পরের দিন ভোর দুটোর আগে পর্যন্ত মানুষগুলোর জ্ঞান ফেরেনি, তাঁদের যথাযথ চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বেশ কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে হীরেন দত্ত আর বেণু মুখোপাধ্যায় আবার গেলেন নলচিলা গ্রামের সৈয়দ মিয়া সাহেবের কাছে। পরিস্থিতিটা জানালেন তাঁকে। সহমত-সমবেদনা জানালেন সৈয়দ সাহেব, আর কার্তিক সরকারকে বিপদ থেকে বাঁচাতে তাঁর আত্মগোপনেও সহায় হলেন। সাহেবের পায়ে পড়ে কার্তিক তার ভাইয়ের (বিপিনবিহারী সিংহ) প্রাণ বঁচানোর প্রার্থনা করল। তাঁকে সৈয়দ সাহেব বার্তাসহ পাঠালেন বরিশালে, স্থানীয় আদালতের মোক্তার জগৎবন্ধু পাণ্ডের কাছে, যাতে সেই সংবাদ তারযোগে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কাছে পৌঁছে যায়। শেষপর্যন্ত জগৎবন্ধু আর যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৈয়দ সাহেব গেলেন পুলিশ ব্যারাকে এবং এই নীতিবিরুদ্ধ দৌরাত্ম্য বন্ধের দাবি করলেন।

অতঃপর সৈয়দ সাহেব গেলেন বাটাজোর, সরেজমিনে সেখানকার অবস্থা বুঝতে। মাফিজুদ্দিনের বাড়িতে থাকতেন তিনি, আর রাত্রে প্রতিটি বাড়িতে যেতেন খাদ্য, বস্ত্র, এবং ঔষধ নিয়ে। পুলিশি দৌরাত্ম্য কিন্তু পরের দিনও চলল। আর বরিশালের জগৎবন্ধু

পাশে প্রতি দুঘন্টা অন্তর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। কার্তিক সরকার গেলেন ভুরঘাটা গ্রামে, বরিশাল আর ফরিদপুরের সীমান্তে। যেখানে নমশূদ্র বসতির ঘনত্ব বিশেষ লক্ষণীয়। কার্তিক সেখানে ত্রাণ সংগ্রহ করলেন। ছ'দিন বাদে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বরিশাল পৌঁছলেন আর সোজা বাটাজোর গেলেন জগৎবন্ধুর সঙ্গে। বিপিন এবং মনোরঞ্জনকে অর্ধমৃত পড়ে থাকতে দেখে তাঁর চোখের জল বাঁধ মানল না। পুলিশকর্তাকে ডেকে তিনি বলেন, "আমি চাই, আপনি আপনার নিজের কর্তব্যে ফিরুন। অভিযুক্তদের আমি বরিশালে নিয়ে যাব আমার নিজের দায়িত্বে। বিপদ ডাকতে যদি না-চান, তো মারদাঙ্গা থামান।" যোগেন্দ্র মণ্ডলের আগমনবার্তা শুনে নিম্নবর্ণের নেতা এবং সমর্থকরা মিছিল করে বাটাজোর এলেন। তাঁর উপস্থিতিতে বিপিন এতখানিই অভিভূত হলেন যে, তাঁর পা ধরে কেঁদে ফেলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মনোরঞ্জনের মনে ও প্রাণে বাঁচার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অসংগত আচরণের শিকার হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের চিকিৎসার জন্য বরিশাল থেকে ডাক্তার আনতে চাইলেন যোগেন্দ্র মণ্ডল। তিনি নিজেই সমর্থকদের নিয়ে টহল দিতেন পাড়ায়; যে গ্রামবাসীরা পুলিশি দৌরাত্মের দুর্ভোগের শিকার, তাঁদের ক্ষত প্রশমিত করা, তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, তাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সে-রাতে যোগেন্দ্র মণ্ডল বিপিনের কাছে ছিলেন আর পরদিন সকাল নটায় ছাপান্নজন বন্দীর মধ্যে পুলিশভ্যানযোগে চল্লিশজনের স্থানান্তর ঘটল বরিশালে। বিচারের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তায় রাখা হল তাঁদের। অভিযুক্তদের মধ্যে আহত যাঁরা তাঁদের একটি হাসপাতালে পাঠানো হল। সেখানে যোগেন মণ্ডলের ডাক্তার তাঁদের চিকিৎসা করলেন। সৈয়দ সাহেব গোটা সময়টাই যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে ছিলেন। পরিচিত এক কারারক্ষীকে সৈয়দ সাহেব নির্দেশ দিলেন, বন্দীদের মধ্যে যাদের অপরাধ প্রতিপন্ন হয়নি, তাঁদের প্রতি আচরণে যেন সতর্ক হন তিনি। সেই সন্ধ্যায় যোগেন মণ্ডল স্টীমারযোগে ফিরে এলেন কলকাতায়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের এক দক্ষ ব্যারিস্টারকে বাটাজোর পাঠান যোগেন্দ্র মণ্ডল, ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করতে। অভিযুক্তদের পক্ষে বরিশাল আদালতে তাঁর অসামান্য সওয়াল আজও নমো সম্প্রদায়ের মনে আছে। শেষপর্যন্ত সব অভিযুক্তই নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেকসুর খালাস পেলেন। ছাড়া পেলেন জেলখানা থেকে। হাজারে হাজারে মানুষ বরিশাল গিয়েছিলেন তাঁদের ফিরিয়ে আনতে। বরিশাল অভিমুখে সেই গর্বিত পদযাত্রায় আনন্দমুখর ধ্বনির অনুরণন — এ এক স্মরণীয় ঘটনা, উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। একই সঙ্গে আবার এই ঘটনা দেশভাগের পূর্বলক্ষণ — পরের বছরেই যে দেশভাগ ঘটেছিল।

২. দেশভাগ-পরবর্তী সামাজিক রদবদল

দেশভাগের অনুক্রমে বহির্গমন ঘটল বহু বর্ণহিন্দুর। দত্তদের মতো উচ্চশিক্ষিত ভূস্বামী পরিবার অনেক আগে থেকেই নিজেদের প্রায় স্থানান্তরিত করেছিলেন কলকাতায় অথবা ভারতের অন্য কোনো নগরাঞ্চলে।

একবারের মতো এবং বরাবরের জন্য পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে

বিষাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়, তবু সেই বিষাদ থেকে তেমন কোনো বিকল্পের সন্ধান পাননি তাঁরা। বহির্গমনের গতি দাঙ্গার কারণে বেড়ে থাকতে পারে; তবে তার বিস্তারিত বিবরণ যে যথেষ্ট তথ্যের অভাবে বর্তমান আলোচনায় গ্রথিত করা গেল না, এটা আমাদের পক্ষে আফসোসের।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে এক বাটাজোর বন্দরই দুবার কি তিনবার পুরোপুরি অথবা আংশিক ধ্বংস হয়েছে। যদিও ১৩০১ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪-৯৫) তার খোলটুকু ছাড়া আর কিছুই আগুন বাদ রাখেনি, দত্তদের প্রযত্নে তার পুনর্গঠন এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ দেশভাগের আগেই হয়েছিল। ১৯৪৭-এর পরে দ্রুত ধারাবাহিকতায় সামাজিক রদবদল ঘটে গেল। যে অশান্তি এই গ্রামীণ বাজারের উপরে এবং বাজারের কর্মকেন্দ্র থেকে সুদুর অঞ্চলের উপর নিজের ছাপ ফেলেছিল, সেই অশান্তির প্রতীকেই স্বল্প সময়সীমার মধ্যে বারে বারে বাজার ধ্বংসের ঘটনা উপমা পায়।

তখন থেকেই হরহরের পরিচয় হিন্দুগ্রাম বলে, যেখানে উচ্চবর্ণের স্থান নেই। আজ যদিও মুসলমানরা গ্রামের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এবং তাদের সংখ্যাগত প্রতিপত্তি নিয়তই ঊর্দ্ধমুখী, তবু আজও হরহর মূলত একটি হিন্দুগ্রাম।

আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে প্রাক্-দেশভাগ সামাজিক সংঘর্ষের প্রকাশ ঘটেছিল কায়স্থ আর নমোদের মধ্যে। মধ্যবর্ণের সম্পন্ন বারুইরা ছিলেন কায়স্থদের সহযোগী। নমোদের পাশে ছিলেন নিম্নবর্ণের ধোপারা। উচ্চবর্ণের সম্প্রদায় থেকে কিছু সমর্থন ছিল দ্বিতীয় পক্ষে। মুসলমান প্রতিবেশীরা নমোদের দিকে। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসাবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম প্রস্তাবিত হওয়ার মতো তথ্যে রাজনীতির বৃহত্তম পরিপ্রেক্ষিতের ইঙ্গিত মেলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নমশূদ্ররা মুসলিম লিগের হাতে হাত মিলিয়ে বর্ণহিন্দু কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে একযোগে সামিল হন।

সুতরাং দেশভাগের পরে একের পর এক কায়স্থ পরিবার ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। ওই অঞ্চলের আর মাত্র চারটি পরিবারের হদিস মেলে। অন্যদিকে, দেশভাগের প্রাক্কালে কায়স্থদের সঙ্গে আপাতসহযোগ সত্ত্বেও, বর্ধিষ্ণু বারুই সম্প্রদায়ের শিকড় এই মাটির এত গভীরে প্রথিত যে, গ্রাম থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা গেল না। গোপ আর মালাকারদের মতো অন্যান্য প্রভাবশালী হস্তশিল্পী সম্প্রদায়ও থেকে গেলেন।

উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের সদস্যরা গ্রাম ছেড়ে গেলেন, গ্রামের অবশিষ্ট অধিবাসীদের জন্য রেখে গেলেন উন্নততর জীবনযাপনের এক উত্তরাধিকার। গ্রামবাসীরা যখন নিজেদের সামাজিক পদমর্যাদা বাড়াতে চাইল, তখন তাঁরা অনুসরণ করলেন পূর্বতন ভূস্বামীদের জীবনযাত্রা। নিদর্শনস্বরূপ দেখতে পারি বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে মৃত পূর্বপুরুষদের জন্য সমাধিনির্মাণের প্রথাটির ব্যাপ্তি। হরহরে একটি প্রাচীন সমাধি আছে, যা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, হরনাথ দত্তের (দ্বারিকানাথের পিতার) মৃত্যুর পরে। চন্দ্রহারগামী পথের প্রস্থ-বৃদ্ধি প্রকল্পে যতদিন না ধ্বংস হয়ে গেল, ততদিন পর্যন্ত একটি সমাধি ছিল কালী দিঘির পূর্বতীরে ব্রজমোহন দত্তের (অশ্বিনীকুমারের পিতা) স্মৃতিতে। যেন মনে হয়, উনিশ শতকে দত্তরা ছাড়া আর কোনো পরিবার সমাধি স্থাপন করেনি। সম্ভবত ১৮৯০-এর বছরগুলির কোনোটিতে গুহরা তাঁদের ছোট ছেলের স্মৃতিতে একটি মনোজ্ঞ সমাধি

স্থাপন করেন। সেই ছেলেটি এক ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন প্রাণ হারিয়েছিলেন। বারুই আর গোপের মতো মধ্যবর্ণের মানুষরা পরিমিত আকারের সমাধি বানানোর রেওয়াজ চালু করেন গত শতকের তিন দশকের দ্বিতীয় অর্ধে। দেশভাগের পরে বণিক এবং যুগীর মতো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে সমাধি স্থাপনের রীতি শুরু হয়। এই সমাধিগুলোর গড়নে চারুত্ব কম, কিন্তু পেল্লায় তাদের কাঠামো। একটি অবস্থাপন্ন ধুপী পরিবারও পিতামাতার জন্য সমাধি বানিয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল, অঞ্চলের কোনো নমশূদ্র পরিবার এখনো এই প্রথা অনুসরণ করেননি।

সংস্কৃতায়ণের আর একটি নিদর্শন হল সিমেন্ট বাঁধানো ঘাট নির্মাণ। পূর্বোল্লিখিত পশ্চিমের বাড়ির একটি পুকুরে সিমেন্ট বাঁধানো সুষ্ঠু এক ঘাট ছিল বসবার ব্যবস্থা সমেত। একসময় ঘাট ছিল ভূস্বামী-পরিবারের পদমর্যাদার চিহ্ন; পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীরা ঘাট-তৈরির ব্যাপারটা বেশিরকম অনুসরণ করেন। এমন অনুকরণের এক অদ্ভুত উদাহরণ মেলে এক গোপবাড়ির সদর-দুয়ারে। সেখানে ঢুকবার পথের দু'ধারে দুটি সিমেন্ট বাধানো বেঞ্চি বসানো হয়, ঠিক যেমন চোখে পড়ে কোনো ঘাটে।

যদিও বেশিরভাগ বর্ণহিন্দু গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিলেন, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় সামগ্রিক-ভাবে হিন্দু জীবনযাপনের ধরতাইটাই যে শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেন, তা নয়, হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আদর্শও পেলেন তাঁরা। বিশেষত ১৯৮০-র বছরগুলিতে যে হারে মানুষ কপর্দকহীনতার দিকে যাচ্ছিল, সেই অনুপাতে কিছুসংখ্যক মসজিদ বানিয়ে (সারণি ঃ ১.৬) চতুষ্পার্শ্বের মুসলমান সম্প্রদায় বাড়াচ্ছিলেন ইসলামীকরণের কদর; স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ও সেইসময় একটি মন্দির (এক ধনী নমো কৃষকের বাড়ির লাগোয়া জমিতে একটি বৈষ্ণবমন্দির) আর এক পাকা আশ্রম (দেবপাড়াগ্রামে নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম) প্রতিষ্ঠা করলে, সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত হলে, তাঁদের ধর্মসংলগ্ন আত্মপরিচয় স্থিতি পায়। এখনো লোকধর্মের কিছু কিছু উপাদানের হদিস মেলে। যেমন কুমারী মেয়েদের ব্রতপার্বণ উদ্‌যাগন, সঙ্গে আলপনা দেওয়া; আছে বাস্তুপূজার মতো বাৎস উৎসব; আবার মনসা পুজো, ঢেঁকিতে চক্ষুদানের মতো প্রথা বিরল হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ শাদা কথায় বলতে গেলে, লৌকিক বিশ্বাসের হাল আজ ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমশই সে বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য চাপা পড়ে যায় গোঁড়া হিন্দুধর্মের নিয়মমাফিক ব্যবস্থার আবর্তে।

গ্রাম ও গ্রামসংলগ্ন এলাকা সবচেয়ে বড় মাপের যে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে, সে ক্ষতি সংশ্লিষ্ট ছিল মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আওয়ামি লিগের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা। সুতরাং স্বাভাবিক যে, হিন্দু গ্রামবাসীদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামি লিগের জবরদস্ত সমর্থক। লিগের আঞ্চলিক শাখার নির্বাহী পদগুলিতে অবশ্য তাঁরাই বহাল ছিলেন, যাঁরা মুসলমান হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন। মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত এক ব্যবসায়ী সভাপতির ভার নেন আর এক সাবেকি মাতব্বরগোছের, দু'জন হলেন সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ। তবু তাঁদের প্রভাবও ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হওয়া সাধারণ প্রবণতা থেকে হিন্দুদের তফাতে রাখতে পারেনি। বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তুলনায় বেশি নিরাপদ জায়গায়

— অর্থাৎ কোনো প্রত্যন্ত এবং সুরক্ষিত গ্রামদেশে অথবা ভারতের পশ্চিমবাংলায়। হরহর যেহেতু ট্রাঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়মিত অবস্থানের পক্ষে সেস্থান আকর্ষণীয়। আশেপাশের পরিস্থিতি-পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে একান্তই সীমিত জ্ঞানের সুবাদে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গ্রামবাসীদের ক্ষতি একটা মাত্রার অতিরিক্ত করতে পারত না যদি তারা না পেত স্থানীয় কিছু সুযোগের নির্দেশ। ওই সুযোগ সন্ধানীরা আবার তৈরি করে ফেললেন রাজাকার বাহিনী — এক সহযোগী সামাজিক শক্তি।

মুক্তিযুদ্ধ হরহরের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছিল। জাগতিক ক্ষতির মাত্রা যথেষ্ট বেশি। বাড়িঘর, বিশেষত অবস্থাপন্ন বারুইদের আর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি লুঠতরাজ হয়েছে, আগুনে পোড়ানো হল বাড়িঘর। গ্রামের ভিতরে এবং বাইরে কোনোরকম বাছবিচার ছাড়া হিন্দুদের হত্যা করা হল। নির্দিষ্ট স্থানে তিরিশজন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, তাকে মনে রাখা হয় মরা ভিটা নামে। জায়গাটা হল পুকুর (দাগ নং ৩০৪) এবং একটি পান বরজের (দাগ নং ৩০৬) মধ্যবর্তী এক ফালি জমি। উঁচু উঁচু গাছে ঢাকা পুকুরপাড়ে হিন্দুগ্রামবাসীরা পরিখা কাটত। যখন পাকবাহিনী কাছে-পিঠে আসত, নিজেদের তারা লুকিয়ে ফেলত পাতা, ডালপালার আবরণে ঢাকা ওই পরিখাতে কিন্তু রাজাকাররা তাদের অবস্থান বিষয়ে অবগত হয়ে, পাকবাহিনীকে সেই জায়গার হদিস দিল। পাকবাহিনী সরাসরি গুলি চালাল পাতায় ঢাকা পরিখার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে পরিখা রূপান্তরিত হল রক্তাক্ত কবরে। একজন গ্রামবাসী আমাকে বলেছিলেন যে, এখানে মাটি খুড়লে সহজেই বেড়িয়ে আসে মানুষের হাড়। শুধু হিন্দু নয়, যেসব মুসলমান স্বাধীনতার পক্ষে তারাও পাকবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য। একটি মুসলমান পরিবারের এক সদস্য দলত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের কুঁড়েঘরে বাঁশের দেওয়ালে বুলেটের দাগ এখনো রয়েছে। অন্যদিকে তৈরি হয়েছিল হিন্দুদের আত্মরক্ষা সমিতি, যাকে বলা হতো সর্বহারা। রাজাকারদের মধ্যে যারা খুব বাড়াবাড়ি করত, তারা ওই হিন্দু আত্মরক্ষা সমিতির প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হতো। যেসব প্রভাবশালী মুসলমান অসৎ উপায়ে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়েছেন, তাঁদের কাছে ওই সর্বহারা সমিতি আতঙ্ক বিশেষ। এক দুর্বৃত্ত রাজাকারের পরিবারের কয়েকজন সদস্য খুন হয়েছিলেন। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ওই রাজাকার গ্রাম থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন এবং দশবৎসর স্বেচ্ছানির্বাসনের পরে এই সবেমাত্র গ্রামে ফিরেছেন।

লক্ষ্যণীয় যে এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী এবং পাকবাহিনীর নিয়মিত সংঘর্ষ হতো। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো বাছবিচার ছাড়া অধিবাসীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করার পরে, এই অঞ্চলের কয়েকজন যুবক ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে আসেন এবং বিহারে ভারতীয় সৈন্যশিবিরে সামরিক শিক্ষা নেন। এইসব যুবক গ্রামে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছিল। ফিরে গিয়ে তারা মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে যোগ দেয়। ১৯৭১-এর অক্টোবর আর ডিসেম্বরে মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীর সাথে লড়ল, লড়াইয়ের অবস্থান ছিল বাটাজোর বাজার। শেষ যুদ্ধ তিনদিন দিনরাত চলেছিল। গেরিলাবাহিনী এক দোকান থেকে অন্য দোকান পেরতে পেরতে ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে, বাজারের ঠিক দক্ষিণ প্রান্তে সেতুর এপার থেকে ওপারে আড়াআড়ি রাখা কংক্রীটে বাঁধানো

শত্রুপক্ষের ক্ষুদ্র কেল্লার দিকে এগিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের পাঁচজন নিয়মিত সৈনিক সহ পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। মুক্তিবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের মধ্যে এই অঞ্চলের যারা তাঁরা বলেন, স্বাধীনতার যুদ্ধে ওটাই পাকবাহিনীর প্রথম আত্মসমর্পন।

বাংলাদেশের স্বাধীতার পরে, আরো মুসলমানরা ছোট ছোট আবাসযোগ্য জমি কিনে হরহরে স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত শুরু করলেন। উত্তরে ইরি (IRRI) ব্লকের মালিকানার সাধারণ ঝোঁকটার উদাহরণ মেলে। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষও এই গ্রামের সামাজিক রদবদলকে ত্বরান্বিত করল।

৩. টিঁকে থাকার সমস্যা

১৯৮০-র বছরগুলিতে, মনে, হয়, উৎপাদনের রীতিতে প্রবল পরিবর্তন এসে গেছে। এমন মন্তব্যে অত্যুক্তি হবে না যে, হরহর তখন টিঁকে থাকার সমস্যার মুখোমুখি।

জনসংখ্যার চাপ থেকে রেহাই পেতে গ্রামবাসীরা কী কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সেই আলোচনায় খানিকটা স্পষ্ট হবে যে, টিঁকে থাকার লড়াইটা কোন পর্যায়ে আছে।

১. গত পঁচিশ বছর ধরে হরহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার নথিভুক্ত হয়েছে, সে হার এতটাই নীচু যে, তাকে নিয়মবহির্ভূত বলা চলে। গৌরনদী থানা এলাকার মোট জনসংখ্যা ১৯৬১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ৪৪ শতাংশ বেড়েছে। সেখানে হরহরের জনসংখ্যা ১৯৬১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বেড়েছে মাত্র কুড়ি শতাংশ। যে তথ্যে আরো অবাক লাগে, তাহল, হরহরের জনসংখ্যা ১৯৬১-তে যা, তা ওই জায়গার ১৯০১ সালের জনসংখ্যার সঙ্গে মোটামুটি অভিন্ন (১৯০১-এ ৬৪৯ আর ১৯৬১-তে ৬৯২)।

এই অস্বাভাবিক ঘটনার মূল কারণ হিসাবে ধরা হয়, ভারতের উদ্দেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিপুল বহির্যাত্রাকে।

তার সঙ্গে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সমকালীন সামাজিক আলোড়ন। সেই যুদ্ধে কমপক্ষে সাতাশজন গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছিলেন। একটা কথা অবশ্য এখানে যোগ করা যায় সীমান্ত পেরনোর চলটা হিন্দুদের মধ্যে চিরকালই আছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতির গ্রামীণ জীবনে গ্রামের মানুষদের ভিতরে হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো সরল বিভাজনের ধারণা মেলে না। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবুও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধের সমকালে হিন্দুদের পুরোপুরি অসহায় দেখিয়েছিল আদৌ ভাবা যায়নি যে, কোনো সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তার অবস্থা তাদের রয়েছে। তারই ফলস্বরূপ ১০৬টি খানার মধ্যে ৪১টি খানার অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ পরিবারবর্গ আছেন ভারতে, যেখানে তাঁদের আশ্রয় নিয়ে প্রস্তুতির অথবা নিশ্চিতির কোনো ঘাটতি নেই।

এই সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রামটির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনেকখানি সহায় হয়েছিল। একজন বণিক তো খোলাখুলি স্বীকার করলেন যে, তাঁর ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার স্বীকৃতি অর্জন করবার পরে, তাদের একে-একে ভারতে পাঠানোর জন্য যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তার অতিরিক্ত কিছু করা তাঁর সাধ্যাতীত। পাশাপাশি অর্থসঞ্চয় করেছিলেন তিনি, ব্যবসায়ী হিসাবে নিজে ভারতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কোনো নির্দিষ্ট পরি-

স্থিতিতে আচরণের এই ধরন যতটাই যুক্তিসংগত হোক, মুসলমান স্বদেশবাসীদের মনে সে আচরণ সন্দেহ এবং ক্রোধের সঞ্চার ঘটাবেই। বস্তুত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকেই একটা ধারণা লালন করেন; বাংলাদেশের অর্থ এবং মানবসম্পদ হিন্দুদের প্রযত্নে ভারতে এসে পড়ে। এই আগমনেই বাংলাদেশের সম্পদের অনর্গল বহির্গমনের স্বরূপ। বাংলাদেশের দারিদ্রের জন্য এই বহির্গমন অনেকখানি দায়ী। আবার মুসলমানদের এমন ধারণায় হিন্দুদের ভয় বাড়ে; তাদের অর্থ এবং লোকজন ভারতে পাঠানোর প্রক্রিয়ায় বাড়তি গতি আসে। এ এমনি এক চক্রাবর্ত, যেখানে মন্দা কারণ সেই মন্দাই কেবল বেড়ে চলে।

সীমান্ত পেড়িয়ে ভারতে আসাই গ্রামীণ জনসংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ নয়। দারিদ্র এবং অশিক্ষিত মুসলমান যুবক ঢাকায় যায় রিক্সা চালানোর মতো কায়িক শ্রমের কাজে। মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম বেচবে, এমন মানুষ বানিয়ে তোলার সময়োপযোগিকতা আদৌ কোনো ব্যতিক্রম নয় হরহর।

আটের দশকের গোড়ার দিকে এক মুসলমান কৃষক দু'বছর কায়িক শ্রমের মজুর খেটেছিলেন বাহারিনে, বেশ বড়সড় অর্থই মজুরি পেয়েছিলেন তিনি। এই উপার্জন দিয়ে তিনি একটা বাড়ি আর জমি কিনেছিলেন। তারপর থেকে আবার তাঁর অবস্থা বদলের দিকে গেল আর তাঁর সাম্প্রতিক অর্থকরী পরিস্থিতি চাপ দিচ্ছে তাঁকে; আবার একবার মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রার সুযোগ সন্ধান করুক সে। কিন্তু ইতিমধ্যে তেলের দেশগুলোর হাল অনেকটা বদলে গেছে। নিজেও এমন অবস্থায় নেই যে, সহজ অর্থাগমের উদ্দেশে আবার পাড়ি দিতে পারবেন মধ্যপ্রাচ্যে। অন্য একজনের কথা; তিনি থাকেন কাতারে— ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে,তাঁর স্বামীর মাসিক সঞ্চয় ক্ষমতা দশহাজার টাকা।

বলাই বাহুল্য যে, দুজনের উপার্জনক্ষমতার যে ফারাক, তার উৎসে থাকে দ'জন মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্য। অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে নিজের নিজের সম্প্রদায় নির্বিশেষে মোটা মাইনের আধিকারিকের পদে নিযুক্ত আছেন কেউ সরকারে, কেউ বা ব্যাংকে আবার কেউ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে।

হরহরের মতো সংস্কৃতির নিরিখে অগ্রসর গ্রামে যাঁদের বাস, তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্প্রসারনের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি।

এখানে একটি বিদ্যালয় (বাটাজোর প্রাথমিক বিদ্যালয়) এবং একটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (অশ্বিনীকুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়) আছে। দুটি বিদ্যালয়ের একটিই খেলার মাঠ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন যেহেতু জাতীয় কোষাগার থেকে হয়, তাদের অবস্থা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক উন্নত। ফলে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তেরজনের মধ্যে আটজন বাড়িতে পড়িয়ে গড়ে ৩৫০ টাকা উপার্জন করেন। তাঁদের মাসিক বেতন গড়ে পাঁচশ কুড়ি টাকা মাত্র। দেখে অবাক লাগে যে, সাধারণ গ্রামবাসীরা ঐকান্তিক ভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ধারিত একজন শিক্ষক খুঁজছেন। গৃহশিক্ষকতা শুধুমাত্র জীবিকাবদ্ধ শিক্ষকদের রোজগারের উপায় নয়, কলেজের ছাত্ররাও বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করেন। এটা এমনি এক প্রক্রিয়া, যার সুবাদে সীমিত

সম্পদের পুনর্বন্টন হয় গ্রামবাসীদের ভেতরে; যার সুবাদে দরিদ্র পরিবারের ছাত্ররাও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

গ্রামে গুনতি করা ১৪৫টি খানার মধ্যে ৪৯টিতে কোনো ছেলেমেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায় না, সেখানে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের (৫ থেকে ১০ বছরের) কেউ নেই। চৌকিদারি সংগৃহীত তালিকায় ১০টি খানা নথিভুক্ত নয়। ১৩টি খানায় ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না। প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া অর্থনৈতিক বিভাজন অনুযায়ী এই খানাগুলির বিশ্লেষণে প্রকাশ ওই ১২ টি খানা দরিদ্রতম 'ক' বিভাগের তলায় অন্তর্ভুক্ত। বাকিরা পড়েছে বিভাগ 'খ'তে। সম্প্রদায় অনুযায়ী বিভাজন সাতটি হিন্দু এবং ছয়টি মুসলমান খানা দেখা যাচ্ছে।

সারণি : ৩.১ অর্থনৈতিক বিভাগ অনুযায়ী তালিকাভুক্তির বিভাজন

শ্রেণী	'ক'	'খ'	'গ'	'ঘ'	শনাক্ত করা যায়নি	বহিরাগত	মোট
১	৪	৭	৪	২	২	-	১৯
২	৮	৩	১	২	৫	২	২১
৩	৫	৩	৩	২	-	-	১৩
৪	৮	২	৩	৩	১	-	১৭
৫	৬	৪	১	২	-	১	১৪
৬	১	-	২	-	-	১	৪
৭	৩	১	৩	-	-	-	৭
৮	-	-	-	১	-	-	১
৯	১	-	২	১	-	-	৪
মাধ্যমিক	৫	১	৭	২	-	-	১৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অর্থনৈতিক বিভাগ 'ক' থেকে 'ঘ'-এর জন্য সারণি : ১.১১ দ্রষ্টব্য।

এই পরিসংখ্যানগুলি উন্মুক্ত গবেষণার বিবরণ (ফিল্ড নোট্স) থেকে পাওয়া। যদি তালিকাভুক্তির নথি-বইয়ের সঙ্গে তাদের তুলনা করি, তবে আরো বিস্তারিত ছবি ফুটে উঠবে। সারণি : ৩.১-এ দেখা যায়, তালিকাভুক্তির নথিবই অনুযায়ী ছাত্রের সংখ্যাকে অর্থনৈতিক বিভাগগুলিতে ভাগ করলে কী হয়। 'ক'-বিভাগে ৪০টি খানা দাবি করেছিলেন যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের তাঁরা বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু তালিকাভুক্তির নথিবইতে মাত্র ১৯টি খানার ছেলেমেয়েদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। এই পরিসংখ্যানই সারণি : ৩.২-এর ভিত্তি। লক্ষ্য করা দরকার যে গ্রামের উত্তরাংশের অধিবাসী ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ যায় একটি প্রতিবেশী গ্রামের বিদ্যালয়ে। কেউ বা নিকটস্থ বিদ্যালয়ে যাওয়াই শুরু করে একটু বেশি বয়সে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 'ক'-বিভাগে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের আধাআধিই বিদ্যালয়ের মুখ দেখে না।

প্রাথমিক স্তরের অকৃতকার্যের হার সাধারণত যতটা বেশি হয়, এখানকার শতাংশ অবশ্য তত উঁচু নয়। দেখা যায় যে, কিছু কিছু ছেলেমেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরে বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধারণের হার ৭৫ শতাংশের মতো হিসাব করা হয়েছে। পরিবারগুলির অর্থনৈতিক বিভাজনে সরাসরি কোনো স্পষ্ট ফারাক ফুটে বেরোয় না যেসব পরিবার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তারা নিজেদের লক্ষ্যে অবিচলিত থাকতেই বদ্ধ পরিকর হয়।

সারণি ঃ ৩.২ তালিকাভুক্তির দাবি এবং তালিকাভুক্তির নথির মধ্যে পার্থক্য

অর্থনৈতিক বিভাগ	'ক'	'খ'	'গ'	'ঘ'
বিদ্যালয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের তালিকাভুক্তির দাবি করেছে যেসব খানা (অ)	৪০	১৮	১২	৭
সেইসব খানার সংখ্যা যাদের ছেলেমেয়েরা তালিকাভুক্তির নথি বইতে বিরাজমান (আ)	১৯	৭	২	২
আ / অ শতাংশে	৪৭.৫	৩৮.৯	১৬.৭	২৮.৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অর্থনৈতিক বিভাগ 'ক' থেকে 'ঘ'-এর জন্য সারণি ঃ ১ ১১ দ্রষ্টব্য।

ছাত্র সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে এক তীব্র ব্যবধান রেখা চোখে পড়ে। তুলনায় সম্পন্ন এবং দূরদর্শী মা-বাবারা তাঁদের সন্তানকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন। তাঁরা নিজেরা মোটের উপর সুশিক্ষিত অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে এমনি তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য, যাকে উপেক্ষা করা যায় না। সারণি ঃ ৩.১-এ দেখা যাচ্ছে, 'ক'-এর, অর্থাৎ দারিদ্রতম বিভাগের পাঁচ খানা ছেলেমেয়েকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পাঠায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এই খানাগুলো কোনো উচ্চতর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই সঙ্গে যখন আমরা মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীদের (দশম শ্রেণী, যাদের নথি-বইতে আমরা দেখতে পাইনি) এবং কলেজের ছাত্রদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপটকে আমাদের বিন্যাসের আয়ত্তে নিয়ে আসি, তখন একটা কথা মানতেই হয়, 'ক' বিভাগের প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র যেসব পরিবার, সেখানকার ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক অথবা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত নয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা পড়ুয়াদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। নথিভুক্ত নামের মোট সংখ্যা ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ১৫-র কম, সুতরাং এ-প্রসঙ্গে কোনো তর্কই অচল। আমার অবশ্য ধারণা যেসব পরিবার থেকে ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষান্তর পেরনোর পরেও বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, সেই পরিবারের সদস্যরা উচ্চতর স্ত্রীশিক্ষার মূল্যকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। আজকাল তো গ্রামাঞ্চলেও মানা হয় যে, সুশিক্ষিত মহিলারা রুজি-রোজগারে সক্ষম। বিয়ের বাজার তো এখন শিক্ষিতা যুবতীরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। এঁদের বিয়েতে, নামমাত্র নিয়মমাফিক শিক্ষাসম্পন্ন মেয়েদের তুলনায়, পণ কম লাগে। সেই কারণেই, কিছুমাত্র শিক্ষার পরিবেশ থাকলেই, দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়েকে মহাবিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য উদ্যোগ নেয়।

হরহরে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে আসতে শিক্ষা সম্ভবত এখন থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২. জনসংখ্যার চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার দ্বিতীয় উপায় হল, ব্যাপক আয়তনে লাভজনক পণ্যশস্যের উৎপাদন। পান যে হরহরের মুখ্য পণ্যশস্য, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত অর্থনৈতিক ইতিহাসে পানের অর্থনৈতিক জীবনের তেজ আর মন্দা মূর্ত হতে পারে।

দেশভাগের আগে পান চাষ মূলত বারুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশভাগের

পরে উচ্চবর্ণের অধিবাসীরা ভারতের উদ্দেশ্যে বহির্যাত্রা করলেন; গ্রামে পানচাষের যথোপযুক্ত বেশ কিছু বিশালাকার জোত পড়ে রইল। কায়স্থ আর নমোদের মধ্যে কোনো কোনো উদ্যোগী পরিবার ওই জমিগুলোকে লাভজনক পানচাষের কাজে ব্যবহার করবার প্রস্তুতি নিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পানচাষ ছড়িয়ে গেছে হিন্দুসম্প্রদায়ের ভিতরে। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশিরভাগ পান বরজের বিনাশ ঘটে। লাজুক গাছগুলোকে দেখি যথাযথ যত্নের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। স্বাধীনতার পরে পান বরজগুলোকে আবার আগের অবস্থায় আনা হল, যদিও তার জন্য প্রয়োজন ছিল মোটারকম বিনিয়োগের। দেখা গেছে ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক গ্রামবাসীর উপরে চাপ এল, ওই লাভজনক ব্যবসায় নির্ভর করবার জন্য; যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেছে তারা, সে বিপর্যয় নাকি এইভাবেই কাটানো যাবে। তারপর থেকেই দ্রুত বেড়ে গেছে পান বরজের সংখ্যা। এই সময় দিয়েই মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরে ছড়িয়ে গেল পানচাষ। এমনকি প্রান্তিক চাষীও নিজের বাড়ির সংলগ্ন জমিতে পান বরজ বসাতে শুরু করল। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই ক্ষুদ্র বরজগুলি (১০-১৫খানা — খানা মানে ১২৮টি গাছ সহ দুই হলরেখার মাঝখানে লাঙলে খোঁড়া মাটি) বড়জোর মাত্র চার বছর থাকে। বস্তুত পানের অস্বাভাবিকরকম বেশি দাম গত শতকের আটের দশকে প্রথমদিককার বছরগুলোতে এই ব্যবসায় এগিয়ে দেওয়া সুবর্ণসুযোগ থেকে সেরা ফায়দা তুলে নিতে আরো অনেক লোককে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পানচাষে যা প্রতিদান মেলে, তা এতটাই আকর্ষণীয় যে, কিছু নলের জমি রূপান্তর করা হয়েছিল পান বরজে (যেমন ৭৫ নং প্লট)। জোতজমির একটা অংশ খুঁড়ে মাটির বড় বড় চাপড়া একত্রে জড়ো করা হয় ভিটাজমির জন্য — যে ভিটাজমির উপরে বসবে বরজ।

হরহরে পানচাষের দ্রুত উর্ধবগামী প্রবণতা আর বরিশাল জেলার উৎপাদন আন্দোলন সমকালীন ঘটনা। বরিশালে ১৯৭২-৭৩ সালে ৬২৬০ একর জমিতে পানচাষ হতো, উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৫৬৫ টন। ১৯৭৫-৭৬-এ হিসাবটা দাঁড়ালো ৬৯০০ একর এবং ১০,১৩৯ টন। ১৯৮১-৮২-তে ৭২৬৫ একর এবং ১১,৩৬০ টন। পানের উৎপাদনে বরিশালের সীমানা অন্যান্য জেলার তুলনায় সুদূর প্রসারিত (খুলনার স্থান দ্বিতীয়, সেখানে ১৯৮১-৮২-তে ৬,২৭৫ টন পান উৎপন্ন হতো) এবং বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের (১৯৮১-৮২-তে ৬০,১০০ টন) ছয়ভাগের একভাগ আসত বরিশাল থেকে) (বাংলাদেশের কৃষিপরিসংখ্যান সম্বলিত বার্ষিক বই ১৯৮৩-৮৪, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৩১০-৩১৩)। যখন আমাদের এই সমীক্ষা চলছে, সেই ১৯৮৫-তে পানের দাম হঠাৎ করে কমে গেল। ১৯৮৪-তে সাধারণ পানের দাম ছিল গাদি প্রতি ২,৭০০ - ২,৮০০ টাকা (একগাদিতে ১৩৮২৪টি পাতা থাকে)। কিন্তু ১৯৮৫-র নভেম্বরে সেই দাম দাঁড়ালো গাদি প্রতি ৯০০ - ১০০০ টাকার মতো, এতটাই কম। অনেক গ্রামবাসীর মতে, এই দামে ব্যয়ও পুরো ওঠে না। এক সংবাদদাতার কথা অনুযায়ী, কোনো পান-উৎপাদকের যদি ১০০ টি খানা থাকে, তবে ১৯৮৪-তে তার মুনাফা হতো ১০০০০ টাকা। কিন্তু ১৯৮৫-তে একই সূত্রে তার ১০০০০ টাকার ক্ষতি হল। ক্ষতির পরিমাণে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিত যে উৎপাদকরা গড় ব্যয়ের থেকে কম দামে পান বেচে দিতে বাধ্য

হচ্ছিল। ১৯৮৫-তে পানের বাজারের যে হাল, সেই অবস্থাই যদি চলতে থাকে তবে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। যত বেশি সংখ্যক পানের বরজ একজন উৎপাদকের মালিকানায় আছে, তার ক্ষতির পরিমাণ হবে তত বেশি। ওই সময়ে বড় চাষীরা সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হল। পান উৎপাদনের আয়তন যদি হ্রাস পায়, তবে দিনমজুরের জীবনে তার ছাপ পড়বে। তখনো তারা পান বরজ থেকে যে মজুরি পাচ্ছে (দৈনিক ১৫-২০ টাকা) তা ধানিজমির মজুরির (১২-১৫ টাকা) থেকে বেশি। পরবর্তী প্রশ্ন হল, এই যে পানের দাম পড়ে গেল, এটা কি কোনো অস্থায়ী ঘটনা, নাকি এ-ঘটনার মেয়াদ দীর্ঘ। মনে হয় আকস্মিক দামহ্রাসের অনেক কারণ আছে।

(১) সেই বছরে সমৃদ্ধ উৎপাদন,

(২) সমাজের প্রত্যেক স্তরে আবাদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত উৎপাদন (হরহরে মাত্র ১৫টি খানায় পানের বরজ নেই),

(৩) বিদেশে রপ্তানি স্থগিত রাখা,

(৪) বিশেষত নগরাঞ্চলে, পান খাওয়ার অভ্যাসটিতে নিম্নমুখী প্রবণতা।

আমাদের নির্দিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল বাজারে পানপাতার অতিরিক্ত যোগান। সেই কারণেই বহু গ্রামবাসী ভেবেছিলেন, চিরকালের জন্য বুঝি স্বর্ণ-যুগের অবসান ঘটেগেছে, শুরু হতে চলেছে বেঁচে থাকার এক জোরদার লড়াই। হরহরের অর্থনৈতিক জীবনে ১৯৮৫-কে বলা চলে এক পালাবদলের বছর।

৩. যে বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করেছি, ১৯৮৫-তে সেই বিপর্যয়কে যুঝতে যুঝতে গ্রামবাসীরা ইরি উৎপাদন (IRRI, উচ্চফলনশীলতা সম্পন্ন বীজকে আঞ্চলিক ভাষায় ইরি বলত) প্রবর্তন করলেন উত্তরের নল ভূমিতে, যে অঞ্চলটা রবি মরশুমে পতিত জমি হয়ে পড়েছিল। আরিয়াল খান নদীরতীর ধরে চর এলাকার মাটিতে বছরে বছরে পলির নতুন প্রলেপ জমে। হরহরের অবস্থান নদী থেকে অনেক দূরে, সেখানকার মাটি চর এলাকার মতো উর্বর নয়। সর্বোপরি উত্তরের নল ভুমির মাটি অনুর্বর। কৃষি কাজের নিরিখে এই এলাকা অনগ্রসর, এখনো তা ইরির কাজে লাগেনি, তার ব্যবহার শুরু হয়েছে দেরিতে। আশপাশের গ্রামের উদ্যোগী কৃষকরা যারা পান বিক্রির সুবাদে কিছু মূলধন সঞ্চয় করেছিল, তারা নিজেদের জন্য একটা সেচ-প্রতিষ্ঠান খাড়া করল; কৃষি সমবায় সমিতির আর কোনো কার্যকারিতা অবশিষ্ট নেই, সমিতির আওতার বাইরেই কাজটা করল তারা; আর এই এলাকাব্যাপী এক কৃত্তিম খালের পাড়ে বসাল একটা মোটর পাম্প। বৈশাখ মাসে যখন ইরি চাষ হয়, তখন এ-অঞ্চল জলে ডুবে থাকে। অর্থাৎ ইরির প্রবর্তনের দরুণ অঞ্চলটি আর ব্যাপক আমন অথবা আউশ চাষের উপযুক্ত রইল না। তুলনায় উঁচু কয়েকটি জমিতে আমন আর আউশ গাছ এনে লাগিয়ে চাষের সুযোগ মেলে ঠিকই তবে সাধারণ আমনের তুলনায় ইরির উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিগুণ থেকে চারগুণ হওয়ার কথা। কৃষকরা ইরি চাষে নিজেদের বরাতকে বাজি রাখল। যখন পুকুরের নিচে ইরি পোঁতা দেখি, তখন তাদের রক্ষণমূলক চরিত্র স্পষ্ট বোঝা যায়। গরমকালে তুলনায় বড় পুকুরগুলোর জল পাম্পযোগে বের করে নেওয়া আরম্ভ হল, আর জলহীন পুকুরগুলোর ব্যবহার শুরু হল ইরি চাষের জমি হিসাবে — এসব ১৯৮০-র বছরগুলোর আগের কথা

নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'ঘ' অথবা 'গ' বিভাগের ধনী কৃষকরা যাদের বাড়ির লাগোয়া জমিতে দুটোর বেশি পুকুর আছে, তাঁরা এই উদ্যোগের চালনায় নেতৃত্ব দিতেন। ফলে ধনী-দরিদ্রর আয়ের ফারাক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সোজা কথায় এরকম ধারণাই মেলে যে, প্রকৃতিকে যথাসম্ভব শুষে নিয়ে তবেই জীবনধারণের উপকরণ সমাহারে গ্রামটি সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুষম উদ্‌যাপনের সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে, ৭৮৩ নং প্লটের বিশাল পুকুর কালী দিঘিকেও ইরি চাষের জমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, আড়াআড়িভাবে রাস্তার এপার থেকে ওপারে এক বিশাল বটগাছ আছে, তাকে জড়িয়ে আছে এক অশ্বত্থ গাছ। গাছতলায় জাঁকজমক করে শীতলা পূজো উদ্‌যাপন হয় প্রতিবছর বৈশাখ মাসের দশ তারিখে। পাশাপাশি একটা মেলা বসে। অতীতে ভক্তরা তাদের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের স্নান সারত দিঘিতে। কিন্তু ইরি আবাদে দিঘি ব্যবহারের দরুন মাথায় জল ছিটিয়েই এখন সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। মুনাফার উদ্যোগ আর সম্পন্ন এক ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবলম্বন রক্ষা করবার প্রয়োজন — এ-দুয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনাকে দেখা যেতে পারে।

৪. মন্দ থেকে ক্রমশই আরো মন্দ এক অর্থনৈতিক জীবনে স্থানীয় মানুষকে রক্ষা করবার আর এক উপায় হল মৎস চাষ। রবি মরশুমে গ্রামবাসীরা সিলভার কার্প, কাৎলা, রুই, মৃগেল আর চিংড়ির মতো মাছের চাষ করে ইরি আবাদের বড় পুকুরে,আবার গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত ছোট পুকুরেও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় পুকুরগুলো ভাগ করে ইজারা দেওয়া হয় ঠিকাদারকে (যার স্থানীয় নাম বর্গাদার)।

তেমন একজন বর্গাদার বলেন, তিনি তাঁর ১.৮০ একরের পুকুর থেকে বছরে ১৫০০০ টাকা উপার্জন করেন, মাছ থেকে আয় ১০০০০ টাকা আর ইরি আবাদ থেকে আরো ১০০০০। এক্ষেত্রে মুনাফার দুই-তৃতীয়াংশ বর্গাদার পেয়ে থাকেন আর এক-তৃতীয়াংশ যায় মালিকের কাছে। বাজারে মাছের ভাগবাটোয়ারা করেন ব্যবসায়ী। স্থানীয় নেতারা উৎসবে, অনুষ্ঠানে সমর্থকদের অনুমতি দেন মাছ ধরতে। এসব উপলক্ষে তাঁদের বাড়ির বাগান থেকে নারকেল, সুপারি আর অন্যান্য ফল বিনা পয়সায় মেলে। ফলে মাছ মেলে, বাগানের মালিককে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে মাছ কার্যকর ভূমিকা নেয়। অতীতকাল থেকেই এই জেলার বাগান মানে পরিমাণে সর্বজনবিদিত। এমনকি এখনো গ্রামের মানুষ বাগানের জিনিস তুলে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে, ছোটখাট আর্থিক চাহিদা। একই উদ্দেশ্যে বাড়ির সংলগ্ন তরিতরকারির খেত থেকে আনাজপাতিও বিক্রি হয়। অর্থনীতির বিচারে পরিবারের যে সদস্যরা কমজোরি, তাদের টিকে থাকবার একটা পরিমিত উপায় এইসব খুটখাট পণ্যদ্রব্য থেকে মিলে যায়। যে অর্থনীতি অন্যথায় নিরুদ্যম এবং নিশ্চেষ্ট, তাকে, উদ্যমের আর উদ্যোগের ঘাটতিকে অতিক্রম করবার পথে গ্রাম এইভাবে তবু খানিক সাহায্য পায়।

কোনো কোনো পরিবার হাস-মুরগি পালন,,ছাগল পোষা, গোপালন ইত্যাদির সূত্রে পারিবারিক ব্যয়-বরাদ্দ বানায়।

৫. স্থানীয় বাজার গ্রামবাসীদের নানারকম কাজের সুযোগ দেয়। যেসব পরিবার

তাদের আবাদযোগ্য জমি থেকে একেবারে বঞ্চিত, তারা সিগারেট, পান আর নিত্য ব্যবহারের অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস বেচতে বাজারে ছোট দোকান দেয়। কারো কারো দোকান আবার তেমন সুনির্মিতও নয়। তারা সবচেয়ে বেশি যা করতে পারে, তা হল বাজারের এক কোণে অথবা রাস্তার উপরে একখানা মাদুর বিছিয়ে তার উপরে উবু হয়ে বসে তাদের পণ্যদ্রব্যগুলো বিক্রি করা। কিন্তু যদি বিক্রি করতে পারে তারা গুড় (কাঁচা চিনি) অথবা আর কোনো বিশেষ বস্তু, তবে আয় সাধারণ দোকানিদের থেকে বেশি হবে তাদের। যে-সব পরিবারের বড় জোতজমি আছে তারা বাজারে নিয়মিত দোকান চালান, এমন ঘটনা একেবারে বিরল নয়। কোনো কোনো পরিবারের কোনো দোকান বর্তমানে নেই, কিন্তু অতীতে কোনো একসময় ছিল। কোনো কোনো অবস্থাপন্ন পরিবারকে দোকান চালিয়েই যেতে হয় ছেলেদের জন্য। ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু গ্রামের বাইরে কোনো কাজ জোটাতে পারেনি। বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক বাজারে নিজেদের পরিষেবা যোগান দিত কোয়াক চিকিৎসক হিসাবে। বর্তমানে সারের দোকানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভালো, কারণ ইরি চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। ওই চাষে বেশ বড়সড় অনুপাতে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ওষুধ লাগে। আরো বেশি আশাবাদী যারা, তারা ঢাকা, চাঁদপুর এবং ভোক্তাদের অন্যান্য নগরীতে পান পাতা পৌঁছে দেওয়ার কাজে চালানদার হিসাবে নেমে পড়েছে। পান ব্যবসার মুনাফা দিয়ে এই ব্যবসায়ীরা কৃষিজমি কিনতে পারে।

আক্ষেপ এই যে, এলাকার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হদিস মেলে এমন খুব কিছু দেখলাম না আমরা। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার ভিতরে হরহর যেন তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে কখনোই হারিয়ে না ফেলে। সেই হল আমাদের একমাত্র অভীষ্ট।

সূত্রনির্দেশ

১ তোরু মাৎসুই, হিরোশি সাতো (১৯৮৬), *রিজিওনাল স্ট্রাকচার অব রাইস কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ ঃ থানা লেভেল স্ট্যাটিসটিকাল অ্যানালিসিস্* (জাপানি ভাষায়), টোকিও।

২ বরিশাল মহাফেজখানার রেকর্ডকীপার জনাব মাহবুব রহমান-এর সাহচর্য ও সহায়তার ঋণ অপরিশোধ্য; তাঁর অন্যতম সহযোগী জনাব মহম্মদ আবদুর রব সিকদার কীভাবে এই বিশেষ ধরনের নথি ব্যবহার করতে হয় ও পড়তে হবে এ-বিষয়ে সাহায্য করেছেন। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইতিহাস শাস্ত্রের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবদুল খালেক তাঁর দুই মেধাবী ও বিচক্ষণ ছাত্রকে আমাকে সাহায্য করার জন্য সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করেন; এই দুইজন তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। এডমণ্ড গুডা ও জনাব আনিসুদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে মহাফেজখানায় রক্ষিত নথি ও দলিলের নকল লিখে দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

৩ গ্রামে থাকার দিনগুলিতে গ্রামবাসীদের অনেকেই সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে দু'জন, বটাজোর-এর অশ্বিনীকুমার ইন্‌স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও ইউনিয়নের সভাপতি জনাব গোলাম হুসেইন সিকদার ও দ্বেবেন ভক্ত-র নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা আমার গ্রামে থাকাকালীন বাসস্থান-সহ সব ব্যবস্থা করেন। খেয়াঘাটের তনু সর্দার ও দেওপাড়ার অরুণকুমার সিংহ নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেন যা-কিনা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে আমাদের মধ্যে।

৪ মহম্মদ হবিবুর রশিদ, সম্পাদিত, (১৯৮১), *বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ঃ বাখরগঞ্জ*, ঢাকা, পৃ. ২, ৩০৮।

৫ বি. এল. জনসন, (১৯৮২), *বাংলাদেশ,* ২য় সংস্করণ, লণ্ডন, পৃ. ১১৫-১৬।

৬ ১৯৪৫-৫২ কালপর্বে কমে এসে ০.৫ লক্ষ মণে দাঁড়ায়। মোতাহারুল হক, (১৯৫৭), *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য রিভিসনাল সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব বাখরাগঞ্জ ঃ ১৯৪০-৪২ অ্যাণ্ড ১৯৪৫-৫২*, ঢাকা, পৃ. ৪১ দেখুন।

৭ জে. সি. জ্যাক, (১৯১৮), *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ঃ বাখরগঞ্জ*, কলকাতা, পৃ. ৭৭।

৮ (১৯১৫), *ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্য বাখরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ১৯০০-০৮*, কলকাতা, পৃ. ২।

৯ বর্তমানের নতুন প্রশাসনিক সীমানা অনুসারে পরিসংখ্যান বিন্যস্ত করা হয়নি। মোটামুটিভাবে পূর্বেকার দুটি সদর মহকুমার মোট অনুপাতকে সম্প্রতি গঠিত বরিশাল অঞ্চলের আনুপাতিক হিসাব বলে গণ্য করা হয়েছে।

১০ *উপজেলা স্ট্যাটিস্টিক্স*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৩।

১১ তোরু মাৎসুই, হিরোশি সাতো, (১৯৮৬), পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৪০ (মানচিত্র দেখুন), পৃ. ১২১ (সারণি দেখুন)।

১২ এইচ. এস.এম. ঈশাক, (১৯৪৭), *এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্স বাই প্লট বাই প্লট এনুমারেশন ইন বেঙ্গল ১৯৪৪ অ্যাণ্ড ১৯৪৫*, পার্ট ৩, কলকাতা, পৃ. ৫৩০।

১৩ *উপজেলা স্ট্যাটিস্টিক্স*, খণ্ড ১, পৃ. ২৫৯।

১৪ জে. সি. জ্যাক, *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ঃ বাখরগঞ্জ*, পৃ. ১১৫।

১৫ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪১-৪২।

১৬ বর্তমান সময়ে পরবর্তী দুটি শব্দ 'আসকি' ও 'আঁধি' অপ্রচলিত। জে.সি.জ্যাক সম্পাদিত, *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স ঃ বাখরগঞ্জ*-এ উল্লেখ আছে 'মগের আস্‌কি', শরৎকুমার রায়-এর *মহাত্মা অশ্বিনীকুমার* গ্রন্থে আছে 'মগের আঁধি', কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২।

১৭ অনুমান করা হয় পনের শতকের শেষ দশকে বরিশালের গৈলা-নিবাসী বিজয়গুপ্ত *মনসামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। গৈলা বৈদ্যপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল সেই সময়ে। কিন্তু সুকুমার সেন এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সুকুমার সেন, *হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলী লিটারেচার*, নয়া দিল্লি, ১৯৭১, পৃ. ৭৪।

১৮ ভি.সি.যোশি, সম্পাদিত, *রামমোহন রায় অ্যাণ্ড দ্য প্রসেস অব মডার্নাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া* গ্রন্থে আশিস নন্দীর প্রবন্ধ, 'সতী ঃ আ নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরি টেল অব উইমেন' দেখুন, দিল্লি, ১৯৭৫।

১৯ *বাংলাদেশ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ*, সংখ্যা ২, পৃ. ২০২-০৩, ঢাকা, ১৯৭৭-এ প্রকাশিত সিরাজুল ইসলামের প্রবন্ধ 'রুরাল হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ ঃ আ. সোর্স স্টাডি' দেখুন।

২০ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, *অশ্বিনীকুমার ঃ স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনচরিত*, বরিশাল, ১২২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০ - ২১।

২১ পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২২।

২২ নারিয়াকি নাকাজাতো, দ্য কনকশার এস্টেট অব ফরিদপুর, ইস্টবেঙ্গল ঃ আ কেস স্টাডি অব ভদ্রলোক ল্যাণ্ডলর্ড অ্যাট দ্য টার্ন অব দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি, *তোয়াবুঙ্কা কেনক্যুজো-কিয়ো*, সংখ্যা ১০০; পৃ. ১৪৪।

২৩ বর্তমানে প্রভাবশালী বণিক সমাদ্দাররা হরহর ও বাটাজোর অঞ্চলে বাস করেন। এই অঞ্চলে তাঁরা ব্যবসার সঙ্গেই নিকট সম্পর্কযুক্ত, বিশেষত বাংলাদেশের এই অঞ্চলের তারকি নদীর বন্দর (বাজার) অঞ্চলে। অঞ্চলের বেশ বড় এলাকা সমাদ্দার বণিকদের অধীনে।

২৪ অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে চাঁদসী ছিল অন্যতম যেখানে দত্তদের রীতিমতো জমি ছিল। বসুপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে এই গ্রামে তাঁদের প্রভাব ছিল।

২৫ নট্টরা "চণ্ডাল (নমশূদ্র), ভুঁইমালি ও অন্যান্য ছোট জাতের বাড়িতে অভিনয়, নৃত্যাদিতে রাজি হতেন না" (রিজ্‌লে, *দ্য ট্রাইবস অ্যাণ্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল*, খণ্ড ২, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ১৩০। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর বিপুল সংখ্যক মানুষের নিবাসী হয়ে ভারতে আসার

কারণে হরহর উচ্চবর্ণের আধিপত্য থেকে মুক্তি পায়। এঘটনা এমনকি গ্রামবাসীর নিজেদের সম্পর্কেও বদলে দেয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নট্টরা আজকাল নমশূদ্রদের বাড়িতে নৃত্যগীত অভিনয় করে। বাংলাদেশের শুধুমাত্র এই অংশেই নট্টদের কার্যকলাপে আর বাধা পড়ে নাই। ঘরজামাই থাকেন এমন একজন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবার চালিয়ে এসেছেন যে-পরিবারে কোনও পূর্ণবয়স্ক পুরুষ সদস্য নেই, আমাকে জানান অভিনয়ের কারণে তিনি বাংলাদেশের উত্তরের দূর জেলাগুলিতেও ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমন আর-একটি পরিবার যারা বৃত্তিগতভাবে নট্টদের কাছাকাছি। এঁদের বলে নাগাশিস। মিশ্র চরিত্রের পরিবার — অর্ধেক মুসলমান, অর্ধেক হিন্দু। তারা গানবাজনা করে, নিজেদের মুসলমান পরিচয় দেয়। পরিবারের কর্তার নাম হিন্দু নামের আদলে, যদিও তার সন্তানদের নাম মুসলমানের মতো। হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলমানরাও এই দোআঁশলা চরিত্রের পরিবারটির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। বাসস্থানের এক কোণে প্রতিষ্ঠিত গাজিথানের সামনে প্রতিবছর তারা উরস পালন করেন পীরের মাজারে (বাৎসরিক মৃত্যুদিবস স্মরণ করার ধর্মীয় রীতি হল উরস)।

২৬ এইচ. এইচ. রিজলে, *দ্য ট্রাইবস অ্যাণ্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল*, খণ্ড ১, পৃ. ১০৬।

২৭ ঐ, পৃ. ২৩১-৩২।

২৮ ঐ, পৃ ৭২।

২৯ ঐ, পৃ. ৭৩।

৩০ ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪।

৩১ ঐ, পৃ. ৭২।

অনুবাদ ঃ তরুণ পাইন (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ),
রুশতী সেন (তৃতীয় ভাগ)।

৪

‘কৃষক সমাজ’, ‘কৃষক’ ও ‘অকৃষিজনিত শ্রম’ : বাংলাদেশের জীবিকা-কাঠামোর উদাহরণভিত্তিক রচনা

মিনেও তাকাদা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান, সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামগুলি ‘কৃষক’ সম্পর্কে গবেষণার সুপরিচিত ক্ষেত্র। বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক গবেষণার অধিকাংশই ‘কৃষক সমাজ’-এর প্রতিভূ পরিচয়ে গ্রামকে চিহ্নিত করেছে। গবেষণাপত্রে শহর থেকে বিচ্যুত এক একটি গ্রামকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করে সেই গ্রামের পারিপার্শ্বিকতা বিবরণ, কৃষি এবং কৃষিজনিত কার্যকলাপ, অকৃষিজনিত শ্রম এবং শ্রমিক-এর মতো বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছে। ব্যাপারটা আশ্চর্যের যে কৃষিজীবিকা-নির্ভর জনসমাজ এখন বাংলাদেশে স্বল্পই। অপরদিকে বিভিন্ন অকৃষিজনিত শ্রমভিত্তিক আয় অথবা শহর প্রবাসী পরিজনের প্রেরিত অর্থের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা তুলনায় বেশি। গ্রামগুলি আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজ, কৃষক সমাজকে সামনে রেখে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১. সূচনা

প্রাথমিকভাবে ‘অনুন্নত’ দেশের মানুষ এবং তাঁদের সমাজকে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন করে নৃতত্ত্ববিদ্যা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উদ্ভূত বিশেষ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে। এই গবেষণার ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধের ‘কৃষক সমাজ’ (peasant society) সংক্রান্ত গবেষণা এবং ‘কৃষক’ (peasant) সম্পর্কিত গবেষণার বিভিন্ন ধারা। ‘কৃষক’ ও ‘কৃষক সমাজ’ এই দুই ধারণার সংজ্ঞা সম্পর্কে গবেষকরা ভিন্নমত পোষণ করেন।[১] জনসংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে ‘বাংলাদেশ’[২] পৃথিবীর ‘কৃষক-জনসমাজ সংখ্যা’[৩] সম্বলিত দেশগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যেসকল গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশই ‘কৃষক সমাজ’ এবং সেই সমাজে বসবাসকারী ‘কৃষক’-দের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাম্প্রতিক অবস্থাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।

২. গ্রামের ‘জীবিকা-কাঠামো’ সম্বন্ধে প্রশ্ন/সন্দেহ কেন?

১৯৬০ সালের প্রথম থেকেই অধুনা বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রাম সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক

গবেষণা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা — অর্থাৎ সংসার, পরিবার এবং আত্মীয় পরিজন সম্পর্কিত সমস্যা[৪] থেকে শুরু করে গ্রামের সমাজের পরিকাঠামো এবং তার শ্রেণীবিভাজনের সমস্যাও[৫] এই সকল গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে, অবশ্য সেই গবেষণা-ধারায় গ্রামের অর্থনৈতিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে 'কৃষি' ও 'কৃষক সমাজ'-কে মূল বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, এসব গবেষণায় জমিকে প্রধান বা মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে সকল নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা তথ্যমূলক বলে পরিগণিত তার মধ্যে Wood, van Schendel, Jansen–এই তিন গবেষকের গবেষণাপত্র নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। Wood তাঁর গবেষণার ক্ষেত্ররূপে কুমিল্লার শহরতলির নিকট একটি কৃষিতে উন্নত গ্রামকে বেছে নিয়েছিলেন। এই গ্রামের কৃষির উন্নতি, গ্রামের আভ্যন্তরিণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়কে তাঁর গবেষণার আলোচ্য বিষয় করেছিলেন। তিনি নগর-কেন্দ্রিক গ্রামের প্রকৃতি চিনতে হলে অকৃষিজনিত শ্রম ও শ্রমিকদের অবস্থা সামনে রেখে প্রধাণত জমি এবং জমির মালিকানাসত্ত্বকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৬] 'কৃষক'-দের জীবনধারার বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদসমূহ হচ্ছে van Schendel-এর গবেষণার বিষয়বস্তু। তাঁর গবেষণার ভৌগোলিক পরিধি হল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর ও বগুড়া এবং পূর্বাঞ্চলের কুমিল্লা।[৭] পরিবর্তিত অবস্থা এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মূল বিষয়রূপে লক্ষ্য রেখে তাঁর গবেষণাপত্র রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করার জন্য নথিভুক্ত বিভিন্ন জমি-জায়গা সম্পর্কিত আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু অকৃষিজনিত শ্রমের বিষয়ে তাঁর আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়েছে। এছাড়াও রপ্তানিকারকদের বিষয়ে আলোচনার সময় কেবলমাত্র 'প্রেরিত-অর্থ' (remittance)-কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার জন্য অবহেলিত হয়েছে রপ্তানিকারকদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভূমিকা। ফলত, গবেষণাপত্রের পরিধি সীমিত হয়ে পড়েছে।[৮] Jansen তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে ঢাকার শহরতলির কাছাকাছি একটি গ্রামকে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি F. Birth-এর গবেষণার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশ সম্পর্কে গবেষণার একটি বিশেষ পর্যায়কে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন।[৯] কিন্তু তাঁর লেখাতে 'অপ্রচুর সম্পদ' বা Scarce Resources নামক অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষয় হিসাবেও 'জমি' এবং 'জমি-কেন্দ্রিক' বিভিন্ন ক্ষমতা (যেমন মালিকানাস্বত্ব, খাই-খালাসি ইত্যাদি)-কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক 'মেরুকরণ' (polarisation) না অর্থনৈতিক 'খণ্ডীকরণ' (fragmentation) তা গবেষণার মূল বিষয় বিবেচিত হয়েছে।[১০] প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সমস্যা, এমনকি জনসংখ্যার সমস্যাকেও লক্ষ্য রেখে বহু আলোচনা করা হয়েছে।[১১] অবশ্যই সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই গ্রামবাসী[১২] –– এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করে দেখলে 'কৃষক' সমস্যাই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক সমস্যা হিসাবে কৃষি, বিশেষত 'জমি' সংক্রান্ত সমস্যাকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা? একই সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে বিপরীত ভাবে জড়িত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধ থেকে প্রায় বেশ কিছু

গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রামের অকৃষিজনিত শ্রমের যে অবস্থান তার তথ্য পরিবেশিত হয়[১৩] এবং সেই সকল গবেষণার ক্ষেত্রে অকৃষিজনিত শ্রমের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালেও এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।[১৪] বর্তমানে বাংলাদেশে এই বিষয়ে গবেষণা যথেষ্ঠ প্রাধান্য পাচ্ছে।[১৫] আরও একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হল, বহু সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক এবং স্বল্পকালীন কৃষকের অস্তিত্ব, যে বিষয়টি সময়বিশেষে সমস্যা তৈরি করে।[১৬] জনৈক গবেষক আদমশুমারির তথ্যভিত্তিতে মনে করেন যে, উৎপাদনশীল অর্থাৎ আয় দেওয়া জমি গড়ে ৩ একরের কম, যা বাস্তুজমির তুলনায় ৫৬.৭ শতাংশ বেশি।[১৭] অপর এক গবেষকের মতে কৃষিনির্ভর গ্রামেও ৭৮ শতাংশ পরিবারই জমির পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমেও লাভজনক ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেও অসমর্থ।[১৮] ধারণা হতে পারে যে এই ধরণের পরিসংখ্যান বাস্তবে গ্রহণযোগ্য। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখলে এটাই মনে হবে যে এই অবস্থা, অর্থাৎ শুধুই জমির মালিকানার সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অপারগতা চলতে থাকলে জমির মালিকানার ক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব অনেক বেশি হবে, অথবা জমির মালিকানার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমকে কাজে লাগিয়ে অথবা বড় শহরে শ্রমিক শ্রেণীকে যেতে উদ্বুদ্ধ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে। কিন্তু আঞ্চলিক পার্থক্য কিছু হলেও[১৯] বিশেষত, পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারে 'মেরুকরণ' অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক মেরুকরণ' পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন, এমন গবেষকরা যেমন রয়েছেন তেমনি এই শ্রেণীকে (জমির মালিক শ্রেণীকে) জমিদার বা জোতদার বলে আখ্যায়িত করেছেন এমন গবেষক-দের সংখ্যা কম হলেও আছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শহরাঞ্চলে বিশাল সংখ্যায় এই শ্রেণীকে লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় এটা লক্ষ্যণীয় যে, বাংলা-দেশে হঠাৎ বেড়ে ওঠা শহরের সংখ্যা অনেক কম। ফলে সাম্প্রতিক অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে?

এই প্রবন্ধে শহর থেকে দূরের একটি গ্রামকে উদাহরণের ভিত্তিতে নিয়ে গবেষণা অগ্রসর করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

৩. বাংলাদেশের একটি গ্রামকে নিয়ে আলোচনা

৩.১ কুমিল্লার উত্তর সীমান্তের একটি গ্রামের বাস্তব অবস্থা

আলোচ্য গ্রামটিকে ইংরেজি 'k' হরফে চিহ্নিত করা হল। এই 'k' রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ১০০ কি.মি. দূরে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নদী মেঘনার তীরে অবস্থিত। ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে এই গ্রামটি মেঘনা তীরের একাংশবর্তী একটি সমতলভূমি।[২০] গ্রামটি মেঘনার শাখানদী গোমতী থেকে প্রায় দুই কি.মি. দূরত্বে থাকার ফলে ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এই গোমতীতে ত্রিপুরা থেকে বয়ে আসা জলের আধিক্যে এই 'k' গ্রাম প্রায়শই বন্যা কবলিত হতে দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যটি বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল বলে পরিচিত এবং এখানে সারা বছরে প্রায় ২৫০০ মি.মি. মত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, ১৯৮৯-১৯৯০ সালে যখন সারা দেশে কোথাও ভারী বন্যা হয়নি সেই বছর দুটিতেও এই অঞ্চলটি কয়েকবার

বন্যার কবলে পড়ায় শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। খেত-খামারে ঘেরা একটি সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক গ্রাম এই 'k'। এখানকার কৃষিজমিতে বর্ষার সময় ধান (আমন ধান) আর অন্যদিকে পাট রোয়া হয়। শুখনা মরশুমের শুরুতে গম, সরষে (তৈলবীজ), বিভিন্ন রকমের তরিতরকারি প্রভৃতি (যা রবিশস্য নামে অভিহিত) উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এর পরবর্তী পর্যায়ে সেচের জল ব্যবহার করে ধান (বোরো ধান) চাষ করা হয়ে থাকে।[২১] গ্রামে সরকার পরিচালিত একটি ছোটো প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুইটি মসজিদ আছে। সাম্প্রতিক কালে সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি দোকান হয়েছে।[২২] এছাড়া অন্য কোনো সুবিধা বিশেষ নেই। বাজার প্রায় ২ কি.মি. দূরে। বাজারে যাওয়ার রাস্তাটা বড়রাস্তা থেকে ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে। ১৯৮৯ সালের বর্ষাকালে বন্যায় গ্রামের প্রবেশ পথের সেতু ভেঙে গিয়েছিল। এখন একটি বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করা হয়ে থাকে যা বলাবাহুল্য বিশেষ অসুবিধাজনক। এই বাজারের প্রান্ত থেকে সামান্য দূরে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ,[২৩] হাইস্কুল আর একটি কলেজও আছে, মাত্র দু-বছর আগে তৈরি। এই বাজার গ্রামবাসীদের একটি যোগাযোগ কেন্দ্র। কিন্তু অন্য কোনো পরিচালন সমিতি বা চিকিৎসাকেন্দ্র দেখা যায় না। বাজারটি বেশ বড়। ছোটো ছোটো গলিতে প্রায় ২০০টির মতো দোকান। এখানে সপ্তাহে দু-বার হাট বসে।[২৪] এই বাজার সংলগ্ন এলাকার মানুষজন এই বাজারে কেনাবেচা করেন। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক ব্যাপার অথবা বিশেষ ধরনের ভোগ্যপণ্যের বাজারের জন্য জেলা শহর কুমিল্লা পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাতায়াতের মাধ্যম বাস। সাধারণ বাসে কুমিল্লা পর্যন্ত যেতে প্রায় দেড় ঘন্টা, রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত যেতে প্রায় ৪ থেকে ৫ ঘন্টা, বন্দর-শহর চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেতে প্রায় ৬ ঘন্টার মত সময় নেয়। পর্যাপ্ত বাস না থাকায় যাতায়াত যথেষ্টই অসুবিধাজনক। এছাড়া আর্থিক কারণেও সকলের পক্ষে সবসময়ে যাতায়াত করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না।[২৫] প্রসঙ্গত ভারতীয় সীমানা তথা সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা রাজ্য এখান থেকে মাত্র ২০ কি.মি. হলেও মধ্যবর্তী অঞ্চলে গোমতীর শাখানদী থাকায় এবং চেকপোস্টগুলি দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাতায়াত সীমিত।

বর্তমান গবেষণা পত্রে আরও অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একটা সীমা নির্ধারণ করতে চাই। প্রথমত, সমগ্র 'k' গ্রামের আলোচনা না করে সেই গ্রামের দক্ষিণ দিকের একাংশে অবস্থিত দক্ষিণপাড়া ও পশ্চিমপাড়া এবং উত্তরদিকের উত্তরপাড়াকেই গবেষণাক্ষেত্র করছি। সাধারণভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কিত গবেষণায় বাংলা ভাষার 'গ্রাম'-কে 'একক' বলে ধরা হয়। একইভাবে এই গবেষণা পত্রের পর্যালোচনায়ও গ্রামকে একক হিসাবে ধরা হয়েছে বা unit ধরা হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশে জায়গা বিশেষে (বিশেষত বন্যা-প্রবণ অঞ্চলগুলিতে) প্রাকৃতিক বাঁধ এবং টিলায় বিভিন্ন বসতি গড়ে ওঠার ফলে ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে স্পষ্টত বিচ্ছিন্ন জনবসতির সংখ্যাও অনেক। কিন্তু আবার বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের স্পষ্ট সীমা নির্ধারিত হয়নি।

এছাড়া বাংলাদেশে বংশ বা গোষ্ঠী ইত্যাদি নামাঙ্কিত পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ধারার প্রাধান্যে গড়ে ওঠা কমপক্ষে ২০টি পরিবার[২৬] বা সংসারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জন-বসতিও অস্বাভাবিক নয়। এই বসতির এক একটি ছোটো ছোটো অংশকে 'বাড়ি' আখ্যা

দেওয়া হয়ে থাকে। এই সকল বাড়ির সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'প্রধান' বা 'মাতব্বর' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে ইউনিয়ন প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবত, এই পদ বা দায়িত্ব সার্বজন্য হলেও মনোনীত পদাধিকারীর ক্ষমতা যৎসামান্য। প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরটি 'ইউনিয়ন' নামে অভিহিত করা হয়।

এই ইউনিয়নগুলি ১০ থেকে ২০টি গ্রামের সম্মিলিত ফোরাম বা সভা। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রতিটি গ্রামেই এই প্রশাসনিক সমিতির প্রধানের উপস্থিতি নেই। প্রতিটি গ্রামেই আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন বহু ব্যক্তিই রয়েছেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই সকল ব্যক্তির কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা নগণ্য। গ্রামের সকল মানুষ একত্রে কাজ করতে পারেন এমন সমবায় সমিতি বা কার্যালয়ের সংখ্যাও নগণ্য। বেশিরভাগ গ্রামেই এই ধরনের সমবায়ের উপস্থিতি নেই। কিন্তু গ্রামগুলিতে কখনও কখনও 'বিচার' অথবা 'সালিশ' নামক এক ধরনের বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই বিচারসভায় গ্রামের আঞ্চলিক, অর্থনৈতিক সমস্যা অথবা বিবাহাদি সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার পর্যালোচনা করে নানান সিদ্ধান্তে আসা হয়। এই সাথে 'সমাজ' (কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হয় রেয়াই) অথবা 'পাড়া' ইত্যাদি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পরিবারের প্রধানেরাই সাধারণত অংশ নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে গ্রাম প্রাধান্য পায় না। এছাড়া গ্রামের কর সংগ্রহের সংস্থা 'মৌজা' নামে পরিচিত। এই মৌজাও সাধারণভাবে কয়েকটি গ্রামের মধ্যে একটিই থাকে। এর ফলে বিচ্ছিন্ন গ্রাম সম্পর্কে বর্তমানে কোনো বিশদ আর্থিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এইজন্যই বিভিন্ন প্রবন্ধে 'অদৃশ্য গ্রাম' বলে বাংলাদেশের গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[২৭] যাই হোক, গ্রামগুলিতে একটি বিশেষ ধরনের সাংগঠনিক চরিত্র রয়েছে যেমন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'গ্রাম' নামাঙ্কিত সংগঠন প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। এলাকা বা পাড়া সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বলতে দেখা যায় যে, 'পাড়াটাই ধীরে ধীরে গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে' — এই ধরনের মতবাদ বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।[২৮] বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও একই মতপোষণ করে থাকেন। পাড়া সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের বক্তব্য হচ্ছে 'আমরা (অর্থাৎ পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া) একই পাড়া, কিন্তু উত্তরপাড়া সম্পূর্ণ আলাদা।' এই বক্তব্যের কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা প্রকৃত (অর্থাৎ ঐতিহাসিক কারণজনিত) বিভাজনের উল্লেখ করেছেন। অপর একটি কারণ মসজিদের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। সাধারণত মুসলমান প্রধান গ্রামগুলিতে মসজিদ একটি বিশেষ Religious Community Centre বা ধর্মভিত্তিক সমাজ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।[২৯] স্বাভাবিকভাবেই মসজিদে নামাজের সময় জমায়েৎ হওয়ার ফলে সেই মসজিদ গ্রামবাসীদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে কাজ করে থাকে। প্রসঙ্গত এই 'k' গ্রামটিতে তিনবছর বা তার কিছু আগে পর্যন্ত দক্ষিণপাড়াতে একটি মাত্র মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে উত্তরপাড়াতে আরও একটি মসজিদ নির্মিত হলে এবং এই দুটি মসজিদে দুইজন পৃথক পৃথক ইমাম থাকার জন্য উত্তরপাড়া একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন পাড়ায় পর্যবসিত হয়। উত্তরপাড়ার মসজিদটি জামা মসজিদের শাখা নয়। ফলস্বরূপ বছরে দুবার ঈদের নামাজের সময় গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য দক্ষিণ-

পাড়ায় অবস্থিত মসজিদেই সমবেত হয়ে থাকেন। পরিশেষে ভৌগোলিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই গ্রামটি উত্তর-দক্ষিণে সমানভাবে বিস্তৃত এবং ঠিক মধ্যবর্তী অংশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত একটি পয়ঃপ্রণালী রয়েছে। এই পয়ঃপ্রণালীর উত্তর দিকের পাড়াকে উত্তরপাড়া এবং দক্ষিণ দিকের পাড়াকে দক্ষিণপাড়া ও পশ্চিমপাড়া বলা হয়ে থাকে। এই দুইদিকের পাড়ার মধ্যে মেলামেশা ধীরে ধীরে কমে আসছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিবারকে গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার শব্দটি বাংলাদেশ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত শব্দ। পরিবার শব্দটি 'সংসার' শব্দের সমার্থক।[৩০] এছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধে পেশাগত সমস্যাকে সামনে রেখে শ্রমিক শ্রেণীর বিভাজনের কথা আলোচনা করা যায় নি। তার কারণ পর্যায়ক্রমে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, একই ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকেন বা থাকতে পারেন তেমনই অন্যদিকে অন্য কোনো ব্যক্তি বেকার অথবা আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত। এইরকম পরিস্থিতিতে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমতা নেই। কিন্তু পরিবার কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবারগুলির কিছুটা সমতা থেকে যায়। এছাড়াও কোনো একটি পরিবারে (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) একজন উপার্জনক্ষম সদস্য থাকলেও অপর আরও একজন উপার্জনক্ষম সদস্য রয়েছেন এমন ঘটনাও বিরল নয়। এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সদস্যটি একটি মাত্র উপার্জনের কাজেই নিযুক্ত থাকেন।[৩১] এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর চিত্র রূপায়ণ করতে হলে পেশাগত পরিস্থিতিতে 'প্রধান পেশা' এবং 'আংশিক পেশা' এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে আলোচনার প্রকৃত ফলাফল পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য।[৩২]

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মহিলাদের আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মের ধারণা অনুযায়ী পর্দা (অর্থাৎ মহিলাদের অবয়ব ঢেকে রাখার আবরণ) প্রথার জন্য শহর ছাড়া অন্যত্র মহিলাদের চলাফেরা সম্পূর্ণভাবে সীমিত। তাছাড়া মহিলাদের বাড়ির কাজে এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দেখাশোনা, পরিচর্যা, বাড়ির দৈনন্দিন ছোটখাট কাজকর্মের ঝামেলায় দিনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করতে হয়। ফলে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রোজগার এবং পেশাগত বিভাগে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধটির বিভিন্ন পর্যায়ে 'পরিবার' অর্থ সহজবোধ্য করার জন্য মহিলাদের কার্যকলাপ পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল।[৩৩] প্রসঙ্গত এই গ্রামের সমগ্র জনসংখ্যাই ইসলাম ধর্মের সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত।

৩.২ জমির মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা

অকৃষিজনিত শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিকদের বিষয় আলোচনা করার আগে কৃষিকর্মের প্রকৃত অবস্থা এবং কৃষকদের অবস্থাকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন। নিম্নে এই অবস্থাকে যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সারণি ঃ ১ 'k' গ্রামের পরিবার-ভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

	আদমশুমারি জনিত বিভাজন*	গ্রামের আভ্যন্তরিণ বিভাজন**	সংখ্যা ***	অর্থনৈতিক পরিস্থিতি****	পরিবার সংখ্যা
	মধ্য অনুপাত	উদ্বৃত্ত	১	কৃষি (+)+ অকৃষি	৭
জমির মালিকানা			২	কৃষি (+/-)+ অকৃষি	১৭
	মোটামুটি	স্বনিয়োজিত	৩	কৃষি (+/-)	১৪
	ক্ষুদ্র অনুপাত	স্বল্প	৪	কৃষি (-)+ কৃষিশ্রম	২০
			৫	কৃষি (-)+ অকৃষি	১৭
ভূমিহীন	সার্বিক	ভূমিহীন	৬	অকৃষি	২৮
	ভূমিহীন	(আইনত)	৭	কৃষিশ্রম + অকৃষি	৫
		*****	৮	কৃষিশ্রম	১৩
		নির্ভরশীল ******			৩

* ক্ষুদ্রাকার কৃষক ০.০৫ - ২.৪৯ একর, ভূমিহীন ০.০৫ একর।

** এই গ্রামের ক্ষেত্রে কৃষি-শুমারির বিভাজনের ফলাফল প্রযোজ্য নয়। ফলে এক বিশেষ বিভাজনকে কার্যকর করা হয়েছে।

*** এই সংখ্যাগুলি প্রতিটি গ্রুপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সংখ্যা।

**** পরিবারগুলির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখানে করা না হলে পরিবার প্রতি পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। সারণির ২নং-এর শ্রেণী লক্ষ্যণীয়।

***** এখানে বিশদভাবে বলতে গেলে 'আইনত ভূমিহীন' (Landless by law) বলতে পরবর্তী পর্যায়ের 'ভূমিহীন'-দের উল্লেখ করা হয়েছে।

****** এর মধ্যে দুটি পরিবারের প্রধান হচ্ছেন মহিলারা এবং অপর একটি পরিবার কেবল এক বয়স্ক দম্পতির পরিবার। মহিলা প্রধান পরিবার সংক্রান্ত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (ITO 1990)।

তথ্য তালিকা অনুযায়ী 'k' গ্রামের 'পরিবার' সমূহের চিত্র এবং সেইসকল পরিবারের আর্থিক পরিকাঠামোতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিবারই নামে জমির মালিক হলেও তাদের প্রকৃত মালিকানা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং সেটা অনেক সময়েই সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।[৩৩] সমস্ত জমির পরিমাপের ক্ষেত্রে কানি এবং শতক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩৫] এই কানি এবং শতক শব্দদুটি এই অঞ্চলে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ। বাস্তবে জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য 'কাঠা' এবং 'একর' এই শব্দদুটির ব্যবহার সমধিক প্রচলিত।

প্রথমে প্রতিটি পরিবারের আর্থিক কাঠামো এবং সেই কাঠামো ভিত্তিক বিভাজনের পর্যালোচনা করা যেতে পারে (সারণি ঃ ১ দেখুন), এই গ্রামে প্রতিটি পরিবারের আর্থিক কাঠামোকে ৯টি ভাগে বিভাজিত করে দেখা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্য পরিবারের উপর নির্ভরশীল এমন পরিবারের সম্বন্ধেও বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ বিভাগটি ৮ নং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী এই গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই স্বল্পকালীন কৃষক বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এই অবস্থা বিশেষভাবে অস্বাভাবিক। আমি এই প্রবন্ধে এই বিশেষ দিকটিকেই সর্বপ্রথম তুলে ধরতে চাই। এই গ্রামটি জমিদার-কেন্দ্রিক বা জমিদার পরিচালিত গ্রামের আখ্যা পেতে পারে না। কিন্তু তবুও জমির মালিকানা সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই তা সত্য নয়। এই বিষয়টি আদমশুমারির সময় চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে অপর আর একটি মাপকাঠিব

ভিত্তিতে পুনরায় বিভাজন করে 'গ্রামের আভ্যন্তরীণ বিভাগ'-কে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে।[৩৬]

অপর একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা হল তুলনামূলকভাবে এই গ্রামের উচ্চশ্রেণীর বিত্তবান মানুষজনের জমির পরিমান অন্যান্য গ্রামের সমশ্রেণীর তুলনায় কম।[৩৭] এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে (অর্থাৎ অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে জমির সত্ত্ববিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে) polarisation বা অর্থনৈতিক মেরুকরণ কতটা কার্যকর হচ্ছে সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকে। যাই হোক লক্ষ্য হিসাবে ১২১টি বাড়ি (পরিবারের সংখ্যা) এবং মোট জনসংখ্যা ৬১৮ জনকে ধরা হয়েছে।[৩৮]

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উল্লিখিত বিভাজনের সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় আরও অনেক চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণা হতে পারে। প্রথমত, বাড়ির সংখ্যা অনুযায়ী দেখলে এই বিভাজনের পরিকাঠামো অর্থনৈতিক মেরুকরণ পদ্ধতির মত নয়। অন্যদিকে বেশ কিছু সংখ্যক অসম্পূর্ণ বাড়ি থাকায় মোটের উপর গড়পড়তা হিসাব করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীবিন্যাস ধরলে দেখা যাবে যে, নিজেরা বিনিয়োগ করে যে উৎপাদন করছে কেবলমাত্র তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং জীবনধারণ করা চলছে না এমন পরিবারের সংখ্যাও যথেষ্ট। এই সংখ্যা শতকরা হিসাবে উদ্বৃত্ত এবং স্বনির্ভর শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সাত ভাগের কাছাকাছি (৮৩ / ১২১)। অন্যদিকে চাষের উৎপাদন থেকেই জীবনধারণ করছেন এমন পরিবার উপরের দিকের তিনটি শ্রেণীভুক্ত, যারা গ্রামের মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশের বেশি নয়। তৃতীয়ত, কৃষিকর্মে অংশগ্রহণ করে জীবনধারণ করা পরিবারের সংখ্যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার চার শতাংশেরও কম। (৩+৪+'৫ = ৩৮.৪%)। অপরদিকে মিলিতভাবে প্রধান পেশা এবং অপ্রধান পেশা সমন্বিত অকৃষিজনিত শ্রমে নিযুক্ত থাকা পরিবারের সংখ্যা গ্রামের সার্বিক জনসংখ্যার ছয় শতাংশের কিছু বেশি। চতুর্থত, সাধারণত ভূমিহীন (সঠিক অর্থে আইনত ভূমিহীন) হিসাবে গণ্য পরিবারসমূহের সংখ্যা মধ্যে খুব কম হলেও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিক থেকে যে একটা বৈসাদৃশ্য আছে তা স্পষ্টপরিদৃষ্ট। যদিও বহু গবেষকই এই ধারণায় আস্থাহীন। প্রদর্শিত সারণিটি এই সন্দেহকে নিরসন করতে পারে।

সারণি ঃ ২ জমির মালিকানার গড়পড়তা পরিমাণ

নম্বর *	গড়পড়তা মালিকানার পরিমাণ **		পরিবার পিছু সদস্য সংখ্যা		মাথাপিছু মালিকানার গড়পড়তা পরিমাণ **
	পরিবার	(মোট)	পরিবার	(মোট)	
১	১০.৪৪	(৭৩.০৮)	৯	(৬৩)	১.১৬
২	৩.৬৫০	(৬২.০০)	৪.৯৪০	(৮৪)	০.৭৪০
৩	৪.২৪০	(৫৯.৩৩)	৬.০৭০	(৮৫)	০.৭০০
৪	১.২৯০	(২৫.৮২)	৪.৮৫	(৯৭)	০.২৭০
৫	১.০১০	(১৭.১৩০)	৫	(৮৫)	০.২০০
৬	০.৪১০	(১১.৫)	৪.৪৬০	(১২৫)	০.০৯০
৭	০.৪৩০	(২.১৩০)	৪.৪	(২২)	০.১০০
৮	০.০৮০	(১)	৪.৩৮০	(৫৭)	০.০২০

* এই নম্বরগুলি সারণি ঃ ১ নম্বরের।

** সমস্ত পরিমাপের একক হচ্ছে কানি।

প্রথমে, প্রতিটি বাড়ির মালিকানাধীন জমির গড়পড়তা পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। বাড়ি বা শ্রেণী বিভাজনের দিকে দৃষ্টি রেখে আলোচনা করার সময়ে দেখা গিয়েছে যে, বাস্তবে উচ্চবর্গের মানুষদের তুলনায় নিম্নবর্গীয় মানুষদের জমির মালিকানার পরিমান তুলনামূলকভাবে কম। এটি প্রথম লক্ষণীয় বিষয়। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে ৪টি বিশেষ শ্রেণীবিভাগ চোখে পড়ে। যার প্রথম তিনটি শ্রেণীতে আসে 'উদ্বৃত্ত', 'স্বনিয়োজিত' এবং 'স্বল্প' শ্রেণীভুক্ত মানুষ। এছাড়া রয়েছে ভূমিহীন শ্রেণীভুক্ত মানুষ। এই শেষের শ্রেণীটি (অর্থাৎ ভূমিহীন শ্রেণী) সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য — সাত (৭) এবং আট (৮)। এদের মধ্যে একটা বৈষম্য যে আছে তা বলাই বাহুল্য। তৃতীয়ত, প্রতিটি শ্রেণীর মালিকানাভুক্ত মোট জমির তুলনামূলক আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বোচ্চ তিনটি বর্গ এবং নিম্নে অন্যান্য বর্গের মধ্যে জমির মালিকানা ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য আছে। এই প্রবন্ধে আলোচিত জমির শতকরা সাতাত্তর ভাগ উল্লিখিত তিনটি উচ্চবর্গের মানুষদের (যারা মোট পরিবারের শতকরা হিসাবে মাত্র তিরিশ শতাংশ) মালিকানাভুক্ত। এই তথ্য উপস্থাপিত করলে হয়তো মনে হবে যে, জমির মালিকানার ক্ষেত্রে অকারণ অসামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু তবুও একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য না করলেই নয় তা হলো, উপরের তিনটি বর্গের (অধিকাংশ জমি যাদের মালিকানায় রয়েছে) মালিকানাভুক্ত জমির পরিমাণ গড়পড়তা ৫.১২ কানি অর্থাৎ ১.৫ একর-এর কাছাকাছি। এই রকম পরিস্থিতি গড়ে ওঠার প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, মুসলিম অনুশাসন অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি বন্টনের নির্দেশিত ব্যবস্থা। তাছাড়া, ইতিপূর্বে আলোচিত না হয়ে থাকলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধিও এই অবস্থা ঘটার জন্য একটি বিশেষ কারণ। এছাড়া জমি বন্টনজনিত অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই বন্টনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মেরুকরণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক খণ্ডীকরণের দিকেই প্রবণতা বেশি (বিশেষভাবে নিম্নমুখী প্রবণতা)।

এই পর্যায়ে, প্রতিটি পরিবারের গড়পড়তা সদস্যসংখ্যা এবং সেই সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক অবস্থা গড়ে উঠেছে সেই অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করেছি। এই ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য যে, উচ্চবর্গের পরিবারগুলি এবং অন্যান্য পরিবারগুলির মধ্যে পারিবারিক সদস্যসংখ্যার দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে সদস্যসংখ্যার অনুপাতে গড়পড়তা তিন বা চার জনের মত ফারাক দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এই বৈসাদৃশ্য গড়পড়তা জমির মালিকানার হারের ক্ষেত্রে যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছে তার প্রায় সমতুল্য। এটি উচ্চবর্গসমূহ এবং নিম্নশ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার যে পার্থক্য রয়েছে তারও নির্দেশক। দ্বিতীয়ত, উচ্চবর্গ বহির্ভূত শ্রেণীগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃত কৃষিনির্ভর শ্রেণীও অন্যান্যদের তুলনায় সংখ্যায় কিছুটা বেশি। এই আধিক্যের মূলে রয়েছে এক বিশেষ গোড়া মতবাদের প্রতিফলন যা পরে আলোচিত হবে।[৩] অবশ্য কেবলমাত্র এই আলোচনা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না। তৃতীয়ত, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ভূমিহীন তিনটি বর্গভুক্তদের সংখ্যা অন্যান্য বর্গভুক্তদের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। এই বিষয়ে আরও বলা যেতে পারে যে, এই সামাজিক স্তরের বেশিরভাগ পরিবারই একক ক্ষুদ্র

পরিবার। এই পারিবারিক অবস্থার মূলে অর্থনৈতিক কারণ বা প্রতিটি পরিবারের মধ্যে জীবনধারার পার্থক্য বা পরিবারগুলির মধ্যে মননশীলতার পার্থক্য কোনটি বেশি কার্যকর বলা মুশকিল।

পরিশেষে, প্রতিটি পরিবারে সমপরিমাণে জমির মালিকানা থাকলেও কখনো কখনো পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতেও জমির পরিমানের তারতম্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই মালিকানা নামেমাত্র মালিকানা না-কী প্রকৃত মালিকানা সেটা জমির পরিমাণের তুলনামূলক আলোচনা থেকেই বুঝতে পারা যাবে। এরপর মাথাপিছু গড়পড়তা জমির মালিকানার চিত্রটি পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, সঠিক অর্থে বলতে গেলে বয়সভিত্তিক জমির মালিকানার পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই পর্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে মূল প্রবণতাটি কোনদিকে তার লক্ষ্যেই আলোচনার অগ্রগতি শ্রেয়। ব্যাপারটির সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রবণতাটি ক্রমশ নিম্নগামী হয়েছে। একইসঙ্গে অন্য আর একটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ যে, উচ্চবর্গ নিম্নবর্গ পরিবারগুলির মধ্যে গড়পড়তা জমির মালিকানার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য বা ব্যবধানের দিক থেকে দেখলে পরিবারপিছু জমির মালিকানাতে চারটি ভিন্নস্তর দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবধানের ক্ষেত্রে তিনটি উচ্চস্তর এবং অন্য একটি স্তরের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তাও লক্ষ্য করার মতো। কারণ গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুসারে, সর্বনিম্নবর্গের জীবনযাত্রাতেও বছরে মাথাপিছু গড়পড়তা হিসাবে ০.৫ কানি জমির উৎপাদন (প্রধানত ধান) অত্যন্ত প্রয়োজন।[৪০] এ-ভাবেই এই পর্যালোচনার প্রাথমিক আপাত-সরলতা শেষ পর্যন্ত একটি জটিল নিরীক্ষার প্রকরণে পৌঁছে যায়— যে জটিলতার স্বরূপকে এড়িয়ে এই আলোচনা করা সম্ভব নয়।

এ-প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের বক্তব্যের একটি অংশকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। বাবা, মা এবং সন্তান মিলে ৪ জনের (২ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক) পরিবারে মোটামুটি হিসাবে ২ কানি জমি থাকলে কোনরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি চলে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কীটনাশক এবং সারের প্রয়োজনমতো ব্যবহার আবশ্যক। আবার আমন ধান, রবিশস্য (বিশেষত তৈলবীজ, সরষে এবং গম) এবং বোরো ধান রোপণের সময়ে জল সেচের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শুধু শ্রমের উপর ভিত্তি করে ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। তাতে হিতে বিপরীতের সম্ভাবনা। কিন্তু এই অবস্থা অর্থাৎ সার্বিক বিনষ্টির ক্রিয়াগতি এই গ্রামটিতে তীব্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান প্রাবন্ধিক সমীক্ষাপর্বে এই ব্যাপারে খোঁজখবর করলে বেশকিছু সংখ্যক গ্রামবাসী উল্লিখিত বিষয়টি সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে তাঁদের একই মতামত জ্ঞাপন করেছেন। এই এলাকাতে, চালের বাৎসরিক চাহিদার নিম্নতর পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য মাথাপিছু ৭.৫ মন, প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৭ মন, ১২ বছরের কম বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৪ মন। ২৮ মন চালের জন্য প্রয়োজন ৪০ মন মোমি ধান।[৪১] এই পরিপ্রেক্ষিতে, উদাহরণস্বরূপ (গ্রামবাসীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে) বাবা, মা এবং দুই সন্তানের পরিবারকে ধরলে নিম্নলিখিত হিসাবে উপনীত হওয়া যায়।

(৭.৫ +৭.০+৪.০+৪.০) x (৪০/২৮) x ২ = ৬৪.২৮ মন (ধান)।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের ধান

উৎপাদনের পরে দেখা গিয়েছে যে, আমন ধান প্রতি কানিতে ১০ থেকে ১৫ মণ, বোরো ধান ১৫ থেকে ২০ মন হয়ে থাকে। এই হিসাব ধরে এগোলে দেখা যাবে যে, আমন ধান কানি প্রতি ১২.৫ মন, বোরো ধান কানি প্রতি ১৭.৫ মন হলে ২ কানি জমি থেকে সংগৃহীত ধানের পরিমাণ হবে ৬০ মনের মতো। এছাড়াও এই পরিমাণ রবিশস্যকে যদি সংযোজিত করা যায় তাহলে আয়ের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যাবে বলে মনে হয়। গ্রামবাসীদের অভিমতও এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করে থাকে।

পরিশেষে, এই ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উচ্চবর্গের তিনটি শ্রেণী স্বনিয়োজিত কার্যে নিযুক্ত এটা নিশ্চিত। সুতরাং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ভিত্তি অনুযায়ী বিভাজন পদ্ধতি অনেক কার্যকর। একই সঙ্গে অপর আর একটি বিষয়ও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই বিষয়গুলি হচ্ছে যে, তিনটি উচ্চবর্গের সদস্য সংখ্যা ব্যতীত লোকেরা 'কেবল কৃষি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নির্বাহ করতে পারে না।' সুতরাং এই অবশিষ্ট পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে গড়পড়তা মালিকানার হিসাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বনিয়োজিত কাজে যোগ না দিয়ে পারে না। এটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য যে, এই অবশিষ্ট পাঁচটি শ্রেণীর অন্তর্গত পরিবারসমূহ (সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা সাত ভাগ মত) পছন্দ করুক বা না করুক জীবিকা হিসাবে দিনমজুরিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। এই দিনমজুরির আয় তাদের মূল আয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করলেও তা তাদের প্রয়োজনের 'অর্ধেকের কিছু বেশি'– হয়ে থাকে।

৩.৩ জীবিকা কাঠামো

এই পরিচ্ছেদে কৃষি-কেন্দ্রিক জীবিকা এবং অকৃষি-কেন্দ্রিক জীবিকার একটি তুলনামূলক আলোচনায় (সারণি ঃ ৩) আসা যাক। উল্লিখিত সারণির তথ্যলেখ অনুসারে, জীবিকার যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তা বিস্ময়ের । এক নজরেই ত্রিশটিরও বেশি পেশাভিত্তিক জীবিকা দেখা যায় এই সারণিটিতে যা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার প্রতিফলন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণে দেখা যাবে যে, তালিকায় প্রদত্ত জীবিকার সংখ্যা অকারণে বিস্তৃত।[৪২] প্রথমে এই বিষয়টিতে জোর দিয়েই পর্যালোচনা করা যেতে পারে। গোড়ায় ব্যক্তি বিশেষের জীবিকা সম্বন্ধে আলোচনা যা প্রথমে কৃষিভিত্তিক এবং পরে অকৃষিজনিত জীবিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

কৃষিভিত্তিক পেশার ক্ষেত্রে প্রথমে নির্দেশ করতে চাই কৃষি পরিদর্শক নামক এক আশ্চর্য জীবিকার কথা। সারণিতে বিভিন্ন পর্যায়ের যে বিভাজন রয়েছে সেই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকর্মে লিপ্ত। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অনেকেই কৃষির কাজকর্মে কিছুমাত্র সময় দেন না। যদিও কবে নাগাদ, কীভাবে, কোন জমিতে চাষ হবে এই সকল বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয় কৃষক পরিবারের প্রধানের মত অনুযায়ী। কিন্তু প্রকৃত অর্থে চাষের কাজ করে থাকেন অপরাপর কৃষিকর্মী। সাধারণত কৃষক পরিবারের প্রধান কৃষিকর্ম ও তার লাভালাভের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আসেন। যদিও তিনি স্বহস্তে চাষের কাজ করেন না। এ-বিষয়ে লক্ষণীয় যে, তাঁরা চাষের কাজ করতে পারেন না তা নয়, কিন্তু তাঁরা চাষ করেন না। যদি এই সব পরিবার নিজেরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতেন তাহলে সম্পূর্ণভাবে না

হলেও কিছুটা ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যেত।[৪৩] কিন্তু প্রথা অনুযায়ী নিজস্ব কৃষিজমিতে স্বহস্তে হালচালনা তথা নিজস্ব শ্রমদান না করাটাই এক ধরনের সামাজিক সম্মানের নির্দেশক। এই ধরনের পরিবারের ব্যক্তিবর্গ বিশেষত পরিবারের প্রধান অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছে 'ভদ্রলোক' নামে আখ্যাত।[৪৪] এইসব পুরুষ সদস্যদের অধিকাংশেরই চাষের কাজে লিপ্ত হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন হলেও এরা নিজ নিজ পৃথক পেশায় বিশেষ আগ্রহী। ফলস্বরূপ, চাষে উন্নতির ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই মনোনিবেশ করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যরা চাষের কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এই দ্বিতীয় প্রজন্মের কৃষিজীবীরা কী অন্যান্য কৃষিজীবীদের সমপর্যায়ভুক্ত?

সারণি ঃ ৩

	গ্রামে বসবাসকারী *	গ্রামের বাইরে বসবাসকারী '
১	কৃষিশ্রমিক (শ্রমজীবী), তেলি/তেলী, মুদি, মনোহারী দোকানী, কাপড়ের দোকানি, ছাত্রাবাসের মালিক, টেম্পো চালক, গাড়ি বা ইঞ্জিন-এর মালিক, গরুর ব্যবসায়ী	সরকারি কর্মচারী (চাকুরি), বানিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত (চাকুরি), ঠিকাদার, ছাত্র
২	কৃষিশ্রমিক (শ্রমজীবী), বস্ত্র ব্যবসায়ী, মুদি, মাদ্রাসা শিক্ষক, মশলা বিক্রেতা, রিক্সাওয়ালা, ছাত্র ***	সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী, মাদ্রাসার শিক্ষক
৩	কৃষিকর্মে নিয়োজিত অর্থাৎ কৃষক (স্বনিয়োজিত)	
৪	কৃষক, কৃষিশ্রমিক (মরশুমে চাষ করে এমন কৃষিশ্রমিক)	রিক্সাওয়ালা, দর্জি
৫	কৃষক, কৃষিশ্রমিক, বীজ ব্যবসায়ী, লেবুর সরবৎ এবং ডাবওয়ালা, বাস কন্ডাকটার, সিগারেট বা তামাক ব্যবসায়ী, মনোহারী দোকান মালিক, মালিক-রিক্সাওয়ালা (মরশুমি চাষী)	সৈনিক বা সেনা বিভাগে কর্মরত
৬	মৎসজীবী, দেহরক্ষী****, দর্জি, রিক্সা সারায় এমন ব্যক্তি, বাস ড্রাইভার, মালিক-রিক্সাওয়ালা, চাল ব্যবসায়ী, মালিক টেম্পো চালক, ছাত্র***	পুলিশ, বাড়ির কাজের লোক (পুরুষ) বা চাকর, শিল্পশ্রমিক বা ফ্যাকট্রিতে কর্মরত শ্রমিক, দর্জি, রিক্সাওয়ালা ও মধ্যপ্রাচ্যে চলে গিয়েছে এমন ব্যক্তি।
৭	রিক্সাওয়ালা (মরশুমি চাষি)	রিক্সাওয়ালা
৮	কৃষিশ্রমিক (মরশুমি চাষি)	কৃষিশ্রমিক

*** বাংলাদেশে কলেজে (১৪ বছরের বেশি সময় পড়াশুনা করার পর) অথবা উচ্চমাধ্যমিক (১২ বছরের বেশি সময় পড়াশুনা করার পর) পাশ করে চাকুরি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছুক (সরকারি চাকুরি অথবা বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) অনেকে চাকুরি না পেলে চাষের কাজে যোগদান করে। কিন্তু চাষের কাজ খুব একটা লাভজনক হয় না। আবার উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও থাকে। এছাড়া এখানে উচ্চমাধ্যমিক ১১ বছরের শিক্ষা পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা অকৃষিজনিত শ্রমে নিযুক্ত হয়েছে। বেশ কিছু ব্যক্তি অকৃষিজনিত কাজেও নিযুক্ত। এরা পূর্ব ইউনিয়ন অর্থাৎ পরিচালন সমিতির প্রধানের দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এদের একজন অবিবাহিত ছাত্র। তাঁর জমির অংশ তিনি তাঁর দাদাকে দিয়েছেন। সেই জমির আয় পারিবারিক আয়রূপে গণ্য। কিন্তু তিনি কৃষিকর্মী হিসাবে গণ্য হতে পাবেন না।

অপর একটি বিষয় নিঃসন্দেহে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটি হল

অকৃষিজনিত শ্রম অর্থনীতিতে কতটা কার্যকর। একজন গ্রামবাসী (একটি উচ্চপর্যায়ের পরিবারের প্রধান) এই গবেষকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন যে, 'আমি ব্যবসা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পরিবারটি গ্রামের একটি বিশাল পরিমাণ জমির দায়িত্বে আছেন। এই উক্তিদুটি সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত, এই ধরনের পরিচয় প্রদান অন্যের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মন্তব্যে শ্রোতার মনে হতে পারে যে, বক্তা চাষের তুলনায় 'ব্যবসা' করাটা অনেক সম্মানজনক কাজ বলে মনে করে থাকেন।[৪৫]

এই বিষয় সম্পর্কে অন্য একটি চমকপ্রদ ব্যাপার হল এই যে, যদি এই গ্রামটিকেই দৃষ্টান্তরূপে নির্বাচন করা হয়, তাহলেও দেখা যাবে যে, অকৃষিজনিত শ্রম থেকে গ্রামের যে আয় হয় তা অতি নগণ্য। কিন্তু কৃষির উৎপাদনের উদ্বৃত্তকে পুনর্বার কৃষিতে বিনিয়োগ না করে সেই উদ্বৃত্তকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অকৃষিজনিত কাজে লগ্নী করাটাও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই পরিস্থিতিতে নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে থাকেন এমন গ্রামবাসীদের (মালিক-কৃষক শ্রেণীর) অবস্থাকে পর্যালোচনা করে দেখা যাক। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র কৃষিকার্যে নিয়োজিত পরিবারগুলিকে (প্রধানত তিনটি উচ্চশ্রেণী এবং কিছুটা চতুর্থশ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে) 'সাধারণ' বা 'মোটামুটি অবস্থায়' আছেন — এই দুই পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীকে নির্দেশ করে থাকে। এই বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকস্তরে কৃষিশ্রমে বাইরের লোককে নিয়োজিত করা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে আলোচনা করতে হবে।[৪৬] কিন্তু একই সময়ে অপর আর একটি বিষয়ের আলোচনাও বিশেষ প্রয়োজন। সে বিষয়টি হল যেসব কৃষক নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করেন তাঁদের সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং অন্যদিকে নতুন কোনো কাজে নিয়োজিত কৃষকদের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। কিন্তু অকৃষিজনিত শ্রমে লিপ্ত ব্যক্তিদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উল্লিখিত বিষয় অপেক্ষা বিশেষভাবে পৃথক। প্রথমে পর্যালোচনার বিষয় হিসাবে বলতে চাই যে, এই ধরনের ব্যক্তি গ্রামের শ্রমিক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ (কৃষি-মজুর শ্রেণীকে দিনমজুর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন)।[৪৭] সর্বোপরি, এই ধরনের পরিবারের বেশিরভাগ মানুষই আইনত ভূমিহীন। ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত পরিবারের সদস্যরাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চাষের ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক কালে দিনমজুর শ্রেণীও যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের আলোচনা করতে চাই। তাহল আগে এইসকল দিনমজুরদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতেন মূলত মালিক শ্রেণী। কিন্তু বর্তমানে এই ছবি প্রায় চোখেই পড়ে না। এই ধরনের শ্রমিক শ্রেণীর (অর্থাৎ দিনমজুরিতে নির্ভরশীল শ্রমিক শ্রেণীর) সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই সকল দিনমজুরদের অধিকাংশই শুধু প্রাথমিক ও প্রতিষ্ঠানিক স্কুলশিক্ষার চৌহদ্দির বাইরে, তাই নয় — এক বৃহদাংশ সম্পূর্ণ নিরক্ষর। সুতরাং এই শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ গ্রামবাসীরই মতামত এবং ধারণা স্বচ্ছ বা প্রত্যয়ী নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইতিমধ্যে কৃষিজনিত শ্রম থেকে অকৃষিজনিত শ্রমে নিজেদের পেশার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন

এমন গ্রামবাসীর সংখ্যাও লক্ষণীয়, অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, পুরোপুরিভাবে কৃষিতে নিযুক্ত পরিবারের পিতাপুত্র সকলেই কৃষিকর্মে লিপ্ত (বিশেষত ৮নং শ্রেণীভুক্ত পরিবারগুলি)। উল্লিখিত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সকল পরিবারের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য গ্রামবাসীদের তুলনায় নিম্নমানের এবং এই পরিবারগুলি আর্থ-সামাজিক দিকও গ্রামের নিম্নস্তরের শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে প্রতিপন্ন হয় বললেও ভুল হবে না। এই শ্রেণীভুক্ত গ্রামবাসীদের (উল্লিখিত নিম্নস্তরের শ্রেণী) কর্মবিহীন দিনের (আংশিক সময়ের কাজকে ধরে) সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।[৪৮] বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র এই গ্রামেই নয়, অন্যত্রও এই রকম শুধুমাত্র কৃষি-নির্ভর জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বিশেষ কিছুই উন্নত বলে লক্ষ্য করা যায় না।[৪৯] এক্ষেত্রে কোনো কারণে কেবল নিজেরাই নয়, তাঁদের সন্তানদেরও এই কাজে নিয়োজিত করেছেন সেটা নির্ধারণ করা সহজ নয়।[৫০] যাই হোক না কেন, এই ধরনের কৃষি-ভিত্তিক কাজের বর্তমান অবস্থা এবং তার ভবিষ্যৎ বিভিন্নভাবে সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে।

পরের পর্যায়ে, উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া অপরাপর অকৃষিজনিত শ্রমের বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে চাই যে, সামাজিক শ্রেণীর বিভিন্নতা অনুসারে জীবিকা কাঠামোরও বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীভুক্ত (উপরিল্লিখিত বিভাগের ১ এবং ২) জনসাধারণের ক্ষেত্রে চাকরি এবং ব্যবসা প্রধান উপজীবিকা। এইসব চাকুরিজীবীদের অধিকাংশই (সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে) প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত। ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছোটো দোকানের মালিক। অন্যদিকে নিম্নস্তরের (উপরিল্লিখিত ৪ নং শ্রেণী) জনসাধারণের মধ্যে চাকরি বলতে সামরিকবাহিনী বা পুলিশবাহিনীতে নিযুক্ত (নিম্নপর্যায়ের পদে) ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। আর এই ৪ নং শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসায় নিযুক্ত তাদের অধিকাংশই ছোট ছোট স্টলে ব্যবসায় রত অথবা হকারি ব্যবসায় নিযুক্ত। এই পর্যালোচনার ফলে দেখা গেল যে, সামাজিক স্তরভেদে জীবিকারও স্তরভেদ হয়ে থাকে। আবার স্বাভাবিকভাবেই এদের উপার্জন এবং সামাজিক প্রতিপত্তির ফলস্বরূপ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধারও পরিবর্তন হয়ে থাকে।[৫১]

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিজীবীদের বেশীরভাগই উচ্চশ্রেণীভুক্ত মানুষ। ব্যতিক্রম হিসাবে ষষ্ঠ শ্রেণীকে ধরা যেতে পারে। এই ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্রদের যদি এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা না হয় তাহলে দেখা যাবে বাকি অন্যান্যদের মধ্যে বেশিরভাগই আপ্ত সহায়ক, দেহরক্ষী, পুলিশ অথবা মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরিরত ব্যক্তি।[৫২] কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এই ষষ্ঠ পর্যায়ের অন্তর্গত মানুষজনের মধ্যে স্বাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশি।[৫৩] উচ্চশ্রেণীর জনসাধারণের পরেই এই বিভাগের মধ্যে হাইস্কুলে পড়াশোনা করা মানুষের সংখ্যা চোখে পড়ার মত। এখানে অপর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই শ্রেণীর একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ দক্ষ-শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত।[৫৪] দক্ষ-শ্রমিক বলতে বোঝায় এক বিশেষ কৃৎ-কৌশল পারদর্শী শ্রমিক শ্রেণী। এই শ্রেণীর কাজের নিরাপত্তা রয়েছে এবং আয়েরও নিরাপত্তা রয়েছে। সুতরাং এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাসীরা ভূমিহীন হলেও আয়ের দিক থেকে যথেষ্ট উচ্চপর্যায়ে রয়েছেন, যদিও এ-ব্যাপারটা গ্রামবাসীরা, বিশেষত 'পরিবার'গুলি সবসময় মেনে নেন না।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত অকৃষিজনিত শ্রমের প্রত্যেকটিকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করলে কেবল পৃষ্ঠার সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুটি প্রধান বিষয়ের বিশ্লেষণ না করলে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হবে না। এই দুটি প্রধান বিষয়ের একটি হল নিত্যযাত্রী (commuter) এবং অপরটি প্রবাসী। এই দুই শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত বিশেষত্ব। বর্তমানে নিত্যযাত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি এবং মহানগরী সংলগ্ন গ্রামগুলির ক্ষেত্রে কম সময়ে যাতায়াত সম্ভব বলে সেইসব এলাকার প্রচুর মানুষ নিত্যযাত্রায় অভ্যস্ত।[৫৫] কিন্তু 'k' গ্রামটির ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে বাসে যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও নিত্যযাত্রী বড় একটা দেখা যায় না। অন্যদিকে প্রবাসী-গ্রামবাসীর (অর্থাৎ যেসব গ্রামবাসী অন্যত্র বসবাস করছেন) সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। এর মূল কারণ বাস ভাড়ার বৃদ্ধি।[৫৬] বাস ভাড়া বেশি হলেও সেই পরিমাণ আয়ের সংস্থান থাকলে নিশ্চয় নিত্য বাসে যাতায়াত সুবিধাজনক। কিন্তু যথেষ্ট আয়সম্পন্ন বৃত্তি বা কাজে মফস্বলের মানুষ যোগ দেবার সুযোগ পান কম। এই ধরনের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চমহলে পরিচিতি, চেনাশোনা (কিছু উচ্চপদ ব্যতিরেকে) অত্যন্ত প্রয়োজন। ফলে মফস্বলের মানুষ এই ধরনের চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। এই ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য তুলনামূলক গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই আলোচনার ফলে বলা যেতে পারে যে, স্বল্প হলেও বাংলাদেশে নিত্যযাত্রী এবং প্রবাসী গ্রামবাসীদের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিস্থিতি খুবই প্রভাব ফেলে থাকে।

বর্তমানে অন্য আর একটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তাহল কৃষি মজুরদের একাংশ রিক্সাওয়ালার জীবিকায় চলে গিয়েছেন। এখানে রিক্সা কথাটির অর্থ তিন চাকার সাইকেলের মত গাড়ী যা জাপানি জিন্‌রিকিশার সমার্থক একটি বহুল প্রচলিত যান, যা বাংলাদেশে একটি অতি-প্রয়োজনীয় যান-এর গুরুত্বেও উঠে এসেছে। এটি বাংলায় ব্যবহৃত একটি শব্দ। শহরে এবং গ্রামে রিক্সা স্বাভাবিক যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'k' গ্রামে প্রয়োজন ও প্রত্যাশার অনুরূপ উপার্জনের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হলেই কৃষি মজুর জীবিকারও এক বৃহদাংশ অকৃষিজনিত শ্রমে নিযুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। এই শ্রেণীর অর্ধাংশ গ্রামে বসবাস করেই সংলগ্ন বাদার এলাকায় শ্রমিক বা মজুরের ঠিকা কাজে নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট অর্ধাংশ বড় শহরে (এই গ্রামের ক্ষেত্রে চিটাগাং বা চট্টগ্রাম) গিয়ে বাসা নিয়ে থাকেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৮০-র দশকে বিশেষত ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে এই গ্রামের কৃষি শ্রমিকের একাংশ রিক্সাওয়ালাতে পরিণত হয়।

সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৮০ সালের প্রথমার্ধ থেকে এই গ্রামে সেচ ব্যবস্থার শুরু হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা বেশ উন্নতও হয়েছে। এই নতুন সেচ প্রথার প্রবর্তনের সাথে সাথে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরী হয়।[৫৭] কৃষি-কেন্দ্রিক 'চাকরি'-র অগ্রগতি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধকার অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে একমত। কিন্তু অপর এক শ্রেণীর অর্থনীতি-বিদদের মতানুযায়ী[৫৮] যেসব ব্যাখ্যা রয়েছে লেখক তার সঙ্গে একমত নন। তথাকথিত সবুজ বিপ্লব-এর চাষের অগ্রগতির (বিশেষত যখন কৃষিভিত্তিক জীবিকার ক্রমশ অগ্রগতি

হয়েই চলেছে) সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতে অকৃষিজনিত শ্রমের প্রতি আগ্রহের প্রবণতা অস্বাভাবিক নয় কী? আবার শুধুমাত্র এইদিকে লক্ষ্য করাটাও ভুল। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।[৫৯] এর কারণ যাই হোক না কেন, এইরকম কৃষি জনিত দিনমজুরের পেশা থেকে অকৃষিজনিত শ্রমে জীবিকার পরিবর্তনের ধারা কেবলমাত্র এই গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়।[৬০] অন্যান্য গ্রামেও লক্ষণীয়।

৩.৪ চার ধাপের কাঠামো

এই গ্রামের জীবিকা কাঠামোর আলোচনার ক্ষেত্রে সারণি ঃ ৪ অত্যন্ত উপযোগী। এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের ঘটনা স্বতন্ত্র দৃষ্টান্তরূপে আলোচিত।

সারণি ঃ ৪ চার ধাপের কাঠামো (তিনটি পরিবর্তনশীল ধারা)*

বিভাগ ক্রম	অর্থনৈতিক পরিকাঠামো	কৃষি অবস্থার ধারা	সামাজিক স্তরের পরিবর্তন **	গ্রামের বাইরে চলে যাওয়া
১	কৃষি (+)+ অকৃষিজনিত	i আংশিক সময়ের	i উচ্চবর্গ/সহায়তা কাজ	i প্রচুর
২	কৃষি (+) + অকৃষিজনিত	(লেখচিত্র)	(স্বনিয়োজিত)	
৩	কৃষি (+)	ii দক্ষতা	ii	ii
৪	কৃষি (-) + কৃষিশ্রম	iii আংশিক সময়ের	সহায়তা/নিম্নবর্গ	স্বল্প কাজ
৫	কৃষি (-) + কৃষিশ্রম	(পছন্দ করুক বা না করুক)	(স্বনিয়োজিত)	
৬	অকৃষি	iv	iii সহায়তা/উচ্চবর্গ	iii প্রাচুর্য্য
৭	কৃষিশ্রম, অকৃষিজনিত	দক্ষতা		iv স্বল্প
৮	কৃষিশ্রম		iv সহায়তা/নিম্নবর্গ	

* নির্ভরশীল, এর তিনটি স্তর বাদে।

** এখানে উল্লিখিত 'উচ্চবর্গ', 'স্বনিয়োজিত', 'নিম্নশ্রেণী বা বর্গ' বলতে গ্রামের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাভিত্তিক চিন্তাজনকে বোঝানো হচ্ছে। এই আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে ভিন্নভাবে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু এই আলোচনায় বিভাজনগুলি এই ভাবেই দেখানো হচ্ছে। এইসব অবস্থাগুলি বিভিন্ন পরিবার প্রধানের মত অনুযায়ী করা। বর্তমান পরিবার প্রধানের মৃত্যু পর্যন্ত এই ধরনের বিভাজনের কার্যকারীতা চিন্তা করা হয়ে থাকে।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টিতে জোর দিতে হয়, তাহল প্রবণতা। এ যাবৎ অনুযায়ী উদ্ধত্ত শ্রেণীগুলির প্রধান পেশার পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু ব্যবসার দিকে ঝোঁকটা প্রবল। আগে উল্লেখ করেছি যে, ইতিমধ্যে একটি শ্রেণী নিজেদের জীবনধারার এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু সেটাই যে একমাত্র পরিবর্তন তা নয়। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্তরায় এবং তথ্য আহরণ সংক্রান্ত বিষয়েও বিভিন্ন বাধা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশিত তথ্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারছি যে, এই গ্রামবাসীদের মধ্যে দুটি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একটি হল চাষের ক্ষেত্রে ভাগচাষ (জমিকে দার বা ইজারা দেওয়ার প্রথা) অপেক্ষা শ্রমিকদের কৃষিজনিত চাকুরির দিকে ঝোঁক। অন্যটি হল কৃষি উপার্জনের উদ্বৃত্ত, শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে পুনর্বিনিয়োগের পরিবর্তে অকৃষিজনিত কাজেও বিনিয়োগ করা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী উল্লিখিত পরিবর্তন দুটি প্রায় একই সময় থেকে

ঘটেছে।[৬১] পূর্ববর্তী বিভিন্ন আলোচনার উপর ভিত্তি করে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, অকৃষিজনিত শ্রম নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করার দিকে এগিয়ে গেলে (বিশেষত ব্যবসায়িক দিকে) সেটাকে প্রধান পেশার পাশাপাশি কাজ হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু অপরদিকে স্বনিয়োজিত শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকাজকেই প্রধান করে নিয়েছেন বলেই মনে হবে। উচ্চশ্রেণীর মানুষজনের তুলনায় এই কৃষিকর্মে নিয়োজিত শ্রেণীর অধিকাংশই উচ্চবিদ্যালয়ের অর্থাৎ হাইস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরও স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তোলার কারণ হিসাবে বেশ কিছু গোঁড়া মতবাদ কাজ করে থাকে।[৬২] বস্তুত শিক্ষাগ্রহণের বিরুদ্ধে যুক্তি সংগ্রহ বা শিক্ষার সুযোগকে প্রত্যাখ্যানের চিন্তাভাবনাকে গোঁড়ামি ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবা যায় না। এই শ্রেণীর মানুষজনের কৃষি আশ্রিত জীবিকার কাঠামো বা প্রকৃতি বিষয়ে অপরাপর অঞ্চলেও গবেষণা চলছে।[৬৩] সারণি অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁদের পৈত্রিক জমি থেকে যে পরিমাণ ফলন তাঁরা পেয়ে থাকেন তা যথেষ্ট নয়। ফলস্বরূপ বাধ্য হয়েই আংশিক সময়ের জন্য অতিরিক্ত কাজে নিয়োজিত থাকতে হয় তাঁদের। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, এই ধরনের মানুষদের কৃষিকর্মে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে, যদিও গড়পড়তার হিসাবে কৃষি থেকে প্রয়োজনের অর্ধেক বা তারও কম আয় হয়। এটা নিঃসন্দেহে নির্ভরশীল আয়ের পর্যায়ে পড়ে না। ভূমিহীন শ্রেণীর ক্ষেত্রে কৃষিজনিত শ্রম বা অকৃষিজনিত শ্রম এই উভয়ের মধ্যে যে কাজে তারা দক্ষ সেই কাজেই যোগদানের প্রবণতা তাঁদের মধ্যে বেশি। সারণি ঃ ৪-এ উল্লিখিত ৭ নং শ্রেণীর ক্ষেত্রে পরিবারের সংখ্যা কম এবং এই সকল পরিবারের সদস্যদের কোনদিকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা ক্রমশ এগোচ্ছে সেটাকে বুঝে দেখতে হবে।[৬৪] 'প্রবণতা'-র বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখার বিষয় হল এই যে, প্রধান এবং অপ্রধান বা আংশিক সময়ের কাজের ধরন। কিন্তু এটা বলা দরকার যে, প্রধান কাজ এবং অপ্রধান কাজ এই বিষয়দুটি খুবই সূক্ষ্মভাবে পাশাপাশি সচল। যাই হোক, এই দুটি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধান কাজ এবং অপ্রধান কাজ এই দুটিকে গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিবারের (বিশেষত পরিবার প্রধানের) নির্দেশ এবং ইচ্ছা বিশেষভাবে সক্রিয়। অন্য অর্থে এটিকে 'পারিবারিক পরিকৌশল' বলা যেতে পারে।[৬৫] পরিশেষে, সার্বিক আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, কৃষিজনিত কাজের থেকে অকৃষিজনিত কাজে পেশার পরিবর্তনের প্রবণতা ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে চলেছে।[৬৬]

এ-পর্যায়ে বর্তমানের অগ্রগতি সম্পর্কে (বলতে গেলে নিকট ভবিষ্যতে যা হতে পারে) সেটা ভেবে দেখতে চাই। 'উদ্বৃত্ত' শ্রেণীটি চাষের উৎপাদন থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। উপরন্তু তারা আংশিক সময়ের কাজ থেকেও আয় করে। 'স্বনিয়োজিত' শ্রেণীটি চাষের উৎপাদনের থেকে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়। কিন্তু একবার কোনোরকম বিপর্যয় (বিশেষত প্রাকৃতিক দুর্যোগ) ঘটলে পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই একটি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীনও হয় এবং সেই ক্ষতিটি পূরণ করে নেওয়া স্বনিয়োজিত শ্রেণীর পক্ষে বেশিরভাগ সময়েই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এইরকম অবস্থা অন্যান্য ছোটো শ্রেণীর ক্ষেত্রেও একই প্রকার। সুতরাং বলা যেতে পারে যে,

সীমিত কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং অন্যান্য আয়কে একত্র করে জীবিকা নির্বাহ করে চলছে এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত থেকে অর্জিত আয়ের সুযোগ খুব একটা নেই। বিশেষত চাষ-আবাদের দিক থেকে দেখা যাবে যে, কোনো বিপর্যয় ঘটলে সেটা পূরণ করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম থাকে। ভূমিহীন শ্রেণীর দিকে দেখলে ভিন্ন দুটি পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমত অকৃষিজনিত শ্রমিকশ্রেণী, (জনমজুরদের ধরে নিয়েই) যাঁরা অন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতা-নির্ভর কাজে লিপ্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন জীবন ধারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া নগদ টাকা আয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তাদের নিশ্চিত রোজগার থাকে। কিন্তু উপার্জনশীল সদস্যের নিজের কোনো বিপর্যয় (যেমন অসুখ-বিসুখ) হলে সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। ফলে নিজেদের জীবনযাত্রা যতটা সম্ভব নিশ্চিত করার দিকে এই শ্রেণীর মানুষের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, 'চাকুরি' অভিহিত জীবিকাতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিবারে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প-সঞ্চয়কে কোনোরকমে কাজে লাগিয়ে অথবা লগ্নী করে অবস্থার উন্নতির চেষ্টাও বেশ কিছু ক্ষেত্রেই দেখা যায় (এটা যে কেবল চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়)।[৬৭] গ্রামবাসীদের অবস্থা উল্লিখিত চাকুরিজীবী শ্রেণীর তুলনায় ভিন্ন। এটা বলা হলেও, কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, সঞ্চয় সংক্রান্ত ব্যাপারটিতে তাঁরা বেশ তৎপর। অন্যদিকে উল্লিখিত কৃষিশ্রমে পুরোপুরিভাবে নিযুক্ত শ্রেণীর বেশির ভাগই নিজেদের উন্নতির দিকে তথা দিন-দৈনিক-দারিদ্রতা সমাধান করবার কঠিন পরিস্থিতি সামলে নিকট বা দূর ভবিষ্যতে নির্ভরতার লক্ষ্য রাখেন না। এর ফলস্বরূপ, কোনোদিন না কোনোদিন তাঁদের উদ্বাস্তুতে পরিণত হবার ভয় থেকেই যায়। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতেও উন্নত অবস্থা এবং হতদরিদ্র দশার এক আশ্চর্য স্ববিরোধী সহাবস্থান এখানে ঘটছে এমন মনে করলেও ভুল হবে না।[৬৮]

তৃতীয়ত, প্রবাসী গ্রামবাসীদের সমস্যার ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখা যাক। উচ্চ-বর্গের গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবাসে বসবাসকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাঁদের বেশিরভাগই আয়ের দিক থেকে এবং সামাজিক সম্মানের দিক থেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বিপরীতে 'স্বনিয়োজিত' অর্থাৎ স্বল্প আয়-বৃত্তের মানুষজন প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মী নিজেদের জমি নিজে চষেন সুতরাং নগরবাস-কেন্দ্রিক জীবিকাবৃত্তে তাঁরা পৌঁছাতে পারেন না। ফলত কৃষিকর্মী জনসমাজে গ্রামত্যাগ বা শহরবাস বিশেষ চোখে পড়ে না। অকৃষিজনিত কাজে দক্ষতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে (কৃষি-জনমজুরদের ধরে নিয়েই) নিজেদের পছন্দমত কাজ পেলে স্থানীয় কর্মক্ষেত্রে (শহরকেও ধরে) অথবা নিজের জায়গার বাইরের কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য কাজের প্রকৃতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই থাকে। প্রবাসী জনসমাজও এই ধারারই অন্তর্ভূত।

উপরন্তু সময়বিশেষে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাজেও এঁরা যোগদান করে থাকেন। এঁরাও ভূমিহীন শ্রেণীরই অন্তর্গত। এঁদের পরবর্তী শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা কিন্তু একেবারেই আলাদা। এঁদের অধিকাংশই কৃষিশ্রমিক এবং এঁরা ধানচাষের মরসুমে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন। ফলত, ফলনের মরসুমে এঁদেরকে অন্যান্য এলাকার হয়েও কাজ করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু এঁরা কখনোই পাকাপাকিভাবে গ্রামত্যাগ

করেন না।[৬৯] কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, (পূর্বেবর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী) এই শ্রেণীর জীবনযাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর এবং কখনও কখনও আত্মীয়-স্বজনের পরিবারের (অর্থাৎ পরিজনের) কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কোনোরকমে জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু গ্রামের বাইরে গিয়ে বসবাস করলে এই সাহায্যের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। এই পর্যন্ত প্রবাসী এবং স্থায়ীবসতি মানুষজনের জীবিকা প্রকরণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

উল্লিখিত বর্ণনা এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মডেল হিসাবে দেখানো হয়েছে একটি মাত্র গ্রামকে। কিন্তু এই মডেল গ্রামটির জোরালো বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের (সারণি অনুযায়ী) যে বিভাজন রয়েছে তা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত অবস্থা তা এর পরবর্তী পর্যায়ে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে।[৭০]

৪. বাংলাদেশের গ্রামের পুনরালোচনা

৪.১ বিদ্যমান অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?

এই পর্যায়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, সাম্প্রতিককালে অকৃষিজনিত শ্রমের অস্তিত্বের ব্যাপারটিকে বাদ দিয়ে গ্রামের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে না ধরে নিলে গ্রামের পারিপার্শ্বিকতার বিবরণই যে দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও বেশ কিছু সংখ্যক গবেষক এই রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার (অর্থাৎ অকৃষিজনিত শ্রম-সংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার) বিষয়ে আলোচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রচেষ্টা কেন করেননি সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা অসুবিধাজনক।

তবে বলা যেতে পারে যে, বিশেষ কিছু বিষয়ের জন্য এই সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব দেখা গিয়েছে। প্রথমত, বেশিরভাগ গবেষকদের গবেষণা-সংক্রান্ত দুর্বোধ্য সমস্যাই এর প্রধান কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। শহরের বাইরে একটু বেরোলেই যা নজরে পড়ে তা হল গ্রাম্য পরিবেশ। এই প্রবন্ধেও সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা কখনই উপেক্ষা করা যায় না। উপরন্তু বাংলাদেশে (হিন্দু নাগরিক বা মুসলমান নাগরিক উভয়ের ক্ষেত্রেই) শহর (শহর জনিত বা নাগরিক) এবং গ্রাম (গ্রাম্য) নামক দুটি পরস্পর বিরোধী অবস্থার চিত্র বাংলাদেশের গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।[৭১] কিন্তু এই রকম স্পর্শকাতর বিষয়কে আলোচ্য বিষয়বস্তু করে গবেষণার অন্যপ্রকার বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে সেটাও অনস্বীকার্য। তুলনামূলকভাবে বিদেশী গবেষকরা (বিশেষত উন্নতদেশের গবেষকরা) উচ্চতর গবেষণায় রত। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই সাহায্য বা গবেষণার জন্য বৃত্তি ছাড়াই বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করছেন। এছাড়া এই ধরনের সংস্থায় জড়িত থাকলে সেই-সব সংস্থার পছন্দমত গবেষণার বিষয়কে বেছে নিলে গবেষণার কাজ সহজসাধ্য হয়।[৭২] স্থানীয় গবেষকদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এঁদের বেশির ভাগই জাতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে গবেষণা করায় বিশেষ আগ্রহী। এছাড়া তাঁরা তাঁদের নিজের সুযোগ এবং

ইচ্ছা অনুযায়ীও গবেষণার কাজ করে থাকেন।[৭৩]

এই সকল গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে 'কাঠামো' সংক্রান্ত দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। প্রথমে বলা যেতে পারে যে, কখনো কখনো 'কৃষিভিত্তিক গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা'-কে 'কৃষিভিত্তিক শ্রমিক বা কৃষিশ্রমিক' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সর্বমোট পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা না করে তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে প্রধান পেশা এবং অপ্রধান পেশার মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু এই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা প্রায় অসম্ভব। আবার অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ (বা তিনগুণ) আয়ের কথা চিন্তা না করে প্রধান পেশারূপে গণ্য কাজকে আলোচনার বিষয় বলে ধরে অন্য সবকিছুকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার গ্রামবাসীদের মধ্যেও বেশিরভাগই অকৃষিজনিত পেশায় নিযুক্ত থাকলেও পেশার প্রসঙ্গে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সাধারণভাবে 'চাষ'-ই তাঁদের জীবিকা (অর্থাৎ চাষই তাদের আয়ের প্রধান উৎস) বলে থাকেন। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রশ্ন করা হলে গ্রামবাসীরা কখনোই বলেন না যে, তাঁরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাগচাষীর কাজ করেন অথবা নিজের জমি চাষের ফলে যে উৎপাদন হয় তাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না বলে অন্য কাজে অংশ নিতে বাধ্য হন।[৭৪] এই পর্যায়ে সবথেকে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসায় নিযুক্ত উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে। ফলত, গ্রাম্য মানুষ চাষী — এই রকম একটি ধারণা অতি প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন বক্তব্য থেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে. কেবল 'গ্রাম' এবং 'গ্রামের মানুষ'-ই নয় 'কৃষক সমাজ' এবং 'কৃষক' এই দুটি শব্দও গবেষণার বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব ফেলে। শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী গবেষণা করা ভাল, না অন্য কোনো উপায়ে গবেষণা করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে তা গবেষকদের নিকট সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। জমির মালিকানা এবং এই মালিকানা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যাকে নিয়ে বিষেশষভাবে পর্যালোচনাও অত্যন্ত জরুরি। কেবল জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় (অথবা কেবল সেই মালিকানাসংক্রান্ত বিষয় থেকে শুরু করে) নিয়ে আলোচনা করলেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা অনস্বীকার্য। গ্রামকে একটি ভৌগোলিক বিভাগে চিহ্নিত করে সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তিদেরই কেবল গ্রামের অধিবাসী হিসাবে ধরে নিয়ে আলোচনা করলে অকৃষিজনিত শ্রমে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি বিশেষত যাঁরা প্রবাসী (অর্থাৎ গ্রামের বাইরে বসবাস করছেন) তাঁদের উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু অকৃষিজনিত শ্রম থেকে যে আয় হয় অথবা প্রবাসী গ্রামবাসীরা যে উপার্জন গ্রামে নিয়ে আসেন সেটাও গ্রামের জীবনধারার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪.২ গ্রামের 'প্রকৃত অবস্থা' এটা বিশ্লেষণ করে দেখা

এখন পর্যন্ত যে সকল বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা করা হল তাতে এটুকু পরিষ্কার যে, 'গ্রাম' ='কৃষক সমাজ' বা 'গ্রামবাসী'= 'কৃষক' এই ভাবনাটা সঠিক নয়।[৭৫] গ্রামের পরিবারগুলির অধিকাংশই কমবেশি অকৃষিজনিত কাজে নিযুক্ত। অকৃষিজনিত শ্রমে, ব্যবসায় ইত্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা (গ্রামের) সমাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সংযুক্ত। বিশদভাবে বলতে গেলে,

অকৃষিজনিত শ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত উপজীবিকা হল বিভিন্ন কাজ, চাকরি ইত্যাদি। ফলস্বরূপ, এই ধরনের উপজীবিকা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ রাখার পক্ষে সহায়ক।[৭৬] এই রকম যোগাযোগ, অকৃষিজনিত উপজীবিকায় নিযুক্ত নয় এরকম মানুষজনকেও (ব্যক্তিগত নির্বাচন / প্রবণতা উপেক্ষা করেই) বিভিন্ন আর্থিক কর্মে নিযুক্ত হতে বাধ্য করে। যেমন কর প্রদান, বিভিন্ন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়-এর মাধ্যমে টাকা বা অর্থের বিনিময় গ্রামের বাইরের জগতের সঙ্গে গ্রামের জগতের সংযোগ ঘটিয়ে থাকে।[৭৭] আবার বলা যেতে পারে যে, এই যোগাযোগ বা কর্মপ্রকল্প বিভিন্ন প্রজেক্ট -এর মাধ্যমেও সংঘটিত হয়ে থাকে। উপরন্তু, উপরের আলোচনার ভিত্তিতে দেখতে পাচ্ছি যে, উপস্থিত গবেষণায় কেবলমাত্র, গ্রামের জীবিকাসূত্রে প্রবাসী শ্রেণীর সম্পত্তি বা আয়ের ব্যখ্যাই মুখ্য নয়। কিন্তু যদি তাঁদের আয়ের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয় তাহলে এক বিপুল সংখ্যক পরিবারের জীবনধারনের সঙ্গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই দৃটিভঙ্গিতে দেখলে গ্রাম তাদের অস্তিত্বের এবং কাজের ভিত্তিতে শহরকেও গ্রামের অর্থনীতিতে এনে ফেলেছে বলে মনে হয় না কী? তাহলে গ্রামই বর্তমান সমাজের প্রতিভূ নয় কী?

এর পরবর্তী পর্যায়কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কেবল এই গ্রামেই নয়, দেশের প্রতিটি গ্রামেই কৃষিযোগ্য জমিগুলির সীমানা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে এক হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এছাড়া জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণগুলির ফলে গ্রামের মানুষকে (গ্রামের বাইরে) অকৃষিজনিত কাজে নিযুক্ত হবার জন্য প্রণোদিত করছে। এইরকমভাবে বিভিন্ন পেশার তুলনামূলক বৃদ্ধি সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তন আনছে। ফলস্বরূপ, গ্রামের জীবিকা কাঠামোতেও স্বাভাবিকভাবেই এক বিশাল পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সুতরাং গ্রামের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে গবেষকদের কাছে যে একটি চমকপ্রদ গবেষণার বিষয় সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

৫. উপসংহার

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব গবেষণা হয়েছে সেইসব গবেষণার ফলাফল অনুসারে দেখা যায় যে বাংলাদেশকে 'কৃষিপ্রধান দেশ' পরিচয়ে গণ্য করে এবং বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামকে 'কৃষক সমাজ' হিসাবে চিহ্নিত করে, গ্রামের সমস্ত বসবাসকারীদের 'কৃষক' বলে গণ্য করায় কোনো দ্বিধা ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে কেবল শহরের নিকটবর্তী এলাকাতেই নয়, প্রত্যন্ত গ্রামেও 'কৃষক' এই আখ্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে যে ধারণা আছে তা দুটি প্রধান ভিত্তির উপর স্থাপিত রয়েছে।

প্রথম ভিত্তিটি হল প্রতিটি গ্রামেই ব্যক্তিগত খামার বাড়ির অস্তিত্ব যেটা সাধারণত একটি গ্রামের সমস্ত বাড়িগুলির প্রায় তিরিশ শতাংশ (৩০%)।[৭৮] আবার শুধুমাত্র এই ব্যাখ্যা থেকেই বাংলাদেশের গ্রামগুলির 'কৃষক সমাজ' হিসাবে গণ্য হয়েছে এটা ভাবা উচিৎ নয়। অন্যভাবে দেখলে 'কৃষক' এই ধারণার অন্য একটি ভিত্তি হল 'শহর অথবা দেশের সমাজের একাংশের প্রতিভূ।' এই ভিত্তি অনুসারে বলা যেতে পারে যে, গ্রাম

কৃষিকর্ম থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শহরের বাজারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।[৭৯] এছাড়া রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রাম সাধারণভাবে 'আশ্রিত ও ক্ষতিগ্রস্ত' পরিচয়ে গণ্য হয়ে থাকে।[৮০] ফলে গ্রাম বাস্তব অবস্থাকে কখনোই প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয় না।[৮১] ইংল্যাণ্ডে প্রচারিত 'দুষ্কৃতির কাজ' (Satanic Verses)-এর ব্যাপারে প্রতিবাদে হওয়া সোচ্চার এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে সাদ্দামের শক্তিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উৎসাহিত হওয়া,[৮২] মধ্যপ্রাচ্য অথবা জাপানে গিয়ে নিজস্ব জীবিকা বেছে নিয়ে বসবাসকারী বিদেশিদের অধিকাংশই হলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ।

এপর্যন্ত বাংলাদেশের 'কৃষক' অথবা 'কৃষক সমাজ' সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে। শহর সম্পর্কেও বহু গবেষণা হয়েছে। এমনকি প্রবাসীদের কথাও বহু গবেষণায় স্থান লাভ করেছে।[৮৩] কিন্তু বিশদভাবে বলতে গেলে অকৃষিজনিত শ্রমের যোগসূত্র হিসাবে গ্রামের যে ভূমিকা (বিশেষত নিত্যযাত্রী এবং প্রবাসী গ্রামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে) সেটি ততটা আলোচিত হয়নি। বর্তমানে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে সম্পর্কের দিকটা নিয়ে এবং একটা সামগ্রিক ব্যবস্থার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করে সমগ্র পরিস্থিতির ব্যাপকতা সংক্রান্ত গবেষণা অত্যন্ত জরুরি।

সূত্র নির্দেশ

১ Wolf 1966, 1973 1969, Shanin 1978, এর পূর্বে Kroeber অথবা Redfield-এর গবেষণাপত্র এবং সেই একই সময়ের Foster-এর বিভিন্ন প্রামাণিক গবেষণাপত্র রয়েছে। Wolf-এর চিন্তাধারা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী গবেষকদের মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছে। Wolf-এর পরবর্তী গবেষকদের মধ্যে Shanin-এর গবেষণাপত্রও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

২ এই প্রবন্ধে যে সকল 'বাংলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই 'বাংলাদেশে' ব্যবহৃত 'বাংলা' শব্দ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশ মুসলিম (মতভেদে সাতাশি শতাংশ)। ১৯৮৮ সাল থেকে ইসলাম ধর্ম জাতীয় ধর্ম হিসাবে গণ্য হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কুড়ি বছর (ভারত এবং পাকিস্তানের বিভাজনের প্রায় চল্লিশ বছর) পার হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থাতে বাংলা ভাষাটাই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের মধ্যে সংঘটিত সংঘাত সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ এবং আঞ্চলিক পরিবেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পরিস্থিতির মূলে কী ধরনের চিন্তাধারা কার্যকরী তা পরবর্তী গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

৩ van Schendel 1981, p. IX.

৪ Hara 1967, অন্যান্য দেখুন।

৫ Bertocci 1972 দেখুন।

৬ Wood 1978 দেখুন।

৭ van Schendel 1981 দ্রষ্টব্য।

৮ Ibid., p. 22 (note 31) দ্রষ্টব্য।

৯ Jansen 1987 দেখুন।

১০ এই বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে *Journal of Peasant Studies*-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। (Bhaduri, Rahaman and Arn 1986,1988, Pandian 1987, Khan 1987, Feldman and Mccarthy 1987, Rahman 1988) কিন্তু van Schendel-এর প্রবন্ধেও এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, van Schendel 1981, p. IX.

১১ Cain 1985, 1986; Stokes, Wayn and Bulatao 1986.

১২ van Schendel 1981, এখনও পর্যন্ত আলোচিত বিষয়ের একাশি শতাংশ রয়েছে (ফুজিতা 1988)। জাতীয় আদমশুমারির অনুযায়ীও ফলাফল একই। সেই মূল তথ্যের ভিত্তিতেই সমগ্র বিষয় আলোচিত।

১৩ Qadir 1960, Hara 1967, মূল 1969a অন্যান্য দেখুন।

১৪ বিশেষ বিষয় হিসাবে পরবর্তী বিষয়গুলি রয়েছে, মহারাজন 1988, দ্রষ্টব্য।

১৫ Adnan, 1980 দেখুন।

১৬ ভূমিহীন বলে অভিহিত 'চাষী' সম্পর্কে ধারণা একটি বিশাল ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নয়। পরবর্তী আলোচনায় সহজভাবেই 'ভূমিহীন' কেবল এই শব্দটিকেই ব্যবহার করতে চাই।

১৭ ফুজিতা 1988। এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌছানর ক্ষেত্রে পরবর্তী তথ্যকে কাজে লাগানো হয়েছে, BBS 1986।

১৮ Jansen 1986, p. 92 দেখুন।

১৯ বাংলাদেশের আঞ্চলিক পার্থক্য বিশেষত পূর্বদিকের এবং পশ্চিমদিকের যে পার্থক্য তা নিয়ে বহু তথ্যমূলক আলোচনা রয়েছে (তথ্য 1990) লক্ষ্যণীয়।

২০ পরবর্তী আঞ্চলিক বর্ণনাতে ইয়েলসনের তথ্য বিশেষভাবে আলোচিত (Jansen 1986)।

২১ এই অঞ্চলের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আউশ এবং আমন ধান এবং পাটকে প্রাধাণ্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০-র দশক থেকে সেচের ব্যবহারের ফলে বৃষ্টির জলের উপব কেবলমাত্র নির্ভর না করে অন্য জলকে কাজে লাগিয়ে চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সময়ে বিভিন্ন সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদনের মানবৃদ্ধির চেষ্টাও করা হয়েছে। ফলস্বরূপ আউশ ধান, যেটির উৎপাদনের নিশ্চয়তা কম তার উৎপাদনকে বাদ রেখে আমন ধানের ক্ষেত্রে সেচের জল ব্যবহার করে এবং বোরো ধানকে প্রাধাণ্য দিয়ে চাষের পরিস্থিতির পরিবর্তন করা হয়েছে। এইসকল পরিবর্তনের ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এই গ্রামের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত এইসকল বিষয় আলোচিত হয়নি। এখন এইসকল পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিম্নলিখিত তথ্যসকল দ্রষ্টব্য (কোমোগুচি 1972, 1974 জন্‌সন্ 1986, ফুজিতা 1988, 1990)।

২২ এই রকম বিভিন্ন জিনিসের দোকানটির পরিধি ১.৫ বর্গমিটার, এটি অকৃষিজনিত কাজের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু গ্রামের উত্তর দিকের অংশকে চিহ্নিত করার পক্ষে সহায়ক নয়। আবার এখানে যে সকল মানুষ আসেন সকলেই উত্তরপাড়ার অন্তর্গত।

২৩ পরিচালনা সংক্রান্ত সমিতির আলোচনার ক্ষেত্রে সাতো অধ্যাপকের লেখার তথ্য অনুসরণ করা হয়েছে।

২৪ এই ধরনের বাজার এবং হাট বাংলাদেশের সর্বত্রই চোখে পরে। এটা এই গ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষত্ব নয়। এই ধরনের বাজারগুলিতে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস সবই পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বাজার সম্পর্কে দ্রষ্টব্য তথ্য এবং পুস্তিকাগুলি হল [কানো 1987 ইসিহারা 1987 (বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ১০ দশ নং সংখ্যা)]।

২৫ টীকা ৫৬ দ্রষ্টব্য।

২৬ এই শব্দ, এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ বক্তব্য। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে অন্য শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (Wood 1978, Jansen 1987 প্রবন্ধ সকল)। এই শব্দের দুটি পৃথক ব্যবহার রয়েছে (হারা 1969c)। কিন্তু এখানে পরিবারের সদস্যসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিভাজনকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়নি। আবার এই শব্দটি ইংরেজীব 'household' অথবা 'family' জাপানি ভাষার 'সংসার' এবং 'পরিবার' শব্দ দুটির সমার্থক। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (হারা 1978b)।

সাধারণত পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবার প্রধাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে সদস্যসংখ্যা গোনা হয় বিবাহিত কন্যাকে বাদ দিয়ে। পুত্রদের ক্ষেত্রে বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে পার্থক্য না করে কীভাবে সংসারের ভাগ

হয়েছে সেই ভিত্তিতে গণনা হয়ে থাকে। পরিবার এক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোভিত্তিক সংস্থা হিসাবে যেমন পরিগণিত হয় তেমনি আবার একই উনান (চুলা) ব্যবহারকারী (অর্থাৎ একান্নবর্তী) সদস্যসকল এক পরিবারভুক্ত বলে ধরা হয়ে থাকে। এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের লোক থাকলেও তারাও একই পরিবারভুক্ত ধরে নেওয়া হয়।

২৭ Bertocci 1972.

২৮ আনদো কাওয়াই 1989।

২৯ মসজিদে সাধারণ লেখাপড়া অথবা মাদ্রাসাতে যে ধরনের লেখাপড়া হয় তা ব্যতিরেকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়। সেখানে 'মোকতাব' নামক প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মসজিদগুলিতে 'ফজুল' (অথবা ইমাম) থাকেন। তিনি খুব ভোরে সকলকে কোরাণ পাঠের মাধ্যমে কোরাণের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে শিক্ষাদান করেন। আবার বিচারের সময়ে অথবা অন্যান্য সামাজিক সমাবেশের সময়ে মসজিদের অভ্যন্তরে 'ইরগাৎ' নামক বড় মাঠকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মসজিদ প্রাঙ্গনে দিবানিদ্রা দেওয়া অথবা আড্ডা মারাও খুবই সাধারণ ঘটনা। এরশাদের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান 'মসজিদ-কেন্দ্রিক সমাজ' এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছেন তা এই ধারণাকে সমর্থন করে থাকে (সাতো 1990b দ্রষ্টব্য)।

৩০ হারা 1969c, কোনিশি 1986।

৩১ উদাহরণস্বরূপ, পিতাপুত্র একই জমিতে চাষ করে (ধান কেটে, বন্ধকি ভিত্তিতে) আয় করে অথবা দুইভাই একই রিক্সা পালা করে চালায় এইরকম দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয়।

৩২ এধরনের বিভাজনের সম্বন্ধে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তার জন্য পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (van Schendel 1981)।

৩৩ পর্দার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য Schendel 1981। ILO-র বক্তব্য অনুযায়ী ২০০০ সাল পর্যন্ত মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের পরিমাণ ছিল পুরুষের তুলনায় ১/১০ ভাগেরও কম (ILO 1986, p 9)। এটা সমগ্র দেশের সম্পর্কে বিবরণ। কিন্তু শহরের সম্পর্কে চিন্তা করলে এই ভাগ অনেক কম হতে পারে।

৩৪ অন্য অর্থে বলতে বা কার্যকরী জমির মালিকানার সমস্যাকে ধরা হয়ে থাকে। ভাগচাষের জমি (ধারদেওয়া -১/২, ধার নেওয়া +১/২) ভাড়া নেওয়া জমি (ধারদেওয়া -১, ধার নেওয়া +১) বন্দকি জমি (অনির্ধারিত -১, নির্ধারিত +১) ইত্যাদি বিভাগে আলোচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ভাগচাষের পরিমাণকে নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে সরলীকরণ করা হয়েছে। এই বক্তব্যকে আরও পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রবন্ধ সকল দ্রষ্টব্য (Wood 1978, van Schendel 1981, ibid. p. 22 (note 31) 1981, Jansen 1987), এই ধরনের সমস্যার প্রধান কারণ হল জমির মালিকানা এবং জমি-চাষে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীদের জটিল সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কজনিত বিভিন্ন সমস্যা। আরও সুস্পষ্ট আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Takada 1990)।

৩৫ এই অঞ্চলে ১ কানি = ০.৩ একর = ০.১২ হা বলে ধরা হয়। কিন্তু এই কুমিল্লাতেই শহর-সন্নিকটের জমির ক্ষেত্রে ১ কানি = ১.২ একর বলে ধরা হয়। সুতরাং বাংলাদেশেই বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিমাপকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এখন অর্থাৎ সাম্প্রতিক সময়ে এক শতক (অথবা শতাংশ অথবা ডেসিমেল) = ১/১০০ একর টো সাধারণভাবে ধরা হয়ে থাকে।

৩৬ প্রতিটি পরিবারে যে আয় করে, বিশেষত কৃষি-উৎপাদন থেকে, সেই আয় এবং পরিবারপিছু সদস্যসংখ্যার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এইরকম ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে জমির মালিক যে সমস্ত পরিবার তাদের বিভাজন করা হয়েছে। আবার ভূমিহীন (আইনত ভূমিহীন) পরিবারগুলির ক্ষেত্রে সেই সকল পরিবারের সদস্যসংখ্যা এবং সেই সকল সদস্য যে ধরনের জীবিকাতে অংশগ্রহণ করে থাকেন সেই জীবিকাভিত্তিক বিভাজন করা হয়েছে। আবার ১ থেকে ৫ — এই পাঁচটি শ্রেণীর বিভাজনের সময়ে গ্রামবাসীদের মতামতকেও প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। আদমশুমারজনিত ফলাফল সঠিকভাবে কাজে না লাগায় উল্লিখিত বিভাজনের উপায়কে কেন্দ্র করে স্বনিযুক্ত বা একই ভাবে অকৃষিজনিত কাজে নিযুক্ত শ্রেণীকে 'উদ্বৃত্ত', যাঁরা কেবল স্বনিয়োজিত

শ্রেণীভুক্ত তাঁদের 'স্বনিযুক্ত', যারা স্বনিয়োজিত শ্রেণীর অন্তর্গত নয় এমন 'ঘাটতি', আইনত জমির মালিকানা যাদের নেই তাঁদের 'ভূমিহীন' — এইরকম ভাবে বিভাজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'ভূমিহীন' বললেও কিছু পরিমাণ উৎপাদনশীল জমির (আয়যোগ্য জমি) মালিকানা থাকে।

৩৭ এই গ্রামের উদাহরণ বাংলাদেশ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যাপার নয় (হারা ১৯৯০) অবশ্যই এই গ্রামটিতে (বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী) পরিবার পিছু গড়পড়তা জমির পরিমাপ হল ২.১০ কানি = ০. ৬২ একর। এই পরিমাপটি এই গ্রাম যে ইউনিয়নের অন্তর্গত সেই ইউনিয়নে সমগ্র জমির পরিমাপের অর্থাৎ ০.৫৭ একর (BBS ১৯৮৫ থেকে হিসাব করা), সঙ্গে একই পরিমাপের। তবুও এই পরিমাপটি মুরাদনগরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় এবং কুমিল্লা জেলার গড়পড়তা মূল্যের অনুপাতে বিশেষভাবেই নিম্নমুখী। কিছু বাংলাদেশে বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য এর পরবর্তী পর্যায়ে এই রকম গ্রামকে বেছে নেওয়াটা কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না বলেই মনে হয়।

৩৮ 'নির্ভরশীল' শ্রেণীর তিনটি পরিবার ব্যতিরেকে আলোচনা করা হয়েছে। আবার জনসংখ্যার মধ্যে ইমাম, হস্টেলে থাকা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী (গৃহশিক্ষকের কাজের পরিবর্তে খেতে থাকতে পারে এমন মানুষ, 1989 সালের শেষের দিকের গনণা অনুযায়ী দুইজন) এবং অন্য জায়গা থেকে এসে বসবাসকারী ব্যক্তিগণ সংযুক্ত নন।

৩৯ সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা গর্ভনিরোধক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে চায়।

৪০ আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণের (বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেচের জলকে প্রকৃত উপায়ে ব্যবহার এবং বিশেষ ফলনশীল ধানের উৎপাদন) ফলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গড়পড়তা হিসাবে দেখলে পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদন হচ্ছে। ফল আগের তুলনায় কম জমিতে ফসল উৎপাদন করলেও ভালই হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, Bertocci 1960 সালে কুমিল্লার সন্নিকটে দুই একর (ঐ অঞ্চলের পরিমাপ অনুযায়ী ৬.৬৬ কানি) জমির উৎপাদনকে ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন (Bertocci, 1972)। কিন্তু এই তার অর্ধেক পরিমাপের জমিতেও সেই একই ফল পাওয়া গিয়েছে।

৪১ Westergaard 1980, pp 8, 49 দেখুন।

৪২ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে জীবিকা পরিবর্তনের আকস্মিকতা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে (হারা, 1967, 1969a ,1969b)। এখানে সেই প্রবন্ধভিত্তিক আলোচনা বিশেষ হয়নি কিন্তু এই জীবিকা পরিবর্তনের প্রবণতার দিকটি আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে আলোচ্য প্রবণতা (যে কোনো দিক থেকেই হোক তা অতি সাধারণ ব্যাপার) হিন্দুদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় (Takada 1990)।

৪৩ একই সময়ে ছোটো ছোটো খামারে নিজের হাতে অর্থাৎ স্বহস্তে উৎপাদনকে ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশেও সংঘটিত হয়েছে (ফুকুনাগ 1989)।

৪৪ বাংলাতে ভদ্রলোক, বড়লোক, সাহেব ইত্যাদি শব্দ আছে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলি প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত।

৪৫ জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সাতোর লিখিত প্রবন্ধকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি এই মতের সমর্থক বলেই মনে হয় (সাতো 1990a)।

৪৬ বাস্তবে, বেশীরভাগ পরিবারের সদস্যরা কৃষি শ্রমিকের কাজে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তবুও সেই সময়কে সংক্ষেপ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটকে বুঝতে পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Jansen 1987, ৪র্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ)।

৪৭ কৃষিতে দিন-মজুররা ও কৃষকদের একাংশ এই অভিমত পোষণ করেন এমন গবেষকের সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু অনেক গবেষকই কৃষিভিত্তিক জীবিকাকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন : (১) দিনমজুর (কৃষক দিন-মজুর), (২) নিজের জমি নিজে চাষ করার ব্যাপারে একদমই আগ্রহী নয় এমন মানুষ, (৩) সবসময়ে বা একাদিক্রমে একই জমি চাষ করে না এমন মানুষ (এরা পুরোপুরিভাবে দিন-আনে দিন খায় গোষ্ঠীভুক্ত) সকলেই অকৃষিজনিত শ্রমে লিপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য (উদাহরণস্বরূপ, van Schendel, 1981)।

৪৮ এর যুক্তি হিসাবে কেবল পরিমাণই নয়, বিশেষত বাড়ির বিশালত্ব অর্থাৎ পরিবারের বিশালত্ব, বাড়ির স্থাপত্যকার্য, মাল-মশলা, বস্ত্র-পরিধেও, খাদ্যসামগ্রী, অবসর সময়ে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি সব কিছুতেই একত্র করেছে। অবশ্যই গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী এটাই যুক্তিগ্রাহ্য। কখনো কখনো এই সকল ব্যক্তিদের গ্রামবাসীরা ছোটলোক (সোজাসুজি অনুবাদে মানে দাঁড়ায় 'ছোটমাপের মানুষ', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 'বঞ্চিত মানুষ') বলে অভিহিত করে। আবার এরা নিজেরাও কখনো কখনো নিজেদের একই আখ্যায় অভিহিত করে থাকে।

৪৯ এদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে প্রতিটি অঞ্চলেই বিভিন্ন নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা চলছে (Rahman and Islam 1987, Jansen 1987, van Schendel 1981 এবং অন্যান্য)। Jansen-এর বক্তব্য অনুযায়ী শুখা মরসুমে (নিজেকে ধরে) প্রাপ্তবয়স্ক দেড়জনের প্রয়োজনমত চাল (তিন থেকে চার কেজি মত) ছাড়া অন্য কিছু উপার্জন করা যায় না বলে বলেছেন (Jansen 1987, p. 206)। একটা খারাপ না হলেও এই 'k' গ্রামের অকৃষিজনিত শ্রমিকদের নিত্য জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। খাদ্যসামগ্রী চাষের মরসুমে নিজের জন্য ৩৫-৪০ টাকা-র কম-বেশি এবং শুখা মরসুমে ২০ টাকা মত থাকে (1989-এর শেষে)। চালের দামের তারতম্যের দিকে না দিয়ে সহজভাবে প্রায় ১২টাকা কেজি প্রতি অথবা দৈনিক হিসাবে ৩০টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে। এইভাবে ধরলে দিনে ২.৫ কেজির বেশি চাল কিনতে পারা যাবে না এই অবস্থায় গ্রামবাসীরা রয়েছেন। এই পরিসংখ্যান হয়েছে কর্মবিহীন দিন এবং সঠিক কাজ না থাকার দিনগুলিকে যুক্ত না করে (এটাই তুলনায় বেশি)। কিন্তু কেবলমাত্র চাল দিয়েই জীবনধারণ হয় না এটা ভাবলে এখানে নির্দেশিত পরিমাণ বিশাল সংখ্যায় নিম্নগামী বা নিম্নমুখীও বলা যেতে পারে।

৫০ বাংলাদেশে অন্য লোকের সাফল্য দেখলে সাধারণত আল্লার দয়ার কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু আবার একই সঙ্গে এও বলা হয় যে লোকটি চালাকির (চালাক থেকে উদ্ভূত) স্বভাব আছে। এই শব্দ ব্যবহার থেকে মনে হতে পারে যে তারা অকৃষিজনিত শ্রমিকদের সঙ্গে চালাকি করেছে।

৫১ বাংলাদেশে দোকান মালিক এবং হকারদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সামাজিক স্তরভেদের পার্থক্য।

৫২ পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে (অবশ্যই শারীরিক শক্তির প্রয়োজন আছে) কিছুটা অফিস বা দপ্তর সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকতে হয় বলে একটা পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া শেখা বিশেষ প্রয়োজন। আবার মধ্যপ্রাচ্যে চলে গিয়ে দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করলেও অন্য দেশে যাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সেইজন্য সাধারণত ক্লাস এইট বা অষ্টমশ্রেণী থেকে ক্লাস টেন্ বা দশমশ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা ব্যক্তিরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৫৩ এটা স্কুলের শিক্ষার দ্বারা হয় না।

৫৪ দর্জি, রিক্সা-মেকানিক (যারা রিক্সা সারানোর ব্যাপারে দক্ষ), টেম্পো অর্থাৎ তিনচাকার (এক বিশেষ ধরনের) চালক, বাস চালক ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রয়োজন হয় না কিন্তু হাতেকলমে কাজ শেখাটা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৫৫ নিত্য যাতায়াতকারী বা নিত্যযাত্রীদের সম্পর্কে Chapman-এর লিখিত প্রবন্ধ উল্লেখ্য (Chapman and Prothero 1985)। বড় শহরের উদাহরণ হিসাবে চট্টগ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকা, মাঝারি শহরের উদাহরণ হিসাবে কুমিল্লা এবং তার সংলগ্ন এলাকার (হারা 1967, তথ্য 1969a, Qadir 1960) উদাহরণ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের ব্যাপারে Mahbub-এর লেখা দ্রষ্টব্য (Mahbub, 1985-6)।

৫৬ সময়সাপেক্ষ কিন্তু সস্তা লোকাল বাস বা সাধারণ বাসে নিকটবর্তী কুমিল্লা পর্যন্ত যাতায়াতে 14 (টাকা) লাগে (1989 এর শেষভাগে)। পূর্বে আলোচনা অনুযায়ী এটি অকৃষিজনিত শ্রমিকদের দিনমজুরির অর্ধেক।

৫৭ টীকা ১৭ দ্রষ্টব্য।

৫৮ উদাহরণস্বরূপ 'অধগতির নাটক'-এ বাংলাদেশে সংঘটিত দিনমজুরি অথবা অন্য কোনো সীমাবদ্ধতা থেকে নতুন কৌশলের অগ্রগতি কষ্টকর। আবার যেটুকু হয়েছে সেটাও উন্নত কৃষকদেরই কাজে

লেগেছে। এই বিভাজনটা বিভিন্ন পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করেছে। আবার গ্রামের জনসংখ্যার এক বিশাল পরিমাণ ভূমিহীন বলে কাজের প্রয়োজনে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে (ওয়াতানাবে (?), প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় প্যারা)। কিন্তু মহারাজন এ ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা অনুযায়ী ও কৃষি-ভিত্তিক গ্রামেও অকৃষিজনিত শ্রমিক বহু সংখ্যক দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয় যে, দরিদ্রসীমার উদ্বৃত্ত শ্রমের এক বিশাল অংশকে ধরে রাখা হচ্ছে (মহারাজন ১৯৮৮)।

৫৯ ILO-র তথ্য এবং কাজ অনুযায়ী পরবর্তী দশ বছরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারী জনসংখ্যা বছরে তিন শতাংশ (2.98 %) বৃদ্ধি পাবে (ILO 1986)।

৬০ এটা সামগ্রিকভাবে 'কৃষি থেকে অকৃষিতে' — পরিবর্তনের কথা বলে (Mahbub 1985-6, Bhuiyan, 1989)।

৬১ এই ধরনের পরিবর্তন ছিল এবং আছে। এই ধারণা বহন করে এমন প্রবন্ধও প্রচুর রয়েছে (Wood, 1978, van Schendel 1981, সুদা 1989 a b ইত্যাদি)।

৬২ অবশ্যই মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলি (ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) এক বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান যেখানে গ্রামের প্রায় সমস্ত বালক অংশগ্রহণ করে থাকে। এটি মাদ্রাসার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখানে কোরানকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

৬৩ Wood 1978, van Schendel 1981।

৬৪ এই পাঁচটি উদাহরণ দেখলে অকৃষিজনিত শ্রমে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হয়।

৬৫ 'পারিবারিক পরিকৌশল' (Family Strategy) বলতে বোঝায় জীবনধারণের জন্য যে সকল পরিকল্পনা হয় তার বিবরণ। এর জন্য বিশেষ চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয়।

৬৬ ৬০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৭ প্রতিটি উদাহরণ দেবার প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নিজের রিক্সাগাড়ী আছে এমন রিক্সাওয়ালা, নিজের টেম্পো আছে এমন ড্রাইভার বা চালক, নিজেদের জমিতে নিজেরা ফসল ফলায় এমন ব্যক্তিরা (শিক্ষাজীবী, অন্যান্য) উল্লেখযোগ্য।

৬৮ সাতের 'কৃষি + অকৃষি' শ্রেণীর ক্ষেত্রে টীকা ৬৪ দ্রষ্টব্য।

৬৯ এইরকম মরসুমে বাইরে যায় এমন লোকসংখ্যা কেবল এই গ্রামের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও ক্রমে ক্রমে সংখ্যা কমের দিকে যাচ্ছে (Mahbub, 1985-6)।

৭০ এই মডেলের সঙ্গে সংযুক্ত বললে, বাংলাদেশের প্রবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত সরল মেরুকরণ পদ্ধতির যে যোগসূত্র তাকে নির্দেশ করে। এই সম্পর্কিত বক্তৃতায় 'প্রবাসীদের দুটি বিশেষ প্যাটার্ন বা ধরণ' উল্লেখ্য (Chowdhury, 1978)। বিপরীতে, সম্পূর্ণ পৃথক সমস্যাকেও আলোচনা করা হয়েছে (Takada in PRESS)। প্রবাসীদের সম্পর্কে অন্য মতবাদ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই রূপরেখা উল্লিখিত প্রবন্ধে আলোচিত (Takada, 1990)।

৭১ বাংলাভাষার 'গ্রাম' বলতে জাপানি ভাষার মুরা অর্থাৎ গাঁ বোঝালেও 'পল্লীগ্রাম' (জাপানি ভাষার ইনাকা) শব্দটিকেই নির্দেশ করে থাকে।

৭২ সাহায্য এবং উন্নতি স্বল্প সময়ের জন্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হওয়া গবেষণাগুলি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। সাতোর লেখা "বিশেষ উৎসাহে বা স্বার্থে সাহায্য" - এই প্রবন্ধকে উল্লেখ করলে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব (সাতো 1990a)।

৭৩ গ্রাম সম্পর্কিত গবেষণায় রত সংস্থা এমনকি গবেষকরা বেশিরভাগই শহর-কেন্দ্রিক। অল্প কিছু গ্রামের ছেলে গবেষণায় রত থাকলেও তারা তাদের যুবাবস্থায় অর্থাৎ জীবনের প্রথম দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে গিয়ে বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়। ফলে গবেষকদের অধিকাংশই গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। আবার (উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকেই অফিসে কাজ করেন) বিশেষ কাজে নিযুক্ত বা পেশাভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্যের তথ্যনির্ভর। এছাড়া বাস্তব সমস্যা আরও বহু পরিলক্ষিত হয়।

৭৪ উপরের বহুবার আলোচিত তথ্য অনুযায়ী প্রথাগতভাবে নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে এমন

গ্রামবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট। এরা সকলেই চাষী। আবার কৃষি-শ্রমে লিপ্ত হতে চায় না এমন গ্রামবাসীও প্রচুর রয়েছেন।

৭৫ এই প্রবন্ধে 'গ্রাম' ও 'গ্রামবাসী' এই দুটি শব্দই বহুল ব্যবহৃত।

৭৬ উদাহরণস্বরূপ রিক্সা ইত্যাদির কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে দেশেই তৈরি হয় একথা বললেও তৈরির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চীন অথবা ভারত থেকে আমদানি করা হয়। বেশিরভাগ রিক্সাওয়ালাই সে কথা জানে এবং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী 'হ্যান্ডেলটা চীনে তৈরি জিনিস হলে ভাল। টায়ারও চীনে জিনিসই ভাল । ভারতে তৈরি জিনিসের তুলনায় ভাল। বাংলাদেশের তৈরি? জঘন্য জঘন্য।'

৭৭ উদাহরণস্বরূপে যে সকল গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়নি, সেখানেও 'রেন্টাল ভিডিও'-র দোকান থেকে ব্যাটারি সমেত সফট ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এইরকম ব্যবস্থা সাম্প্রতিক সময়ে চালু হয়েছে। পুনরায় সেখানে যে সকল সফট পাওয়া যাচ্ছে সেই দেশজ জিনিস ব্যতীত Rambo বলে পরিগণিত হয়। আবার আঞ্চলিক বাজার সমূহে ফটোগ্রাফি অর্থাৎ ছবি তোলার দোকানের সামনের বোর্ডে FUJI-র লোগো অর্থাৎ চিহ্ন দেখা যায়। এবং দোকানের অভ্যন্তরে গেলেও জাপান বা আমেরিকার পরিবেষ এবং পোস্টার চোখে পড়ে। সেগুলি পাশদিয়ে হেঁটে চলে যাওয়া ব্যক্তিদেরও দৃষ্টিগোচর হয়।

৭৮ এই বক্তব্য খুব ভালোভাবে বুঝতে পারার জন্য van Schendel, কৃষি নামক জীবিকা, যেটাকে অধ্যাপক WOLF বলেছেন 'কৃষক' তাকে সমালোচনা করেছেন (van Schendel, 1976)। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে 'কৃষক' এই আখ্যাকে ব্যক্ত করার জন্য তিনি 'কৃষক সমাজ' এবং সেই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের 'কৃষক' আখ্যা দিয়েছেন (van Schendel 1981, p 22)। কিন্তু এইপ্রকার কাজের ক্ষেত্রে গ্রাম্য কৃষি শ্রমিকরা, কৃষক এবং অন্যান্য যারা প্রবাসী তারা অন্য কাজে যুক্ত হিসাবে পরিগণিত হয়।

এইরকম অবস্থা ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে বহু প্রাচীন প্রথা বলে মনে হয় না। কিন্তু শহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে এই ধরনের প্রথা বহুদিন ধরেই প্রচলিত বলে মনে হয়। এই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যও পাওয়া যায় (Qadir 1960, হারা 1967, van Schendel 1981)।

৭৯ Wolf 1973 (1969), p X-IV.

৮০ Shanin 1987, p. 4.

৮১ এই রকম ক্ষেত্রে পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে 'কৃষক' অথবা 'কৃষক সমাজ' সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা

৮২ উদাহরণস্বরূপ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রামের দিকে রাজনীতি নজরে পড়ে এবং গ্রামের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্যও নির্ধারিত হয় (সাতো 1990a)।

৮৩ অর্থাৎ বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য রয়েছে।

এই গবেষণা Japan Overseas Corporation Volunteers বা JOCV এবং Bangladesh Academy of Rural Development বা BARD-এর সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে হয়েছে। গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে উপকৃত করেছেন অধ্যাপক ইশিই এবং অধ্যাপক উসুদা। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। (This Paper first appeared in Japanese in 1990)।

গ্রন্থ-তালিকা

ADNAN, Swapan, 1990, *Annotation of village studies in Bangladesh and West Bangal : A Review of Socio-economic Trends over 1942-88*, BARD, Comilla.

আনদো কাজু ও কাওয়াই আকিনোব," বাংলার ব-দ্বীপ নিকটস্থ গ্রামগুলির গঠন প্রথা", *কৃষি ইতিহাস বার্ষিকী*, ৩-৩৯-৫৬।

BBS, 1985, *Bangladesh Population Census 1981· Community tables of all Thanas of Comilla district*, Part II, BBS, Dhaka.

— 1986, *Bangladesh Agricultural Census 1983-84*, BBS, Dhaka

BERTOCCI, Peter, 1972, "Community Structure and Social Rank in Two Villages in Bangladesh", *Contributions to Indian Sociology* (N.S.), 4.28-52.

BHADURI, Amit; Husain Zillur Rahman and Ann-Lisbet ARN, 1986, "Persistence and Polarisation · A Study in the Dynamics of Agrarian Contradictions", *Journal of Peasant Studies* 13-3 : 82-89

— 1988, "Persistence and Polarisation in Rural Bangladesh · Response to a Debate", *Journal of Peasant Studies* 16-1 : 121-23.

BHADURI, Md. Ashlam, 1989, "Inter Generational Occupation Mobility in a Village in Bangladesh, *Bangladesh Sociological Review* 3-1· 79-95.

CAIN, Mead, 1985, "On the Relationship between Land holding and Fertility", *Population Studies* 39-1 : 5-15.

— 1986, "Land-holding and Fertility : A Rejoinder", *Populaltion Studies* 40-3 . 313-317

CHAPMAN, Murray and Mansell PROTHERO, 1985, "Themes on Circulation in the Third World", *Circulation in Third World Countries*, CHAPMAN and PROTHERO (eds.), pp. 1-26, Routledge and Kegan Paul

CHOWDHURY, R.H., 1978, "Determinants and Consequences of Rural Out-migration Evidence from some Villages in Bangladesh", *Oriental Geographer* 22-1.2:1-20.

FELDMAN, Shelley and Florence E McCERTHY, 1987, "Persistence of Smallholder, Withering away of the Small farmer Comments on Bhaduri, Rahman and Arn", *Journal of Peasant Studies* 14-4· 543-548

ফুজিতা, কোইচি, 1988, "বাংলাদেশের গ্রামের চাকরি সংক্রান্ত সমস্যা — কৃষি শিল্পের বিভিন্ন চাকরির ভিত্তিতে", *কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা* 42-1 103।

1990, "সেচের উন্নতি এবং তার পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা", *বাংলাদেশ ঃ উন্নতির রাজনৈতিক কাঠামো*, সাতো সম্পাদিত, pp 209-257, এশিয়া অর্থনৈতিক গবেষণাপত্র।

ফুকুনাগা, মাসাআকি, 1989, "উত্তরভারতের গ্রামে সংগঠিত মধ্যবর্তী জাতি সমূহের কার্যকলাপ — দুটি বিশেষ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে", *এশিয়া অর্থনীতি* 30-3 . 87-100।

হারা, তাদাহিকো, 1967, "Paribar and Kinship in a Moslem Village in East Pakistan", Unpublished Ph D dissertation, Australian National University, Canberra.

— 969a, "পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান গ্রামগুলির জীবিকা এবং তার মূল্যমান", *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গবেষণা* 7-1 58-75

-- 1969b, "শিল্প জনিত সাহায্যের সমস্যা (কৃষি উন্নতির এক দিক)", *এশিয়া আফ্রিকা ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা কেন্দ্র* 7·9-13।

— 1969c, "পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান গ্রামগুলিতে পরিবারের কথা", *লোক সংস্কৃতির গবেষণা* 34-3 252-273।

— 1978a, "দক্ষিণ এশিয়া গ্রামসংক্রান্ত গবেষণা - ১", "দক্ষিণ এশিয়া গ্রাম্যসমাজ সংক্রান্ত গবেষণা-২", pp. 37-48, টোকিও বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়, *এশিয়া আফ্রিকা ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা*।

— 1978b, "দুটি কৃষক পরিবার এবং সংসার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন কথা", *এশিয়া আফ্রিকা ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা* 15· 1-14।

— 1981, "বাংলাদেশের মহিলা এবং পুরুষ", *পৃথিবী এবং জনসংখ্যা* 91· 30-37, 92. 28-34, 93·68-75।

— 1990, "পূর্ব বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল - অনিশ্চিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সমাজ", *লোকসংস্কৃতি এবং পৃথিবী*, pp.93-118।

ILO (আই. ল.ও.) 1986, *Economically Active Population 1950-2025*, Vol 1 (Asia) 3rd ed , ILO, Geneva

ইশিহারা, জুন, 1987, "স্বল্পকালীন বাজার সংক্রান্ত গবেষণা কার্যকলাপ এবং কাঠামো", নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

ইতো, সানা 1990, *The Female Heads of Household in Rural Bangladesh*, BARD and JOCV

JANSEN, Erik G 1987, *Rural Bangladesh Competition for Scarce Resources*, University Press, Dhaka.

বি, এল, সি জনসন 1986, *দক্ষিণ এশিয়ার জমি, সীমানা ও অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বাংলাদেশ*, Heineman, Educational Books, London, 1982।

কানো, কাৎসুহিকো 1987, "বাংলাদেশের কৃষক-সমাজের স্বল্পকালীন বাজার", *বর্তমান / সাম্প্রতিক সমাজ-নৃতত্ত্ববিদ্যা Ritual and Exchange*, ইতো আবিতো, সেকিমোতো তেরুও, ফুনাবিকি, তাকেও, pp 137-165, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

KHAN, M. Mahumad 1987, "A Note on Persistence and Polarisation", *Journal of Peasant Studies* 14-4; 538-542.

কোমোগুচি, য়োশিমি 1972, "পূর্ব বাংলার জমির ব্যবহার এবং উন্নতি — কুমিল্লা জেলার, দক্ষিণ রংপুর-এর গ্রামের উদাহরণে আলোচনা", *এশিয়া অর্থনীতি* 13-3: 28-45।

— 1974, "বাংলাদেশে কৃষির উন্নতি", *এশিয়া অর্থনীতি* 20-4 : 56-79, 21-1: 68-87।

কোনিশি, মাসাতোশি 1986, "বাড়ি এবং পরিবার", *বাংলার ইতিহাস চর্চা*, pp. 74-88, হোসেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

মহারা জন, কেশবলাল 1988, "বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামের কার্য (নিয়মিত কার্য) পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যালোচনা", *কৃষি-ভিত্তিক গ্রামের সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা* 92: 28-35।

MAHBUB, A.Q.M. 1985-86, "Mobility Pattern of Working People from Rural Areas in Bangladesh", *Oriental Geographer* 29-30: 73-91.

PANDIAN, M S S 1987, "On the So-called Stability of Small Land Owners in Bangladesh", *Journal of Peasant Studies* 14-4: 534-537.

QADIR, S.A 1960, *Village Dhanishwar: Three Generations of Man-land Adjustment in an East Pakistan Village* (Technical Publication No. 5), Pakistan Academy for Rural Development, Comilla.

RAHMAN, Atiq and Rizvaul ISLAM 1987, "An Empirical Account of Hired Labour Market in Rural Bangladesh", *Bangladesh Development Studies* 15-1:129-142

RAHMAN, Atiur 1988, "Persistence and Polarisation in Rural Bangladesh : Small Farmers are being Proletarianised – A Note on Persistence and Polarisation" by Bhaduri et al., *Journal of Peasant Studies* 15-2 . 283-287.

সাতো, হিরোসি 1990a, "বাংলাদেশের ক্ষমতা-কাঠামো-আমলাতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতা কাঠামো", "বাংলাদেশ ঃ স্বল্প উন্নত রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কাঠামো-৪", সাতো, হিরোসি, pp. 3-39, *এশিয়া অর্থনৈতিক গবেষণা*।

— 1990b, "বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ইসলাম", সাতে হিরোসি উল্লিখিত প্রবন্ধ, pp. 87-138।

SHANIN, Teodor, 1987, "Introduction : Peasantry as a Concept", *Peasants and Peasant Societies*, 2nd ed., Shanin (ed), pp. 1-11, Basil Blackwell.

STOKES, C., Shonon, WAYNE, A SCHTJER and Rodolpo A. BULATAO 1986, "Is the Relationship between Landholding and Fertility Spurious? A Response to Cain", *Population Studies* 40-3: 305-311.

সুদা, তোসিহিকো 1989a, "The Change of Labour Form in a Comilla Suburban Village Transition from Non-wage Cooperative Labour to Migrant Labour" (mimeo), BARD and JOCV.

— 1989b, "Land Structure and Social Mobility : A Case study of a Comilla Suburban Village about the Relation between Traditional Land Structure and Social Mobility at the Stage of Diversification of Occupations" (mimeo), BARD and JOCV.

তাকাদা, মিনেও 1990, "Research Report on Migrants and Villages: On the Labour Migration and its Social Background", BARD and JOCV.

— (In Press), "Dualistic Pattern of Migration", Reconsidered. A Paper Prepared for a Volume of Collected Papers (Title undecided).

TILLY, Louise A., 1979, "Individual Lives and Family Strategies in the French Proletariat", *Journal of Family History*, 4-2: 137-152

van SCHENDEL, Willem 1976, "Peasants as Cultivators? Problems of Definition", *Peasant Studies* 5-2: 16-17

— 1981, *Peasant Mobility. The Odds of Life in Rural Bangladesh*, Van Gorcum, Assen.

ওয়াতানাবে, তোশিও 1985, "উন্নয়নশীল এশিয়া এবং স্থবির এশিয়া-৪", *প্রাচ্য অর্থনীতি গবেষণা সংস্থা* (তোইয়োকেইজাইসিন্‌পোসা)।
WESTERGAARD, Kirsten 1980, *Boringram: An Economic and Social Analysis of a Village in Bangladesh*, Rural Development Authority Academy, Bogra
WOOD, G D. 1978, "Class Differentiation and Power in Bandokgram The Minifundist Case", *Exploitation and the Rural Poor*, M Ameerul Haq (ed), pp. 59-158, BARD, Comilla.
WOLF, Eric R. 1996, *Peasants*, Prentice-Hall, Londan
— 1973 [1969], *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Harper Torch books, (Originally published by Harper and Row) London.

[প্রবন্ধটি জাপানি ভাষা থেকে অনুদিত]
অনুবাদ ঃ ড.পূরবী গঙ্গোপাধ্যায়
অনুবাদ সম্পাদনা ঃ ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বকসি

৫

একটি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পটভূমিকা পশ্চিমবাংলা ১৯৯৩

মাসাহিকো তোগাওয়া

ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার প্রারম্ভে অস্পৃশ্যতা ছিল জাতিবর্ণ-কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায়। হিন্দু সমাজের জাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় বর্ণব্যবস্থার বিশ্লেষণে অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ[১] দ্বিমেরু বিভাজনে চিহ্নিত। যাই হোক, ভারতীয় সংবিধান সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতার পরে ভারতের অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির কথা দাবি করে এবং তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের[২] জন্য ইতিবাচক পক্ষপাত প্রদানের নির্দেশ দেয়। এই প্রসঙ্গে হ্যারল্ড আইজাকস্ (১৯৬৫) একদা এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি 'প্রাক্তন অস্পৃশ্য' শব্দটি ব্যবহার করেন কারণ নতুন সংবিধান অনুযায়ী অস্পৃশ্যতার কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা অবশ্যই বৈষম্যের অনুঘটক-গুলির বিলুপ্তিকে কোনোভাবেই নির্দেশ করে না যা-কিনা সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত এবং যা সামাজিক মর্যাদার অগ্রগতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এটা নামমাত্র পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবিধান কর্তৃক নির্দেশিত কোটা ব্যবস্থা, সরকারি চাকুরি, উচ্চশিক্ষা, বিধানসভা এবং রাজ্যসভা পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ উন্নয়ণের জন্য সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচি তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের জন্য রূপায়ন করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ এখনও তফশিলি সম্প্রদায়ের এবং তারা দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির 'অভীষ্ট জনগোষ্ঠী' হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই প্রবন্ধে আমি একটি গ্রামীণ সমাজের তফশিলি সম্প্রদায়ের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছি। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে পদক্ষেপ গ্রহণে যে বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রামের সেই লোকদেরই বিবেচনায় আনা হয়েছে বিশেষত কোটা ব্যবস্থা যাদের শুধু মর্যাদা-কেন্দ্রিক সুফলই নিশ্চিত করেছে তা নয়, তাদের গণযোগাযোগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে এই কোটা ব্যবস্থার ফল আলোচ্য বিষয়। এ-নিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (OBC)[৩] ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিয়ে ১৯৯০ সালে গড়ে ওঠা বিতর্কের পর থেকে। যাই হোক আজ পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক গবেষণাই হয়েছে যা 'অভ্যন্তরস্থ গৃহীত' একটি গ্রামীণ সমাজের বৃহত্তম পরিসরে বিভিন্ন পদক্ষেপের পর্যালোচনা করতে পারে।

ভারতীয় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ধারায় পশ্চিমবাংলার একটি ভিন্নমাত্রিক চরিত্র আছে। এই রাজ্য ১৯৭৭ সাল থেকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই সময়কাল থেকেই পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ উন্নয়নের নীতি, পদক্ষেপের মূল্যায়ন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্জিত সাফল্যের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪]

'অস্পৃশ্যতা' সমস্যার উপর দৃষ্টিপাত করে রস মল্লিক (১৯৯২; ১৯৯৩ ঃ ৮০-৮৪) গ্রামীণ বাংলার বর্ণকেন্দ্রিক সচেতনতার সমকালীন দুর্বলতাকে সমালোচনা করেন এবং যুক্তি দেখান যে, অস্পৃশ্যতা এখনও সমাজমনের উপর বেশ সক্রিয়। বিষয়টির মোকাবিলায় নীতি প্রণয়ণে অস্পষ্টতার কারণে এই সমস্যা। অন্যদিকে জি. কে. লাইটেন (১৯৯২ ঃ ২৩৭-৫০) বীরভূম জেলার একটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সেখানকার তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নের দিক আলোচনা করেন। তিনি এটাকে গ্রামবাসীর 'ক্রান্তিকালীন দুর্বলতা'-র অবস্থা হিসাবে দেখেছেন, যদিও তিনি সামগ্রিক অর্থে গ্রামকেই বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয় সামাজিক প্রক্রিয়ার উপর মনোনিবেশ করছি যা-কিনা তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনৈতিক গতিময়তার প্রতি তাদের সংশ্লিষ্টতা ও মূল্যবোধকে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করবে। এটা আজকের দিনের গ্রামীণ সমাজে তফশিলি সম্প্রদায়কে ঘিরে গড়ে ওঠা সামাজিক সমস্যা এবং পর্বতপ্রমাণ অন্যান্য সমস্যার স্বরূপকেও তুলে ধরবে। এই প্রবন্ধে প্রথমে আমি ১৯৯৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুটি তফশিলিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গঠনপ্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করবো। দ্বিতীয়ত, আমি সামাজিক আইনগত দিক থেকে তাদের অন্তর্বর্তী প্রভেদ, পঞ্চায়েতে ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন যা-কিনা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজকর্মকে ঘিরে গড়ে ওঠা তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় — তা দেখাবো। অতঃপর আমি গ্রামপঞ্চায়েতের কর্মসূচির পর্যালোচনা করবো, বিশেষ করে 'সংযুক্ত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি'(IRDP)-র ঋণ প্রকল্প বিষয়ে। সবশেষে আমি দেখাব তাঁদের সামাজিক জীবনে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ভূমিকা যা-কিনা তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতিকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা দিচ্ছে, যা গ্রামীণ সমাজে প্রশাসন দ্বারা অনুমোদিত। এই নিরীক্ষার অবস্থান সুরুল মৌজায়, যা-কিনা রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় পড়েছে, বোলপুর ব্লক, বীরভূম জেলা। পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিচিত। ওয়েষ্টারগার্ড (১৯৮৬ ঃ ৪৫) একদা এই পঞ্চায়েত অফিস বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে নিম্নবর্ণীয় সদস্যদের নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলেন। চতুর্থ পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যালোচনা পঞ্চায়েত সম্পর্কে তাদের মনোভাব পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করবে।

গ্রামের পরিচিতি

সুরুল মৌজা (জে. এল. নং ১০৮) বোলপুর ব্লকে সুপরিচিত। ১৯৯১ সালের জরিপ অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ৮,১৯০। মৌজার তফসিলি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ২,২১৩ এবং

উপজাতি হল ১,৪৫৮ যা-কিনা ২৭.০% এবং ১৭.৪%। সমষ্টিগত ভাবে ৩,৬৭১ অথবা ৪৪.৪%। পঞ্চায়েত সীমানার লোকসংখ্যা ২৩,৭০০, যার মধ্যে তফসিলি সম্প্রদায় ৫,৪৫৮, ২৩% এবং উপজাতি ৫,০৩৮, ২১.৩%।

গ্রামের আবাসিক এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তিনটি নির্বাচনি আসনে বিভক্ত (১,২,৩) এবং এক-একটি নির্বাচনি আসন ২ জন সদস্যের জন্য বরাদ্দ। এখন গ্রামে পঞ্চায়েতে সর্বমোট আসন সংখ্যা ২৫, এবং এর মধ্যে সুরুল মৌজার জন্য ৮টি আসন এবং মূলকেন্দ্র গ্রামের জন্য ৫টি আসন। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য এবং ঘটনা ১নং এলাকার বাগদি সম্প্রদায় থেকে নেওয়া যাঁরা ঐ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা চারটি আবাসিক এলাকায় (যাকে চলতি বাংলায় পাড়া বলা হয়) বিভক্ত। শ্রেণীকরণের সুবিধার্থে গ্রামের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিক পর্যন্ত আবাসনকে আমি 'এ' পাড়া, 'বি' পাড়া, 'সি' পাড়া, 'ডি' পাড়া বলবো। নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে 'ডি' পাড়া অন্যগুলির থেকে দুরে অবস্থিত । 'এ' পাড়া থেকে বাজারে যাওয়া সহজ অন্যদিকে 'ডি' পাড়ার চারদিকে চাষখেত। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ থেকে তফশিলি সম্প্রদায়, মুসলিম, উপজাতিসহ ৩০টি সম্প্রদায় আছে। নির্বাচনি এলাকায় বেশির ভাগ লোক বাগদি সম্প্রদায়ের এবং সদ্‌গোপ পরিবারের। পশ্চিমবাংলায় তফশিলি সম্প্রদায়ে বাগদিগোষ্ঠী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বর্ধমানকে কেন্দ্র করে আশেপাশে অঞ্চলে তাদের বাস। গ্রামীণ বাংলায় পূর্বে বাগদি সম্প্রদায়কে 'অস্পৃশ্য' বিবেচনা করা হতো (রিজলী, ১৮৯৮)। অন্যদিকে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। ব্রাহ্মণ এবং অন্য বর্ণের লোকেরাও ১নং নির্বাচনি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে আছে। তবে তাঁদের সংখ্যা খুব কম।

সারণি ঃ ১-এ ১৯৯৩ সালে নথিকৃত বিভিন্ন বর্ণের ভোটার তালিকা থেকে প্রাপ্ত-বয়স্কদের অবস্থান দেখানো হয়েছে (১৮ বছর কিংবা তার উপরে)। ছক থেকে জানা যায় যে, বাগদিগোষ্ঠী, তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যা ৪২.২%। অন্যদিকে সদ্‌গোপ বর্ণীয়গোষ্ঠী দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। যদিও এখনো গ্রামে জমিদখল, শিক্ষা এবং চাকুরিতে তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ। বিশেষত এই নির্বাচনি এলাকা গ্রামের আধিপত্যশীল ক্ষমতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে উপস্থাপন করছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই তথ্য উপস্থাপনার উদ্দেশ্য আমাদের গ্রামে আধিপত্যশীল শক্তি এবং কৃষিশ্রমে দরিদ্র বর্গাচাষীদের মধ্যের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্রিয়াশীলতা বোধগম্য করে দেখা কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনেও পড়ে। এই প্রসঙ্গে এই আসনে জনগণের ভোট দেওয়ার প্রবণতা ও অনুসন্ধানও বিবেচ্য।

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন

সংরক্ষিত আসন

১৯৯৩ সালের নতুন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার নিয়মাবলী তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং বিধানসভায় আসন নির্দিষ্ট করে।[৫] জনসংখ্যা অনুযায়ী তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে আসন বরাদ্দ

হয় এবং এই তফশিলি জাতি এবং উপজাতির মহিলাদের জন্য তিন ভাগের একাংশের আসন রয়েছে, যা-কিনা মোট সংরক্ষিত আসনের তিন ভাগের একাংশ। ১৯৯৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি আসনে পাঁচশো জন ভোটার নির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতি দুই আসনে এক হাজার ভোটার ঠিক করা হয়। এইভাবে গ্রামে তফশিলি বর্ণের জন্য দুটি আসন, দুটি সাধারণ আসন, মহিলা সদস্যদের জন্য একটি আসন, উপজাতিগোষ্ঠীর জন্যও আসন নির্দিষ্ট হয়।

সারণি ঃ ১ নির্বাচনি এলাকায় ভোটার সংখ্যার তুলনা

জাতি	উপ-বিভাগ	পরিবার সংখ্যা	পূর্ণবয়স্কের সংখ্যা	মোট	মোট পূর্ণবয়স্কের সংখ্যা
বাগদি	'ডি' পাড়া	৬৯	২৬৪	১৪৭	৫২৬ (৪২.২%)
	'এ' পাড়া	৩৪	১২০	-	—
	'বি' পাড়া	২৬	৮৭	—	—
	'সি' পাড়া	১৮	৫৫	—	—
সদ্গোপ	—	—	—	৭৭	৩২২(২৫.৯%)
ব্রাহ্মণ	কুলীন ব্রাহ্মণ	৩৩	১৩৬	৫১	১৯৩(১৫.৫%)
	নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ	১৩	৩৯	—	---
	অন্যান্য ব্রাহ্মণ	৫	১৮	--	—
অন্যান্য (মধ্যান্তর বর্ণ)		---	৫৩	১৬৬	(১৩.৩%)
অন্যান্য	শুঁড়ি	৬	৩২	১০	৩৮ (৩.১%)
তফশিলি	বাউরি	১	২	--	—
সম্প্রদায়	মেটে	১	২	---	—
	ডোম	১	১	—	—
	মুচি	১	১	—	—
মোট		৩৩৮	১২৪৫ (১০০%)		

সূত্র ঃ বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকা, ১৯৯৩ এবং প্রবন্ধকারের সমীক্ষালবদ্ধ তথ্য।

১৯৮৩-র দ্বিতীয় নির্বাচনে গ্রামে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস (ইন্দিরা) একটি আসন পায়। এরপর সি.পি. আই (মার্কসবাদী), ১৯৮৮ সালের তৃতীয় নির্বাচনে ছয়টি আসনের সবগুলো আসনেই জয়লাভ করে। ১৯৯৩ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নতুন ভাবে পঞ্চায়েতে স্থান পায়। সারণি ঃ ২-এ ব্লক উন্নয়ন অফিসে সংরক্ষিত তথ্য থেকে পাওয়া ১৯৯৩ সালের বিভিন্ন আসনের নির্বাচনের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। এটিতে প্রার্থীর বর্ণ অথবা ধর্ম, রাজনৈতিক সমর্থন এবং তাদের প্রাপ্ত ভোটের তালিকা রয়েছে। আসন ঃ ১-এ, সি. পি. আই. (এম) সমর্থিত ব্রাহ্মণ প্রার্থী চতুর্থবারের মত জয়লাভ করে, একজন সদ্গোপ সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মাত্র ১৯ ভোট পেয়েছেন। তিনি বিগত দুই বছর সি. পি. আই. (এম) দলের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু এবার তিনি প্রার্থী পদ হারান। তাঁর স্থানে, 'ডি' পাড়ায় যুব ক্লাবের নেতা সি. পি. আই. (এম) সমর্থন নিয়ে জয়লাভ করেন। সারণি থেকে জানা যায় সি. পি. আই. (এম) প্রার্থী সাধারণ আসনে বি.জে.পি. প্রার্থী থেকে মাত্র ১০ ভোটে এবং উপজাতীয় আসনে ৩২ ভোটে জয়ী হন। বি.জে. পি.-র এই ধরনের কর্মদক্ষতা এই সময়ে পুরো পশ্চিমবাংলার গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সারণি ঃ ৩-এ গত চার বছরে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক দলের সমর্থন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের অবস্থানের সারাংশ উপস্থাপিত হল।

সারণি ঃ ২ ১৯৯৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল

জাতি/গোষ্ঠী	রাজনৈতিক সমর্থন	ভোট
	আসন ঃ ১ সাধারণ আসন	
১. ব্রাহ্মণ	সি. পি. আই. (মা)	৪২৭
২. ব্রাহ্মণ	বি. জে. পি.	৪১৭
৩. ব্রাহ্মণ	আই. এন. সি.	৬০
৪. সদ্‌গোপ	স্বতন্ত্র	১৯
৫. নাপিত	স্বতন্ত্র	২
৬. কূল	স্বতন্ত্র	২
	তফশিলি জাতির সংরক্ষিত আসন	
১. বাগদি	সি. পি. আই. (এম)	৪৪২
২. বাগদি	বি. জে. পি.	৪১০
৩. শুঁড়ি	আই. এন. সি.	৭০
৪. বাগদি	স্বতন্ত্র	১৭
	আসন ঃ ২ সাধারণ আসন	
১. সদ্‌গোপ	সি. পি. আই. (এম)	৩১০
২. ব্রাহ্মণ	বি. জে. পি.	২৮৯
৩. ময়ূর	আই. এন. সি.	৮৪
৪. ব্রাহ্মণ	স্বতন্ত্র	৩৮
	নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন	
১. বাউরি	সি. পি. আই. (এম)	৩০৫
২. শুঁড়ি	বি. জে. পি.	২৮৬
৩. ডোম	আই. এন. সি.	৯১
৪. সুরা	স্বতন্ত্র	১৯
	আসন ঃ ৩ নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন	
১. মুসলিম	সি. পি. আই. (এম)	৩৯৪
২. সাঁওতাল	বি. জে. পি.	৩১৮
৩. মুসলিম	আই. এন. সি.	১৪৫
৪. ডোম	স্বতন্ত্র	১১০
	উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসন	
১. বাউরি	সি. পি. আই. (এম)	৪১৪
২. মুচি	বি. জে. পি.	৩২০
৩. মুচি	আই. এন. সি.	১২৮
৪. মহল	স্বতন্ত্র	১০২

সারণি ঃ ৩ পশ্চিমবাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন সংখ্যা

বছর	মোট	সি.পি.আই. (এম)	আর.এস.পি.	ফরোয়ার্ড ব্লক	সি.পি.আই.	আই.এন.সি.	বি.জে.পি.	অন্যান্য
১৯৭৮	৪৬৪০১	২৮১০৫	১৬৭৪	১৫৩৯	৮২৫	৪৫৩৬		৯৭২২
		৬০.৬%	৩.৬%	৩.৩%	১.৮%	৯.৮%		২১%
১৯৮৩	৪৫৮৭৫	২৪৪১০	১২৪১	১০৮৪	৭১৬	১৪৭৩৩	৩৪	৩৪৫৭
		৫৩.৪%	২.৭%	২.৪%	১.৬%	৩২.৩%	০.১%	৭.৬%
১৯৮৮	৫২৪৭৩	৩৩৮৩৪	১৫৮১	১৩৯৮	৯০৭	১২২৩৯	৩২	২৪৮২
		৬৪.৫%	৩.০%	২.৭%	১.৭%	২৩.৩%	০.১%	৪.৭%
১৯৯৩	৬০৯৬৫	৩৫৩৪২	১৫২৬	১২৩৮	৭৯৯	১৬২৯২	২৩৬৭	৩৪০১
		৫৮%	২.৫%	২%	১.৩%	২৬.৭%	৩.৯%	৫.৬%

সূত্র ঃ *পঞ্চায়েত রাজ*, বিশেষ নির্বাচন সংখ্যা মে-জুন ১৯৯৩, পঞ্চায়েত বিভাগ, পশ্চিমবাংলা সরকার পৃ. ৪-১৬।

সি. পি. আই. (এম) সমর্থিত ১৯৭৮ সালের প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে প্রথম আসন ব্রাহ্মণ এবং বাগদি বর্ণের দুই জন প্রার্থীর জন্য বরাদ্দ ছিল। সি. পি. আই. (এম) কখনও এই দুটি আসন হারায়নি। এই আসনে প্রার্থী দেওয়ার সময় দলের স্থানীয় শাখা বিভিন্ন বর্ণের ভোটারদের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে। ১৯৯৩ সালে যে ভোটার তালিকা তৈরি করা হয় তাতে দেখা যায় বাগদি হলো ৪২.২%, সদ্‌গোপ ২৫.৯% এবং ব্রাহ্মণ ১৫.৫% যা-কিনা ৩ ঃ ২ ঃ ১ (সারণি ঃ ১-এ উল্লেখিত)। যদিও বাগদি-গোত্রের লোক বেশি কিন্তু তারা অর্ধেকের চেয়ে বেশি হবে না। দ্বিতীয়স্তরে আছে সদ্‌গোপ যাদের পরিচয় কৃষক পরিবার থেকে জমির মালিক পর্যন্ত এবং ভাড়াটে কৃষক (দিনমজুর) কিংবা কৃষি শ্রমিকও আছে। এদের মধ্যে 'ভদ্রলোক' বলতে উচ্চ এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত কৃষককে বোঝায়। গ্রামীণ কৃষি কাঠামোতে নিম্নস্তরের ভাড়াটে কৃষক এবং শ্রমিকদের 'ছোটলোক' বলা হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি এই দুই গ্রুপের মত নয়। বিশেষত ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'কুলীন প্রথা' (উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ) এবং নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

গত তিন বছর থেকে ১৯৯৩ সালের নির্বাচন অবধি একটি নতুন পার্থক্য দেখা গিয়েছে, তাহল, গ্রাম্য রাজনীতিতে বি. জে. পি. প্রার্থীর আবির্ভাব। দুটো কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে।[৬] প্রথমত ১৯৯১-এর প্রাদেশিক নির্বাচন থেকে সদ্‌গোপগোষ্ঠী বি.জে.পি.-কে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৮৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা বেশির ভাগই কংগ্রেসকে ভোট দেন। গ্রাম্য রাজনীতিতে যে মূল বিষয়টি উল্লেখ করার মতো তাহল নির্বাচন, একদিকে দরিদ্র চাষি এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, তেমনি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করছে।

বনেদিরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের সমর্থন পরিবর্তন করার পরিবর্তে সি পি.আই. (এম)-এর সঙ্গে বিরুদ্ধভাব নিয়েছে। এটি ১০ ভোটের ব্যবধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যদিও বাগদি সম্প্রদায় সি.পি.আই.(এম)-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থক। 'এ' পাড়ার বেশিরভাগ পরিবার প্রথমবারের মতো অন্যান্য বাগদি সম্প্রদায় থেকে আলাদা অবস্থান নিয়ে বি. জে. পি. প্রার্থীর জন্য সমর্থন আদায় করছিলেন। এই দ্বিতীয় বিষয়টি আমি নীচের অংশে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরবো।

'এ'-পাড়ার নির্বাচনি প্রচার

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে, নির্বাচনি প্রচারণায় 'এ' পাড়াতে প্রথম একজন বি.জে.পি. প্রার্থী আসে, সাংগঠনিক ভাবে এই আসনে বি.জে.পি. সক্রিয় ছিলো না। বাইরে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের প্ররোচনাবাদেই ১৯৯০ সালে দুর্গাপূজার সময় 'এ' পাড়া এবং 'ডি' পাড়ার প্রতিদ্বন্দ্বীভাব আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বাগদি সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে একটি ধারা প্রচলিত আছে যে তাঁরা দুর্গাপূজার শেষের দিন ভূস্বামীদের দুর্গাপ্রতিমা বহন করে। যাইহোক ঐ সময়ে বাজি পোড়ানো এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটে। যখন 'ডি' পাড়ার যুবকেরা 'এ' পাড়া অতিক্রম করছিলেন, তাদের মধ্যে বাজি পোড়ানো নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে এবং যার ফলে দুর্গা বহন করার সময়ে অনেকেই আহত হয়। এই ঘটনার পর থেকে পুলিশি আদেশে বলা হয় যে এরপর থেকে এই ধরনের সমাবেশের আগে পুলিশকে জানাতে। নির্বাচনের কিছুদিন পূর্বে এই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে। যেহেতু 'এ' পাড়া এবং 'ডি' পাড়ার বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক হওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়; তাই বিয়ের সময় এবং বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তাদের আত্মীয় অথবা কুটুম্বর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। দুর্গাপূজার পর থেকে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক আর সহজ বা স্বাভাবিক থাকে না। এরই সঙ্গে আরও একটি ঘটনা ঘটে। 'ডি' পাড়ার কিছু যুবক, 'এ' পাড়ার এক যুবককে একটি পারিবারিক বিয়ের আসর থেকে টেনে বের করে দেয়। এই পারিবারিক পরিস্থিতিতে, বি.জে.পি. সদস্য এবং তার প্রার্থীরা 'এ' পাড়াতে শক্তভাবে প্রচার চালায়। তারা বাজারে যেখানে জনসমাগম বেশি হয় এবং অল্প জনসমাগমের স্থানেও প্রতিদিন সভা করে যার ফলে 'এ' পাড়ার বাসিন্দারা এককভাবে তাদের প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানায় এবং তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে, সি. পি. আই. (এম) এবং ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস, যদিও একইভাবে তাদের সভা সমিতি করে কিন্তু সেটা ছিলো সেই আবাসনে সামান্য সময়ের জন্য। এটি সত্য যে 'এ' পাড়ার প্রার্থী বাইরের প্রার্থীর চেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে। জনসমাগম এবং বাড়ি বাড়ি ধরনার সময় জনগণ গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করে; বিশেষ করে নলকূপের অপর্যাপ্ততা অনুন্নত নিকাশি ব্যবস্থা বা কেন্দ্র, এবং একটি সাধারণ মেলামেশার কোনো জায়গা না থাকার বিষয়ে তাঁদের অভিযোগ সুপ্রচুর। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেয় আই. আর. ডি. পি. বন্টন নিয়ে অভিযোগ করেন।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বণ্টনকৃত সামগ্রী 'ডি' পাড়ার চেয়ে 'এ' পাড়াতে কম। দুই আবাসনের পরিসংখ্যানগত অনুপাত তুলনা করলে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এই পার্থক্য শুধুমাত্র লোন বরাদ্দের ক্ষেত্রে নয়, 'এ' পাড়ায় যারা গৃহপালিত পশু এবং দোকানের জন্য আবেদন করে তাদের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। যেহেতু এই সুবিধাগুলি তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তাই এই আবাসনের অনেকে এই ভাবনা পোষণ করেন। পঞ্চায়েতের বাজেট এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণ আলোচনায় আনা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের পক্ষে সকল দাবি পূরণ সম্ভব নয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হল সমাজ কল্যাণ বিভাগের অন্তবর্তী। তারা নির্বাচনি প্রচারনায় 'ডি' পাড়ার সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের অতৃপ্তি

প্রকাশ করেছে, যেটি দেখে মনে হচ্ছে তাদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়ার দরকার ছিল, 'এ' পাড়ার প্রার্থী ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন তারা যদি তাকে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত করেন তাহলে এই বিষয়গুলি সমাধান করবে এবং তাই 'এ' পাড়ার জনগণ তাকে সত্যিই সমর্থন করে।

'এ' পাড়াব জনগণ ভেবেছিলেন যে পঞ্চায়েতের আই. আর. ডি. পি. প্রোগ্রামগুলি শুধুমাত্র 'ডি' পাড়ার বাগদিগোষ্ঠীর মধ্যেই বন্টিত হয়! কিন্তু যাঁরা এই প্রোগ্রামে লাভবান হতে পারে তারা তফশিলি শ্রেণীভুক্ত এবং দারিদ্রসীমার মধ্যে বসবাসকারী। যদি পঞ্চায়েতে তাদের মধ্যে থেকে কেউ নির্বাচিত হয় তাহলে তিনি পঞ্চায়েত প্রোগ্রাম থেকে লাভজনক কিছু বয়ে আনবেন। এই বিষয়ে কে কোন দলের লোক সেটা বড় কথা নয়। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় হল তাদের এলাকা থেকে একজন পঞ্চায়েত প্রার্থী হবেন যিনি তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করবো দুর্গাপূজা ও বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটনা নির্বাচনি প্রচারের সময় তারা তাদের পঞ্চায়েত প্রশাসন সম্পর্কে তাদের অসন্তুষ্টি তুলে ধরেছে। তারা সাম্প্রতিক সময়ে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিশেষ করে আই. আর. ডি. পি. লোন কমে যাওয়া। যা হোক, শুধুমাত্র যে লোন ব্যবস্থা নিয়ে তাদের অসন্তুষ্টি তা নয়, দুই এলাকার মধ্যে সম্পূরক বৈষম্য নিয়েও। পঞ্চায়েতের সীমিত সুবিধার প্রতিযোগিতা অনেক বড় হয়ে দেখা দিলো যা সি.পি.আই.(এম) ঐক্যবদ্ধ থেকে 'এ' পাড়াকে পৃথক অবস্থানে নিয়েছে, তাদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ মনে হয়। এটি আমাদের পরবর্তী অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, তা হল প্রত্যেক আবাসনের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতা যা শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েতের প্রতি তাদের আচরণ প্রকাশ করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয়ের সাধারণ অবস্থা

আয়ের উপর জরিপকৃত তথ্য কীভাবে তা গ্রামীণ জীবনকে প্রভাবিত করে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। গবেষণা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই প্রত্যেক অঙ্গন-ওয়াড়ি কেন্দ্র ভিত্তিক, যাকে 'জরিপ রিপোর্ট' বলা হয়, তৈরী করে। তাথেকে প্রথমে আমাদের তৈরী করে উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য নেওয়া হবে। 'সংযুক্ত শিশু উন্নয়ন' উদ্যোগের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় প্রতি ১০০০ পরিবারের মধ্যে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা মূলত নবজাতক এবং মায়ের কল্যাণের জন্য। জরিপ রেকর্ডে প্রত্যেক পরিবারের স্বাস্থ্য, আয় এবং অন্যান্য উপাদানগুলো বিবৃত আছে। কেন্দ্রে সুবিধাভোগীদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে জরিপ অনুযায়ী যাদের আয় ৫০০ টাকার নীচে তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টার্গেট গ্রুপ।

'ডি' পাড়ার সীমানায় দক্ষিণ অংশে ১২৯টি গৃহস্থালীর মধ্যে বাগদিগোত্রের ৭৯, সদ্‌গোপ ৩৬টি এবং অন্যান্য ১৪টি পরিবার আছে, যদিও এটি 'এ' পাড়া এবং 'বি' পাড়ার আবাসনের মধ্যে নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী মোট গৃহস্থালীর গড় আয় ১,১৭৫ টাকা, সদ্‌গোপেদের গড় আয় ২,৬৩৬ টাকা,. বাগদিদের ৪৬৯ টাকা, অন্যান্য গোত্রের গড়

আয় ১৩৫০ টাকা। এরফলে সদ্‌গোপ এবং বাগদিগোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা একত্রে তুলে ধরে। টার্গেট গ্রুপের ৬৪টি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় যার মধ্যে ৮১ শতাংশ বাগদিগোত্র থাকে যাদের আবার সদ্‌গোপ গোত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অর্থনৈতিক বিন্যাস অনুযায়ী ৩০১- ৫০০ টাকা মাসিক আয়ের বাগদি গৃহস্থালী ৫১টি (৬৫%) যেখানে মাত্র ৪টি পরিবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিজীবী রয়েছেন, যাঁদের মাসিক আয় ৯০১-১৬০০ টাকা।

আই. আর. ডি. পি. থেকে সুবিধাভোগী অন্য টার্গেট গ্রুপটির কথা, যাদের মাসিক আয় ৯১৭ টাকা (১৯৯৩ সালে বার্ষিক ১১,০০০ টাকা) তাদের কথা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা হবে। চারটি উচ্চবিত্ত বাগদি পরিবার বাদে সকল বাগদি পরিবার (৭৩ গৃহস্থালী ৯২.৪)-কে টার্গেট গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা হয়েছে তা মাত্র দুটি সদ্‌গোপ পরিবারের সঙ্গে তুলনীয়।

এই জরিপ রিপোর্টের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না কেননা এটি অপেশাদার গবেষকদের তৈরী, এটি সুশৃঙ্খলভাবে তৈরী করা হয়নি এবং বাগদিগোত্রের অনেকে তাঁদের আয় তুলে ধরতে চাননি। তা সত্ত্বেও এই জরিপ সদ্‌গোপ এবং বাগদিগোত্রের সম্মিলিত বহমান অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেছে। আমরা এখন জমির মালিকানার প্রশাসনিক রেকর্ড, বর্গা, অর্জিত সম্পত্তি এবং পেশার অবস্থান থেকে বাগদিগোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করব।

জমির মালিকানা

বাগদিগোষ্ঠীর ১২৬ জনের নামে ব্লক ল্যান্ড রিফর্ম অফিসে (বি. এল. আর. ও.) জমির মালিকানার কাগজ রয়েছে, কিন্তু পুরো জমির অংশ ৪.৫৩ একর কারণ অধিকাংশই আবাসিক এলাকা। শুধুমাত্র তিনজনের নামে চাষযোগ্য জমির মালিকানায় নথিভুক্ত আছে, তার মধ্যে 'ডি' পাড়ার একজন (০.৬২ একর) এবং দুইজন 'এ' পাড়ার (০.৭১ এবং ০.৪ একর)। এই থেকে বোঝা যায় যে যদিও অনেক ভূমিহীন শ্রমিক আছে, এবং তারা তাদের আবাসিক অধিকার নিশ্চিত করছে। যদিও কিছু পরিবার খালের পাশে তাদের জমি বানিয়েছে যা আসলে সরকারের জমি (বাসজমি)। এইসব সাম্প্রতিক পরিবর্তনকেও ইঙ্গিত দেয়। দুই পাড়ায় দুইজন জমি কিনেছে, এবং 'এ' পাড়ার একজন ১৯৯৩ সালে ০.৪ একর জমি বিক্রি করেছে। এরফলে 'ডি' পাড়ার দুটি পরিবারের এবং 'এ' পাড়ার একটি পরিবারের একটি করে চাষের জমি আছে।

অপারেশন বর্গা

গ্রামে বর্গা শ্রমিক হিসাবে ১২৪ জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৬ জন তাঁদের মধ্যে বাগদিগোত্রের। তাঁদের মধ্যে 'ডি' পাড়ায় ১১ জন, 'এ' পাড়ায় ২ জন আর বাকিরা অন্য আবাসনের। বাগদিগোত্রের বর্গাচাষের জন্য নথিভুক্ত জমি মোট ৩৯.০১ একর, 'ডি' পাড়াতে ১১.৭ একর, 'এ' পাড়াতে ৭.৪৫ একর এবং অন্য এলাকাগুলোতে ৯.৮৬ একর। 'ডি' পাড়াতেও একটি জমিই শুধু ০.০৯ একর যাতে একটি বড় বাড়ি বানানো

যাবে। বর্গা প্রথার মূল উদ্দেশ্য জমি রক্ষা নয়, বর্গাচাষী এবং মালিকদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন। যখন প্রথম অপারেশন বর্গা চালু হয়, তখন পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে জমির মালিক এবং বর্গাচাষীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যদিও এখন এলাকায় এগুলো নগণ্য। সাম্প্রতিক সময়ে অল্প কিছু নতুন জমি নথিভুক্ত আছে। এই প্রসঙ্গে একজন বর্গাচাষী বলেন এখন আর বর্গাজমি নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, কারণ এখন তাদের জমির মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল। 'ডি' পাড়াতে ৮টি পরিবার এবং 'এ' পাড়াতে ১টি যারা জমির নথিভুক্তি ছাড়াই জমির মালিকদের সঙ্গে বর্গাচাষ করছে। প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে 'কৃষাণ-চাষি' এবং 'হাল-চাষি' বলা হয়।[৭]

অর্জিত জমি (ভেস্ট জমি)

১৯৯৩ সালের আগে বি. এল. আর. ও. দ্বারা মৌজার মধ্যে অতিরিক্ত জমি হিসাবে জমির খতিয়ান অনুযায়ী ৭৫.৬৩ একর জমি নথিভুক্ত করা হয় এবং কিছু জমি এখনও হাইকোর্টের স্থগিত আদেশে আছে। প্রতিটি ব্লকে কমিটির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির সুবিধাভোগীরা নির্বাচিত হয়। অর্জিত সম্পত্তির জন্য যে তালিকা করেছেন তাতে আবেদনকারীর গোত্র, ধর্ম সবই নথিভুক্ত আছে, তদনুযায়ী প্রাধান্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অবস্থায় আমরা ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বি. এল. আর. ও. রেকর্ড ব্যবহার করতে পারি। আমরা গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তথ্য নিয়েছি। অনেক জমি স্থগিত অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কোর্টের অধীনে আছে। এমন কি কিছু জমিও নথিভুক্ত হওয়ার সনদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে।

১৯৮৮ সালে 'ডি' পাড়াতে ১৮ জন সুবিধাভোগীর নাম ছিলো। মোট অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ ৫.২৩ একর। ১৯৮৯ সালের অতিরিক্ত ৫ জনের নামে অনুদান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'এ' পাড়ার সুবিধাভোগীদের নাম এখনও নথিভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর তিনজনের নাম জানা গিয়েছে। একজনের জমি অন্যজন লিজ নিয়েছে। এই জন্য 'ডি' পাড়া থেকে ২৩ জন এবং 'এ' পাড়া থেকে দুইজন অর্জিত সম্পত্তি চাষ করছে।

পারিবারিক পেশাগত স্তরবিন্যাস

সারণি ঃ ৪-এ বিস্তারিতভাবে পরিবারের মাধ্যমে উভয় আবাসনের পেশাগত বিন্যাসের তুলনা দেখানো হয়েছে। পেশা হিসাবে চাষাবাদ বলতে সেইসব পরিবারকে বোঝায় যাদের কমপক্ষে একটি জমি আছে এবং যারা অর্জিত সম্পত্তির সুবিধাভোগী নয়। বর্গা পরিবারের মানে অপারেশন বর্গার সময় যারা নথিভুক্ত হয়েছিলো এবং অন্যান্য বর্গা বলতে বোঝানো হয়েছে যারা নথিভুক্ত না করে প্রথাগত উপায়ে বর্গা করেছে। বাকিদের পেশা বলতে কৃষিশ্রমিক যারা প্রধানত প্রতিদিন কাজের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের কোনো জমি কিংবা প্রজার অধিকার নেই। অকৃষিখাতে চাকুরিজীবী পরিবারগুলিতে অন্তত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্যত্র প্রতিদিন চাকুরি করে। এছাড়া দোকানদার, কাঠমিস্ত্রী এবং মৎসজীবী পরিবারের লোক রয়েছে। বাকি পরিবারগুলিতে দিনমজুরদের, যাঁরা মূলত মিস্ত্রি।

সারণি ঃ ৪ পরিষ্কার ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিজীবীদের মধ্যে শ্রম পার্থক্য নির্দেশ করে। যেখানে 'এ' পাড়াতে ১২টি গৃহস্থালীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করে সেখানে 'ডি' পাড়ায় ৪টি পরিবার একই কাজ করে। যদিও 'এ' পাড়াতে ৩৪টি পরিবারের মধ্যে ১৫-এর বেশি চাকুরিজীবী এবং 'ডি' পাড়াতে ৬৯টি গৃহস্থালীর মধ্যে চাকুরিজীবী ৬। দুই আবাসনের দিনমজুরদের মধ্যে 'ডি' পাড়ার শ্রমিকেরা মূলত কৃষিকাজে সম্পৃক্ত কিন্তু 'এ' পাড়ার লোকেরা মাঠ থেকে দূরে, তারা পার্শ্ববর্তী শহরে নির্মান-শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ বোলপুর শহরের কথা বলা যায়, এখন যেহেতু সেখানে পাকা দালানের সংখ্যা বাড়ছে তাই রাজমিস্ত্রির চাহিদা বাড়ছে। পাড়ার শ্রম পরিবেশের উন্নয়ন আলোচনা প্রয়োজন কেননা এখানে তিনভাগের এক অংশ পরিবারই চাকুরির উপর নির্ভর করে না। গ্রামের আশেপাশে অনেক প্রতিষ্ঠান না থাকলে এই ধরনের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হতো না।

সারণি ঃ ৪ কাজের ধরন অনুযায়ী পরিবারের তুলনা

আবাসন	'এ' পাড়া		'ডি' পাড়া	
	মোট ঘর	মোট	মোট ঘর	মোট
অকৃষিখাত পেশা				
১. চাকুরিজীবী	১২	২৫	৪	৮
২. দোকানদার	১		০	
৩. কাঠমিস্ত্রি	২		০	
৪. মাছ বিক্রেতা	০		৩	
৫. দিন মজুর	১০		১	
কৃষিখাত				
১. চাষী	১	৬	২	৬০
২. অপারেশন বর্গা	২		১১	
৩. অন্যান্য বর্গা	১		৮	
৪. অর্জিত জমি	২		২৩	
৫. কৃষিশ্রমিক	০		১৬	
অন্যান্য	৩	৩	১	১
মোট		৩৪		৬৯

দুই আবাসনের অল্প কিছু পরিবারের জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত জমি আছে। এই বিষয়ে 'এ' এবং 'ডি' পাড়ায় একই অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু এটা তাদের জন্য একই অর্থ বহন করে না। যদিও 'ডি' পাড়ার অনেক লোকের পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষযোগ্য জমি নেই, তারা তাদের জীবনধারণের জন্য দিনমজুরির উপর নির্ভরশীল বলা যায়। পঞ্চায়েতের লাভ থেকে তারা তাদের প্রয়োজন মেটায় এবং বেশিরভাগ পরিবারই অর্জিত সম্পত্তি এবং অপারেশন বর্গার থেকে তারা অনেক বেশি সুযোগ পায়, অন্যদিকে 'এ' পাড়ার লোকেরা এই সুযোগ খুব কম লাভ করতে পারে, যদিও এক-তৃতীয়াংশ গৃহস্থালী এখনও দিনমজুরির সঙ্গে যুক্ত। তারা এলাকার বাইরে চাকুরি করে বলে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পঞ্চায়েতের সুবিধা কম ভোগ করে। দুই আবাসনের মধ্যে আই. আর. ডি. পি. লোনের বন্টন (যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে) বিশ্লেষণ করলে এটি আরও পরিষ্কার হবে।

অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে 'ডি' পাড়ার তুলনায় 'এ' পাড়া বেশ উন্নত এবং ধনী। এমন কী 'ডি' পাড়ার লোকেরাও 'এ' পাড়ায় লোকেদের সুউচ্চ অবস্থান বিবেচনায় একমত। যদিও 'এ' পাড়ায় ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্য রয়েছে এবং তারা এই ভাবনাবোধ করে যে পুরো 'এ' পাড়াটাই উন্নত এবং অন্যদিকে 'ডি' পাড়া পঞ্চায়েত থেকে প্রচুর সাহায্য পায়, দুই আবাসিকতার মধ্যে পার্থক্য আছে।

একই ধরনের প্রভেদ দুই পাড়ার শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ১৯৯৩ সালে 'এ' পাড়াতে এবং 'ডি' পাড়াতে মাধ্যমিক স্কুলে নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ এবং ১৩। ১ জন উচ্চ মাধ্যমিক ৩ জন স্নাতক এবং একজন স্নাতকোত্তরে প্রবেশ করেছে। তাঁরা সকলে 'এ' পাড়ার এবং তাঁরা তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ কোটার সুবিধাপ্রাপ্ত।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে তফশিলি সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়দের জন্য আসন বরাদ্দ থাকে। যদিও রাজ্যসভা সরকারি স্কুলে তফশিলি এবং উপজাতীয়দের জন্য বিভিন্ন ধরনের লাভজনক এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। তা-সত্ত্বেও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদের অনুপাতে পার্থক্য লক্ষণীয়। যদি প্রত্যেক আবাসনের অভিভাবকদের সামাজিক অবস্থার উপর উচ্চশিক্ষা নির্ভর করে, তবে পঞ্চায়েতের দৌলতে পাওয়া গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা সামান্য।

চাপাকল

প্রথমে আমরা জওহর রোজগার যোজনা (জে. আর. ওয়াই.), জাতীয় দরিদ্র কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম (এন. আর. ই. পি. ১৯৮৯ পর্যন্ত) এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির (এফ. এফ. ডব্লিউ. ১৯৮০) মাধ্যমে আমরা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে নিরীক্ষা করতে পারি। গ্রামীণ আর কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে প্রোগ্রামগুলি গ্রামে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে। তা-হল ১৯৯২-৯৩ সালে পঞ্চায়েত জে. আর. ওয়াই.-এর বিভিন্ন প্রোগ্রাম-এর সাহায্যে ৩টি নলকূপ এবং পথ, নিষ্কাশন ড্রেন, ১৫টি চাপাকল রক্ষনাবেক্ষণ, একটি মোটর পাম্প এবং তিনটি রাস্তা তৈরী হয়। চাপাকলের কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৭৮ সাল থেকে পঞ্চায়েত এই এলাকায় ৬১ এবং সুরুল মৌজায় ২১টি চাপাকল বসিয়েছে। যেখানে দরিদ্র শ্রেণীর বসবাস বেশি সেখানে চাপাকলগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে। বাগদিদের আবাসনে ছয়টি চাপাকল বসিয়েছে। ২টি 'এ' পাড়াতে একটি 'বি' পাড়াতে, একটি 'সি' পাড়াতে, এবং ২টি 'ডি' পাড়াতে বসান হয়েছে। এই বিষয়গুলো প্রত্যেক আবাসনের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে, এমনকি 'এ' পাড়ার অধিবাসীরা দাবি করেছে যে 'এ' পাড়াতে অনেক বছর ধরে একটি চাপাকল নষ্ট হয়ে আছে কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসের লোকজন এখনও কোনো ইঞ্জিনীয়ারকে তা ঠিক করতে পাঠায়নি। এতে মনে হয় যে, তাদের দাবি যথাস্থানে হয়ত পৌঁছাবে না। নিচে আই. আর. ডি. পি. লোন বন্টন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হলো।

আই. আর. ডি. পি.

১৯৮১-৮২ সাল থেকে আই. আর. ডি. পি. শুরু এবং ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে বাগদি পরিবারে তা দেওয়া হচ্ছে। তফসিলী সম্প্রদায় এবং উপজাতীয়রা ৫০% সরকার থেকে

সুযোগ-সুবিধা পায়। পঞ্চায়েত অফিস থেকে প্রাপ্ত লোনের সংখ্যা ২৫৯। যদিও বরাদ্দ ১৪ প্রার্থীকে অগ্রাহ্য করেছে। ২৫৯ জনের লোন হল ৯৮৩, ৫৯১টাকা। প্রতিজনের জন্য বরাদ্দ ৩,৭৯৮, কিন্তু দরিদ্র পরিবারেই আর. আই. ডি. পি.-র ক্ষুদ্র ঋণগুলো সহজেই দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি লোন দেওয়া হয়েছিলো ১৯৮৫-৮৬ সালে এবং তা আস্তে আস্তে কমে যায়। আঞ্চলিক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের তথ্য অনুযায়ী অন্যান্য গ্রাম থেকে এই গ্রামের লোকদের লোন পরিশোধের হার কম। এই জন্য এখন ঋণ প্রার্থীদের অবস্থা খুব কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়।[৮]

সারণি ঃ ৫-এ ১৯৮১ সালের পর থেকে বাগদি আবাসনে বরাদ্দকৃত লোনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক কলমে 'এ' পাড়া, 'ডি' পাড়া, বাগদিশ্রেণী এবং পুরো গ্রামের তুলনা করা হয়েছে। ছক থেকে এটা বোঝা যায় যে 'ডি' পাড়াতে লোনের বরাদ্দ 'এ' পাড়া থেকে বেশি হয়। 'ডি' পাড়া যেখানে মোট ৪ বার লোন পায় সেখানে 'এ' পাড়া বেশি পায়। এবং যদিও পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত ৯ ঃ ৫, এটা থেকে বোঝা যায় যে 'ডি' পাড়ার লোকেরা 'এ' পাড়া থেকে তুলনায় ঋণ দ্বিগুন বেশি পান আরও বেশি বলতে হলে, যখন ১৯৮৪ সালে বাগদিদের আই. আর. ডি. পি. লোন চালু হয়, তখন 'ডি' পাড়াতে ২৬টি ঋণ প্রকল্প চালু ছিল, কিন্তু 'এ' পাড়াতে কোনো লোন দেওয়া হয়নি এবং পরের বছর মাত্র ৪টি দেওয়া হয়। এ-সমস্ত বিষয়গুলো 'এ' পাড়ার জনগণের মতামতকে সমর্থন দেয় যে তারা 'ডি' পাড়ার তুলনায় আই. আর. ডি. পি. কম পায়।[৯]

তারা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আরও একই ধরনের বৈষম্যের কথা বলেন যেমন 'ডি' পাড়াতে পশু পালনের বন্টন বেশি এবং তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করার পরিমান এখনও বেশি।[১০] যেখানে 'ডি' পাড়াতে প্রত্যেক পরিবারের গড় লোনের পরিমাণ ৩,০৮৯ সেখানে এ পাড়াতে ৩,৫২২। দুটো আবাসনের বিভিন্ন জিনিস বন্টনের পার্থক্য দেখায়।

সারণি ঃ ৫ প্রতিবছর আই. আর. ডি. পি. লোনের বন্টন তালিকা

সাল	'ডি' পাড়া		'এ' পাড়া		বাগদি মোট		গ্রাম মোট	
	নং	(টাকা)	নং	(টাকা)	নং	(টাকা)	নং	(টাকা)
১৯৮১-৮২	০	০	০	০	০	০	৯	১৫৬৯২
১৯৮৪-৮৫	২৬	৫০৫২০	০	০	৩২	৫৮৪২০	৫৯	১৩৯৩২৫
১৯৮৫-৮৬	১৪	৩২০৬০	৪	৭৩০০	২৩	৫৭৩২০	৭৮	১৮৯৪৫০
১৯৮৬-৮৭	১	৪৭৫০	২	৮৪৫০	৩	১৩২০০	১৬	৬৮৮৪০
১৯৮৭-৮৮	৩	১২৮৯০	১	৪৬৮০	৪	১৭৫৭০	১৮	৮৭৬২১
১৯৮৮-৮৯	৮	৩৭৪২০	৪	১২৮৩৪	২০	৮২৪৭৪	৫০	২৬২১৫
১৯৮৯-৯০	১	৭৪৮০	০	০	১	৭৪৮০	৫	২৮২৮০
১৯৯০-৯১	৩	২২৫০০	০	০	৫	৩৬৯০০	১৪	১১৭০০০
১৯৯১-৯২	২	১৫০০০	১	৯০০০	৭	৫০৪০০	১০	৭৪৪২৫
মোট	৫৮	১৮২৬২০	১২	৪২২৬৪	৯৫	৩২৩৭৬৪	২৫৯	৯৮৩৫৯১

সারণি ঃ ৬ দুটি আবাসনে বিভিন্ন ভাগ অনুযায়ী লোন বণ্টনের তুলনা করা হয়েছে।

শিল্পখাতে ঋণ বেশি পায়, যা তাদের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এটা খুবই স্বাভাবিক কেননা 'ডি' পাড়ায় অধিবাসীরা বেশিরভাগই তাঁদের ভরণপোষনের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, 'এ' পাড়ার অধিবাসীরা বেশিরভাগই বাইরের চাকুরিজীবী এবং শ্রমিক। এই বন্টনের ধরন পক্ষপাতিত্বের ফলাফলকে ইঙ্গিত করে না, এটি বাস্তব অবস্থা এবং সুবিধা-ভোগীদের উদ্দেশ্যকে বোঝায়। আরও বলতে হয় বাগদি সম্প্রদায়ের ১২ জনের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয় যার মধ্যে ৫টি 'ডি' পাড়ার এবং ৭টি অন্যান্য আবাসনের। 'এ' পাড়ার কোনো ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়নি। পঞ্চায়েতের সদস্য এবং আঞ্চলিক ব্যাঙ্কের কমিটির যৌথ নির্বাচনের সময় প্রার্থীর বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করার মাধ্যমে লোনের আবেদন নাকচ হতে পারে, এই নথির নাকচ কেসগুলো 'এ' পাড়ার সমর্থন পায়নি।

আই. আর. ডি. পি. প্রত্যেক গৃহস্থালীর বার্ষিক আয় মূল্যায়ণ করে এবং যারা দারিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করছে তাদের ঋণ দিচ্ছে। এটি দুই আবাসনের মধ্যে আই. আর. ডি. পি.-র টার্গেট গ্রুপের আরও বিস্তাড়িত ভাবে আলোচনা করা হবে।

সারণি ঃ ৬ দুই আবাসনের আই. আর. ডি. পি. পদের বন্টন

খাত	লোনের সামগ্রী	'ডি' পাড়া	'এ' পাড়া
কৃষি	বলদ এবং চোয়াল	৬	০
	বলদ এবং লাঙ্গল	৯	০
মোট		১৫	০
পশুপালন	ভেড়া	২৪	০
	বলদ	৪	০
	গর্ভবতী গাভী	৯ (৩)	১
	গরুর বাছুর	১২	৩
	ছাগল	৫	৩
	শূকর	০	১
	বাজহাঁস	০	১
মোট		৫৪	৯
হাত শিল্প	চূর্ণকারী মেশিন	৯	০
	কাঠের কাজের মেশিন	০	২
মোট		৯	২
ছোট	রিকশা	০	১
	দোকান	১	২
	দর্জি	১	০
মোট		২	৩
সর্বমোট			১৪

সূত্র ঃ রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নথিপত্র।

আই. আর. ডি. পি.-র টার্গেট গ্রুপ

জরিপ তালিকা এবং দরিদ্র পরিবারের তালিকা অনুযায়ী, প্রার্থীদের আই. আর. ডি. পি. লোনের জন্য নির্বাচন করা হয়। এই তালিকায় গৃহস্থালীর আয়, বর্ণ অথবা ধর্ম, পারিবারিক বিন্যাস এবং মালিকানা নথিভুক্ত রয়েছে এবং তাদের আয়ের নিম্নমুখী আবাহানগত

ভাবে সাজানো হয়েছে । আই. আর. ডি. পি.-র লোনের জন্য ৫০ কোটা, তফশিলি সম্প্রদায় এবং উপজাতীদের জন্য ৪০, নারীর জন্য ৩, শারীরিক অক্ষম ব্যক্তির জন্য বাকিটা। বি. ডি. ও. অফিসের একজন অফিসার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জরিপ করেন এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েত অফিসে এটা সংরক্ষিত থাকে, ঋণ পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল তাদের নাম তালিকায় থাকতে হবে। এখানে ১৯৮৯-৯০ সালের জরিপ তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে ৬৪৪ গৃহস্থালী গ্রামে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে, যার মধ্যে ১৫০ বাগদি সম্প্রদায়ের। উল্লেখযোগ্য যে এই আসনে যে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বাগদি গৃহস্থালী হলো ৪১.৯%।

সারণি ঃ ৭ আই. আর. ডি. পি. সার্ভে বাগদি পরিবার বর্গের আর্থিক অবস্থা

টাকা	'ডি'-পাড়া	'এ'-পাড়া	বাগদি মোট পরিবার	মোট
০ - ১০০০	০	০	০	০
১০০১ - ২০০০	৪	০	৪	৬
২০০১ - ৩০০০	১	০	১	১
৩০০১ - ৪০০০	২	০	৫	৭
৪০০২ - ৫০০০	২৩	১২	৪৮	৫৩
৫০০১ - ৬০০০	১৬	৮	৪৪	৪৪
৬০০১ - ৭০০০	৭	৪	১৫	১৩
৭০০১ - ৮০০০	৫	১	১০	১১
৮০০২ - ৯০০০	৯	২	১৬	১৮
৯০০১ -১০০০০	৩	০	৫	৫
১০০০০ -১১০০০	২	০	২	৮
মোট	৭২	২৭	১৫০	১৬৬

সূত্র ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস রিপোর্ট ১৯৯২।

সারণি ঃ ৭ 'এ' তালিকায় আয় হিসাবে গৃহস্থালীর বণ্টন দেখানো হয়েছে। এই ছক থেকে তিনটি বিশেষ অবস্থা বোঝা যায়। প্রথমত, 'ডি' পাড়ার ৭টি নাম আছে যাদের বলা হয়েছে 'দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্র', যাদের বাৎসরিক আয় ৪,০০০ টাকা, যেখানে 'এ' পাড়াতে এরকম নেই, দ্বিতীয়ত, 'এ' পাড়ার চেয়ে 'ডি' পাড়ায় নামের তালিকা ২.৭ বেশি। তৃতীয়ত, ঋণ গ্রহণকারী 'ডি' পাড়াতে ৮০.৬%, 'এ' পাড়াতে ৪৪.৪% এবং পুরো বাগদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৬৩.৩%। এইসব পাড়ার যে পার্থক্য রয়েছে, ধারণা তার এবং বন্টনের দিক থেকে আমরা কিছুতেই 'এ' পাড়া থেকে 'ডি' পাড়া যে ৬ বার পশুপালনের ঋণ বেশি পায় তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা এটি নিরপেক্ষ ভাবে বলতে পারি যে, এটি 'এ' পাড়া এবং 'ডি' পাড়ায় পঞ্চায়েত সদস্যদের রাজনৈতিক প্ররোচনার ফল। যাহোক যদি আমরা জরিপ তালিকা থেকে প্রত্যেক আবাসনের পটভূমিগত ভিন্নতা বিবেচনায় আনি তাহলে এখানের কাজে রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা আছে এটা বলা কঠিন। তারপরও ধারণা করা সম্ভব যে প্রত্যেক আবাসনের পক্ষে ঋণ নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উপসংহার

যে সত্য এখানে উল্লেখ করা হল তা কৃতকার্য এবং পরিত্যক্ত প্রার্থীর মধ্যে বিরূপ মনোভাবের দিক সীমিত সম্পদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার মাধ্যমে যোগ্য অযোগ্য নির্ধারিত হয়। এটি অস্বচ্ছতার অবয়ব তৈরি করে এবং এই বণ্টন অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বা সমগ্র পরিকল্পনার জন্যে যথেষ্ট তথ্য যোগান না দিয়ে, পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত না হয়ে লোকের পক্ষে বাস্তবায়িত হয়। নমুনা এলাকা একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি। কিন্তু আমরা কিছুতেই নিয়োগ এবং শিক্ষার অগ্রসর অবস্থা সম্পর্কে সাধারণীকরণ করতে পারি না যা-কিনা পশ্চিমবাংলার পুরো অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যা-হোক এই অবস্থা গ্রামীণ গবেষণা সমাজের গাঠনিক চরিত্রের পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে।

জি কে লেইটেন (১৯৯২ঃ ২১৬) যুক্তি দেখান যে ভূমির পুনর্বিন্যাসের, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, ক্ষমতাশালী কৃষক বিদ্রোহ দারিদ্র দূরিকরণ সফল বাস্তবায়নের শর্ত পূরণ করে। দরিদ্র কৃষকদের জন্য অর্জিত সম্পত্তি এবং অপারেশন বর্গার মতো ভূমির পুনর্বিন্যাস তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং কৃষক সমিতির স্থানীয় শাখার সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানগত নিকট সম্পর্ক বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। এটা বামফ্রন্টের উপর তাদের আস্থা বাড়িয়ে দেয় তা এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চায়েতের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় প্রশাসনের এই অবস্থা উন্নয়ন প্রোগ্রাম বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ, আই. আর. ডি. পি. প্রোগ্রামের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জরুরি। একই সময়ে এটি 'এ' পাড়ার পঞ্চায়েতের সুবিধার কম সুযোগপ্রাপ্ত লোকেদের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করতে সমর্থ নয় নতুবা এই বন্টন যদি অন্যান্য প্রোগ্রাম এবং পর্যাপ্ত তথ্যের সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত হতো। এই বিষয়ে ১৯৮০ সাল থেকে হওয়া ব্যক্তির মধ্যেও বন্টন কত টার্গেট গ্রুপ সমীকরণ এবং ১৯৫৩ সাল থেকে শুরু হওয়া জমির পুনর্বিন্যাস মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য শক্তিশালী কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে কৃষক সমাজের কাঠামো পুনর্গঠন করে। এই বিষয়ে হ্যারিসের মতামত সত্ত্বেও এটা যে শুধু অল্প সেচের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বোরোচাষের গতি কেন্দ্রিক নীতিভিত্তিক নয়। যদিও এটি কোনো কোনো সময় কৃষি উৎপাদন বাড়ায়। এল.এফ.জি.-এর নতুন শিল্প ভিত্তিক নীতি, লোকজনের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এমনকি গ্রামীণ সমাজের জন্যও জরুরী যেটি কৃষক সমাজে অসমাধানযোগ্য সমস্যা হিসাবে যুক্ত মনে হয়।

সূত্র নির্দেশ

১ এটা সর্বজন বিদিত যে এক দুমোঁ (১৯৮০) হিন্দু সমাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন। যাহোক এই বইয়ে ইতিমধ্যে অনেক সমালোচনা হয়েছে। সি. জে. ফুলার (১৯৯৬) সম্পাদিত বইটি দেখুন।

২ ভারতীয় সংবিধান অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ তফসিলি সম্প্রদায় নির্বাচন অস্পৃশ্যতার উপর নির্ভর করে কিন্তু নির্বাচকগুলোর বিভিন্ন মানদণ্ডের জন্য•সুযোগ নেই। এই বিষয়ে দেখুন Galanter (1984 131-147)।

৩ ও. বি. সি.-র সংরক্ষিত ব্যবস্থা নিয়ে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন এটি হয়তো বর্ণ সচেতনতা শক্তিশালী করবে। এ-প্রসঙ্গে দেখুন Beteille (1990), M N. Srinivas (1996)।

৪ দেখুন Echeverri Gent (1992), Kolhi (1990, 1991), Lieten (1990, 1992); Mallick (1992, 1993), Nossiter (1988), Sata (1980), Webster (1992), Westergaard (1986)।

৫ পশ্চিমবাংলায় ব্যবস্থার জন্য দেখুন Compendion of the West Bengal Panchayat Act. 1978 and the West Bengal Panchayat (Election) Rules 1974, পঞ্চায়েত বিভাগ কলকাতা ১৯৯৩, সাধারণভাবে চতুর্থ নির্বাচন পর্যালোচনার জন্য দেখুন Lieten (1994), Bandyapadhay (1993)।

৬ গ্রামের লোকেদের সাক্ষাৎকার থেকে এই বর্ণনা। সাক্ষাৎকারটি নির্বাচনের পরে নেওয়া।

৭ কৃষাণ-চাষির ক্ষেত্রে বর্গাদার লাঙ্গল ও বলদের শর্ত ছাড়াই জমি চাষ করে এবং ৪০% শস্য গ্রহণ করে। হাল-চাষির ক্ষেত্রে ভাড়াটে চাষি ৭৫% শস্য পায় যদি তারা লাঙ্গল ও বলদ দেয়। কিন্তু এপক্ষকেও হাল-চাষি বলে যদি কৃষিশ্রমিকরা নিজেদের লাঙ্গল এবং বলদ ঘন্টা ভিত্তিক ধার দেয়।

৮ সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (আই.আর.ডি.পি) বীরভূম জেলা উন্নয়ন সংস্থা (ডি.আর.ডি.এ.) সিউড়ি ১৯৯২, পৃ. IV।

৯ আলাদা একটা বইয়ে ১৪ টি নাম আসন ৩-এ নথিভুক্ত করা আছে। ১৩৬টি বাগদিগোত্রের পরিবার আসলে আসন ১ ছক ৭ দুই আবাসনের মোট নামের সংখ্যা দেখায়। ১০ এই প্রসঙ্গে G K Lieten (1994) অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে আই. আর. ডি. পি.-র সংযুক্তিতার গুরুত্বের কথা বলেন। J. Echeverri Gent (1992) অবশ্য এন. আর. ই. পি.-র একই সমস্যার কথা বলেন।

১০ সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিতর্কের জন্য দেখুন *আনন্দবাজার পত্রিকা* ৩ মে, ৪ জুন, ২১ জুলাই এবং ২০ অগাষ্ট ১৯৯৪।

সূত্র তালিকা

আচার্য, বুদ্ধদেব (1982), *Surul Sarkarbari 0 Maharsh Shantiniketan*, Bolpur, Sri Durga Press

বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি. (1993), 'Fourth general elections of panchayats in West Bengal (May 1993)', *Mainstream*, 26 January 1993, 15-21.

বেঁতেই, এ. (1990), 'Caste and politics', *Times of India*, 11 September.

ডেলিগে রবার্ট (1996), 'At the threshold of untouchability Pallars and Valaiyars ion a Tamil Village' in C J. Fuller ed., *Caste Today*

দুমো, এল (1980)(1966), *Homo Hierarchicus: The Caste System and its implications*, Complex revised English edition, Chicago, University of Chicago Press.

এচেভেরি-জেন্ট, জে. (1992), 'Public participation and poverty alleviation: the experience of reform Communists in India,s West Bengal', *World Development*, Vo1.20(10).

ফুলার, সি. জে (ed.) (1996), *Caste Today*, Delhi, Oxford University Press.

Galanter, M. (1984), *Competing Equalities Law and the Backward Classesin India*, Berkeley, University of California Press

হ্যারিস, জন (1993), 'What is happening in rural West Bengal?. agrarian reform, growth and distribution', *EPW* 28, no.28, 1237-47

আইস্যাক, হ্যারল্ড, আর (1965), *Indian's ex-Untouchables*, Massachustts Institute of Technology

কোহলি, অতুল (1990), 'From elite activism to democratic consolidation: politicalchange in West Bengal', *Dominance and Stale Power ion Modern India : Decline of a Social Order*, 2 vols F. Frankel and M.S.A Rao, eds., Delhi, Oxford Univercity Press

কোহলি, অতুল (1990), *Democracy and Discontent. India's Growing Crisis of Governability*, Cambridge, Cambridge University Press

লাইটেন, জি. কে. (1990), 'Depeasantisation discontinued land reforms in West Bengal', *EPW* 25, no.40, 2265-71.

লাইটেন, জি. কে. (1992), *Continuity and Change in Rural West Bengal*, Delhi, Sage publications

লাইটেন, জি. কে. (1994), 'For a new debate on West Bengal', *EPW* 29, no 29, 1835-38

মল্লিক, রস (1992), 'Agrarian reform in West Bengal the end of an illsion', *World Development*, Vol 20, no 5, May

মল্লিক, রস (1993), *Development Policy of a Communist Government West Bengal since 1977*, Cambridge South Asian Studies, Cambridge, Cambridge University Press

নসিটর, টি. জে. (1988), *Marxist State Government in India*, London, Printer Publishers

নিকোলাস, রালফ (1963), 'Village factions and political parties in rural West Bengal', *Journal of Commonwealth Political Studies* 2, no 1, November, 17-32

রিজলি, এইচ. এইচ. (1891) (1981), *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, Firma KL Mukpopadhyay

সাতো হিরোশি (1980), 'The Rural and agricultural policy of the Left Front Government of West Bengal, India' (in Japanese), *Aijakeizai* (Asian Economics), January, 2-19

শ্রীনিবাস, এম. এন. (ed) (1996), *Caste Its Twentieth Century Avatar*, New Delhi, Viking, Penguin India

ওয়েবস্টার, নীল (1992), *Panchayati Raj and the Decentralization of Development Planning in West Bengal*, Calcutta, K P Bagchi

ওয়েস্টারগার্ড, কার্সটেন (1986), *People's Participation, Local Government and Rural Development The Case of West Bengal*, Copenhagen, Centre for Development Research

অনুবাদঃ জোবাহিদা নাসরীন

৬

সমসাময়িক পশ্চিমবাংলায় ভাগচাষ ঃ একটি গ্রামে বোরোচাষ পর্যবেক্ষণ

হিদেকি মোরি

১. প্রস্তাবনা

পশ্চিমবাংলার কৃষি কাঠামোয় ১৯৮০-র পূর্ববর্তী জড়প্রায় দশা আর পরবর্তীকালে উচ্চহার উৎপাদনমাত্রার বৈপরীত্যটি বিস্ময়কর। ধান পশ্চিমবাংলার প্রধান ফসল। প্রথাগত ভাবে তিনপ্রকারের ধান এখানে উৎপন্ন হয় — আমন (শীতকালের ধান), আউশ (হেমন্তের ধান) আর বোরো (গ্রীষ্মকালের ধান)। এই তিন রকম ধানের মধ্যে আমন প্রধান। আটের দশকে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল বোরো উৎপাদনযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, আর আমন এবং আউশের উৎপাদন বৃদ্ধি। বিশেষ করে বোরো ধানের উৎপাদনের হার বলা যায় নাটকীয় ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহা এবং স্বামীনাথনের মতানুসারে আটের দশকে আউশ আর আমন বৃদ্ধির হার ৪.৭ শতাংশ হয় আর এই সময় বোরো ধানের বৃদ্ধির হার ১২.৪ শতাংশে পৌঁছায়। মোট উৎপন্ন ধানের মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮০-৮১-তে ১১.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৯০-৯১-তে ২৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু বোরো ধানের আবাদ বর্ষার সময় হয় না, বোরো ধানের জমির বৃদ্ধির অর্থ সেচের জমির বৃদ্ধি। বোরো আবাদের জন্য জমিতে যে বীজ বপন করা হয় তা উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং তার জন্য দরকার হয় বেশি সার আর কীটনাশক, সাধারণ শস্যের চাইতে বেশী। যেসব জমিতে আমন আর আউশ ধান ফলানো হয় সেই জমিতেও আজকাল অধিক উৎপাদনশীল বীজের প্রয়োগ শুরু হয়েছে।[১]

বয়েস (Boyce) যেই পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'কৃষির অচলাবস্থা' বলে, যেমন স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কৃষি উৎপাদন প্রগতি নিম্নবর্তী। পশ্চিমবাংলা সেচ এলাকা, উচ্চফলনশীল বীজ আর সারের প্রয়োগে এই অবস্থা অতিক্রমে সমর্থ।[২]

অনেক গবেষক ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' অথবা কৃষিকার্যে প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রামীণ সমাজের উপর এর প্রভাব দেখানো হয়। ভারতে সবুজ বিপ্লবের একেবারে প্রথম পর্ব থেকে কিছু কৃষকের উপর এই প্রযুক্তি বিপ্লবের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এই ধরনের যুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে দেখানো যায়। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য দরকার হয় উৎপাদনবর্ধনকারী বীজ, সার

আর কীটনাশকের সংহত ব্যবহার, জল সরবরাহ আর টাকার সুবিধা। সুতরাং জমিদার বা উন্নতিশীল কৃষকশ্রেণী যাঁদের হাতে আর্থিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে তাঁরাই নবপ্রযুক্তি ব্যবহার থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছে। অন্যদিকে গরিব কৃষক, বর্গাদার বা ছোট কৃষক যাঁদের কাঁচামাল জোগাড় করার ক্ষমতা সীমিত বা যাদের প্রয়োজনীয় টাকা বা সেচের জমির অভাব, তাঁদের অবস্থার অবনতি হয়। কেউ কেউ জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। সুতরাং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার 'ধনী' আর 'গরিব' কৃষকদের মধ্যে বৈপরীত্য আরও এগিয়ে এনেছে (ফাঙ্কেল ১৯৭১, গ্রিফিন ১৯৭৪, গফ ১৯৮৯)। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় চাষিদের সর্বহারায় রূপান্তরণ (proletarianization) অথবা কৃষকদের কৃষিকার্য থেকে উচ্ছেদ (depeasantization)।

এই প্রক্রিয়াটিকে অতিরঞ্জিত করে দেখা কিন্তু আমাদের উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বায়ার্স (১৯৮১) বিস্তৃত প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে কৃষকসম্প্রদায়কে সর্বহারায় পরিণত করার এই প্রক্রিয়া ১৯৭০-এর দশকে ভারতে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে হয়, কিন্তু এটা শুধু আংশিকভাবে সম্ভব হয়, কারণ অনেক ছোট ভূমিমালিক ও বর্গাদারেরাই জমির অধিকার টিকিয়ে রাখতে সফল হয়েছিলেন।[৩] আরো বলা দরকার হ্যারিস (Harriss ১৯৯২) আরো নতুন তথ্য থেকে দেখিয়েছেন যে কৃষককুলের দারিদ্রীকরণ সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি। তবে হ্যারিস মেনে নিয়েছেন যে ১৯৮০-র দশকে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা কমে গিয়ে বেতনজীবী শ্রমিকদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪] কিন্তু তার মানে এই নয় যে ছোট জোতদার বা কৃষকেরা নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ব করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন।[৫]

পশ্চিমবাংলায় সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে যেসব জায়গায় সেচের কাজ হয়েছে, সেখানে অবস্থাপন্ন চাষী ও টিউবওয়েলের মালিকেরা ছোট জোতদারদের থেকে জমি ইজারা নিয়েছেন বোরোচাষের জন্যে আর নিজেদের দখলি জমি বাড়িয়ে নিয়েছেন। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫; ঘোষ ১৯৮১; রোগালি, হ্যারিস-হোয়াইট এবং বোস ১৯৯৫ঃ ১৮৬৫)। এইসব ক্ষেত্রে জমি ইজারা নেওয়া হয়েছে একটি নির্দিষ্ট ভাড়ায় বা ঋতুর একটি শস্য উৎপাদনের সময়।[৬]

কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, কম জমির মালিক, এমনকি ভূমিহীন কৃষকও বাঁধা ভাড়ায় বোরোচাষের জন্যে জমি ইজারা নিয়েছেন। যদিও স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে যে বড় জোতদার যাঁরা উৎপাদনে লগ্নী করতে পারেন তাঁরাই এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারেন। (ঘোষ ১৯৮১; ওয়েবস্টার ১৯৯০ঃ ১৮৩-১৮৪; হ্যারিস ১৯৯৩ঃ ১২৩৯; গুপ্ত ১৯৯৩ঃ ৮৮; সেনগুপ্ত এবং গজদার ১৯৯৭ঃ ১৫৪; মোরি ১৯৯৭ঃ ৪৯)।

তাছাড়া, বর্তমান পশ্চিমবাংলায় ভাগচাষ ব্যবস্থার উপর নানান সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ছোট জমির মালিক তাদের জমির পরিমাপ বাড়াবার জন্য বোরো ধান চাষের সময় নির্দিষ্ট খাজনায় জমি ভাগচাষ করছে।

বোরোচাষের এই নতুন ধারার প্রবর্তনকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই বলে যে, এটি একটি প্রক্রিয়া যা কৃষক সম্প্রদায়কে কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধিতা করে।

সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, আশির দশকে বোরোচাষের প্রসারণ আর নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন ভূমিহীন কৃষক অথবা কম জমির মালিকদের বোরোচাষ থেকে সরিয়ে রাখেনি।

এই রচনাটির উদ্দেশ্য হল গ্রামীণস্তরে সংগৃহীত (যা লেখক পশ্চিমবাংলার একটি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছেন) তথ্যের সাহায্যে যেসব ছোট জোতদার আর ভূমিহীন কৃষক জমির অধিকার পেয়েছেন আর বোরোচাষের আবাদ করেছেন তাদের অবস্থা নির্ণয় করা। লেখক এই রচনার প্রারম্ভে পশ্চিমবাংলা আর বিশেষত অনুশীলিত গ্রামটিতে জমি ইজারার ঐতিহাসিক বিবরণ দেবেন। তারপর অনুশীলিত গ্রামে জমি ইজারার সমসাময়িক পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হবে। এবং শেষে যে পরিস্থিতিগুলির জন্য ছোট জোতদার আর ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায় জমির অধিকার আর বোরোচাষের সুযোগ পেয়েছেন সেগুলি পরীক্ষা করা হবে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য আয়ের জন্যেও ঘরে ঘরে আর্থিক অবস্থার পার্থক্য দেখা যায়। তাই এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের আর্থিক অবস্থার পার্থক্য লক্ষ্য করা উচিত। এই রচনার দ্বিতীয় ভাগে আমাদের গবেষণার বিষয় হল, কী ভাবে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অবস্থা বোরোচাষে ভিন্নরূপে অংশগ্রহণে প্রণোদিত করে।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৫-এর মধ্যে লেখক মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধানের কাজ করেছেন। পরে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুরনো কাজের অনুসরণে সেই গ্রামের কিছু পরিবারকে আবার পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২. গ্রামের অবস্থান এবং জমির মালিকানার রীতি

যে এলাকাটিকে সমীক্ষণ করা হয়েছে সেটি একটি নির্বাচনকারী গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা নয়। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্যে সেটিকে একটি গ্রাম, গ্রাম 'ন' বলা যায়। যে গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম 'ন'-র অবস্থান তাকে 'খ' গ্রাম পঞ্চায়েত ('খ' জিপি) বলা হবে। 'খ' গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে এগারোটি নির্বাচনকারী গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সাহায্যে। 'খ' গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এবং হুগলি নদীর পাশে অবস্থিত। গ্রাম 'ন'-তে ৩২৭টি পরিবারকে সমীক্ষা করা হয়েছে।

সারণি ঃ ১-এ যে পরিবারগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে তাদের জমির মালিকানার নকশা দেখানো হয়েছে। তিন-চতুর্থাংশ পরিবার ভূমিহীন অথবা কম জমির মালিক, ০.৫০ একরের নীচে। জমির মালিকানার বিতরণ অসমরূপ । ছোট জোতদার (০.৫০ একরের নীচে) পরিবার গঠন করে সমগ্র পরিবারবর্গের ভাগ ৩০.৬ শতাংশ; কিন্তু মোট ১৩.১ শতাংশ জমির মালিকানাস্বত্ব তাঁদের হাতে। কিন্তু সেই অনুপাতে যদিও বড় জোতদার পরিবার সমগ্র পরিবারবর্গের ১.৫ % গঠন করে, তাঁরা শতকরা ৩০.৬ ভাগ জমির মালিক। জাতি হিসাবে মাহিষ্য, একটি কৃষিজীবী জাতিবর্ণ, যাঁদের মেদিনীপুরে সংখ্যাধিক্য আছে এবং তাঁরাই প্রভাবশালী জাতি। যদিও ভূমিহীন পরিবার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে, এটা বলা যায় না যে জমির মালিকানা কোনো একটি জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এবং তাই এই সূত্রে বলা দরকার যে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর মধ্যে কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানে মুসলমান বা দলিত (তফশিলি জাতির) পরিবারবর্গ

বহু জমির মালিকানা উপভোগ করে এবং তারা আর্থিকভাবেও প্রভাবশালী। সুতরাং এই এলাকার পরিবারদের আর্থিক অবস্থান বোঝার জন্যে জাতি খুব একটা কার্যকর নির্দেশক নয়।

গ্রাম 'ন'-এ প্রধান শস্য ধান। দুই প্রকারের ধান আমন আর বোরো আবাদ করা হয়। কিছু কিছু গ্রামবাসী পানের চাষও (যা বিক্রির জন্যই প্রধানত উৎপাদিত হয়) করে থাকেন।

সারণি ঃ ১ সমীক্ষিত পরিবারের জমির মালিকানার প্রকৃতি

জমি	মালিকানা (একর)	মাহিষ্য	মুসলমান	তফসিলি	ব্রাহ্মণ	অন্যান্য	সমগ্র
ভূমিহীন	০	৬৯	৫৩	২০	৪	১	১৪৭ (৪৫.০)
ছোট	০.০১ - ০.৫০	৬২	১৯	১২	১	৬	১০০ (৩০.৬)
	০.৫১ - ১.০০	২২	৬	৫	০	৬	৩৯ (১১.৯)
মাঝারি	১.০১ - ২.৫০	১৩	৬	২	১	০	২২ (৬.৭)
	২.৫১ - ৫.০০	১০	০	১	১	২	১৪ (৪.৩)
বড়	৫.০১ -১০.০০	২	০	০	০	০	২ (০.৬)
	১০.০১ -	২	১	০	০	০	৩ (০.৯)
মোট		১৮০	৮৫	৪০	৭	১৫	৩২৭ (১০০)

সূত্র ঃ লেখকের পরিদর্শন সূত্রে প্রাপ্ত।
দ্রষ্টব্য ঃ তফসিলিব মধ্যে ধোপা (২৯), মুচি (১০) এবং পৌন্ড্র (১) আর অন্যান্যদের মধ্যে বৈষ্ণব (৬), নাপিত (৮) আর কুম্ভকার (১) অন্তর্গত।

৩. বর্গাদারি আর জমি সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন

বর্গাদারির একটি লম্বা ইতিহাস আছে পশ্চিমবাংলায়। ঔপনিবেশিক কালে এই ব্যবস্থা নানা ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত ১৯৩০-এর সময়ে এবং ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়ে গরিব চাষিদের ঋণবৃদ্ধির ফলে বর্গাদারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে (কুপার ১৯৮৮ ঃ ১৭-৭৮)।

স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলা সরকার কিছু আইনের প্রবর্তন করেন বর্গাদারদের অধিকার রক্ষা করার জন্য। ১৯৫০-এর বর্গাদার আইন, কোন কোন অবস্থায় বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা যায় তা প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর, জমি সংশোধন আইন ১৯৫৫, বর্গাদাররা কত ভাগ পাবে তা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে গরীব গ্রামবাসীদের আন্দোলনের পর ১৯৫৫-এর আইনকে সংশোধন করা হয় ১৯৭২-এ, যাতে বর্গাদাররা আরো বড় অংশ পেতে পারেন। সংশোধিত আইন অনুযায়ী বর্গাদাররা ৭৫ শতাংশ শস্যের অধিকারী যদি তাঁরা বীজ,সার ইত্যাদি সরবরাহ করে (যদি জমির মালিক উৎপাদনের জন্য যা দরকার সম্পূর্ণ সরবরাহ করে ভাগ হবে ৫০ ঃ ৫০)। এই সংশোধিত আইন বর্গাদারদের বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এইসব আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা দেখে জমিদার বা জোতদাররা বর্গাদারদের হাতে জমি দেবার ব্যাপারে সতর্কতা

অবলম্বন করেন আর জমির মালিকেরা বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে শুরু করে। এর ফলে জোতদারদের দ্বারা চাষ করা জমি আর বেতনভোগী কৃষিশ্রমিক দ্বারা আবাদি জমি বেড়ে যায়।[৭]

এছাড়া পারস্পরিক আধাআধি বখরা, বর্গাদাররা চাষের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস সরবরাহ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে আইন সংশোধন হলেও সেই আইন অনুযায়ী ফসল ভাগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়নি।

১৯৭৭-এ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে জমির আইন সংশোধনের উপর প্রাধান্য দেন। বিশেষত, এই সরকার 'অপারেশন বর্গা' নামে একটি অনন্য কার্যক্রম শুরু করেন যাকে বলা যেতে পারে বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করার আর তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার একটি বিপুল প্রচেষ্টা। ১৯৭৮ সালের পর কয়েক বছরে যে সব বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার লক্ষ্যণীয়। জমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য বহু গবেষণাকার্যে আলোচিত হয়েছে (যেমন, কোহলি ১৯৮৭ঃ ১২০-১৩৬; লাইটেন ১৯৯২; লাইটেন ১৯৯৩ঃ ৩০-৪৯)। তবে গ্রাম সংক্রান্ত যেসব গবেষণা হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় যে বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করার অনুপাতে একটি গ্রামের সঙ্গে আর একটি গ্রামের বেশ বড় পার্থক্য দেখা যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য ১৯৮৫, ওয়েস্টারগার্ড ১৯৮৬)।

'ন' গ্রামে ১৯৭০-এর গোড়া থেকে বেশীরভাগ বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়া জোতদারদের কাছে একটি সংকটময় কালের ইঙ্গিত আনে এবং উচ্ছেদের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটায়। ফলে বর্গাদারি কমে যায়। যদিও কিছু বর্গাদার জমিদারদের কাছে কিছু জমি ও অর্থ লাভ করেন ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কোনো বর্গাদারের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

'ন' গ্রামের বেশিরভাগ পুরানো বর্গাদাররা আশেপাশের জোতদারদের জমিচাষ করেছেন এবং তাঁরা গরিব। এই জোতদাররা বর্গাদারদের আগাম ধান ও টাকা কর্জ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এছাড়া জমিদার আর বর্গাদারদের মধ্যে মোটামুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় গ্রামসমাজে বারবার সংস্পর্শে আসার কারণে। এটাও বলা যায় যে 'ন' গ্রামে আর্থিক নির্ভরতা ও সামাজিক সম্পর্কের ফলে বর্গাদাররা জোতদারদের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করাতে পারেনি।[৮]

এখানে আমাদের জমি সংস্কারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কথা ভাবতে হবে। যে ৩২৭টি ঘর নিরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে ২০ জন লোক শুধু (অধিকার পাওয়া জমির বণ্টন) জমি বিতরণ ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে শুধু পাঁচজন বামফ্রন্ট সরকারের নিকট সাহায্য পেয়েছেন।

চাষের জমির ক্ষেত্রে বণ্টন করা জমির গড়পড়তা পরিমাপ ছিল ব্যক্তিপিছু ০.২০ একর বামফ্রন্ট সরকারের গঠনের আগে, আর ০.০৯ একর বামফ্রন্ট সরকারের গঠনের পরে। যেহেতু 'ন' গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা খুব বেশী, সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং বিতরিত জমির পরিমাপ খুবই কম।

৪. বোরোচাষের প্রসারণ ও জমি ইজারার ধারায় পরিবর্তন

যদিও জমি সংস্কারের নানান আইন প্রবর্তন করা হয় বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার জন্যে ও জমি বণ্টনের জন্যে, সেগুলি 'ন' গ্রামে বিশেষ সফল হয়নি, এখানে সেচের জমির প্রসারণের ফলে কৃষির বিকাশ ঘটেছে। উনিশশো আশির দশকের গোড়া থেকে হুগলি নদীর উপর দিকে বাঁধ দ্বারা জল নিয়ন্ত্রণের ফলে 'খ' জিপিতে মিঠে জল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে শুখার সময়ে। এছাড়া ১৯৮৪-তে 'খ' জিপিতে প্রধান খাল নতুন করে তৈরি করে একটি জলকপাট বসানো হয়। পঞ্চায়েত ছোট ছোট খাল গ্রামের মধ্যে তৈরি করে বা মেরামত করে।

এইভাবে সেচের জমির প্রসারণ হয়, আর যেমন পশ্চিমবাংলার বহু জায়গায় হয়েছে, তার থেকে বোরোচাষের প্রসারণ ঘটে 'খ' জিপিতে ১৯৮০-র মাঝামাঝি থেকে। ১৯৮১-তে 'খ' জিপিতে সেচের জমির (যার সবটাতেই পুকুর থেকে জল নিয়ে সেচন করা হত) পরিমাণ ছিল সমগ্র আবাদি জমির শতকরা ৬.৯ ভাগ। কিন্তু ১৯৯৪-তে বোরোচাষের সমগ্র জমির পরিমাপ হয় ১৫৭.৩৫ একর যা আমন ধানের আবাদের সমগ্র জমির (২০১.৪৩ একর) শতকরা ৭৮.১ ভাগ। 'ন' গ্রামে টিউবওয়েলের সাহায্যে সেচ করা কোনো জমি নেই।

বোরোচাষের ফলে গ্রামে জমি ইজারা নেওয়ার পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ওপরে যেমন বলা হয়েছে, বর্গাদারদের উচ্ছেদের ফলে আমন ধানের আবাদে বর্গাদারি ব্যবস্থা হ্রাস পেয়েছে, তৎসত্ত্বেও গ্রামবাসীরা বোরো আবাদের জন্যে জমি ইজারা নিতে শুরু করেছেন।

১৯৯৪-তে দেখা গিয়েছে যে গ্রামের পরিবারবর্গ আমন ধানের চাষ যে জমিতে করেছেন তার ৯৫ শতাংশই নিজেদের জমি। শুধুমাত্র ৫ শতাংশ ইজারা নেওয়া হয়েছে। অথচ বোরোচাষ যে জমিতে করা হয়েছে তার ৪৫.৬ শতাংশ জমি ইজারা নেওয়া। ১৯৯৪-তে ইজারাদাররা (এদের মধ্যে যাঁরা একত্রে ইজারাদার এবং জোতদার তাঁদেরও নেওয়া হয়েছে) সমগ্র কৃষক পরিবারবর্গের ৯.৪ শতাংশ নিযুক্ত করেন আমনচাষের ক্ষেত্রে। কিন্তু বোরো চাষিদের ক্ষেত্রে সেই বছরে ইজারাদাররা ৫৮.৪ শতাংশে পৌঁছয়।

'ন' গ্রামে দুরকমের ইজারার চুক্তি আছে। একের সঙ্গে অপরটির পার্থক্য বোঝা যায় পারিশ্রমিক প্রদানের ধরনে। একটি হল শস্য ভাগের চুক্তি, অপরটি বাঁধা ভাড়ার চুক্তি। আজকাল দ্বিতীয়টি বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। বাঁধা ভাড়ায় চুক্তির টাকা নগদে দেওয়া হয় এবং সেই টাকাকে খাজনা বলা হয়।[৯] শস্য ভাগ এবং খাজনা দুই ক্ষেত্রেই চুক্তির স্থায়িত্ব একটি ফলনকাল, বিশেষত বোরো ধানের ক্ষেত্রে।

সারণি ঃ ২ এবং ৩-এ ১৯৯৪-তে ধান আবাদি জমির আয়তন ও ধান আবাদে নিযুক্ত পরিবারবর্গের সংখ্যা দেখাচ্ছে জোতদারদের বিভিন্ন শ্রেণী এবং জমির প্রকারভেদের সাহায্যে। আমন আবাদের ক্ষেত্রে, যেখানে জমি খুব কম ইজারা নেওয়া হয়েছে, সমগ্র আবাদি জমির ৬০ শতাংশ মাঝারি এবং বড় জোঁতদারদের হাতে। ভূমিহীন এবং কম জমির মালিকরা (০.৫০ একরের নীচে) সমগ্র জমির শুধুমাত্র ১৭ শতাংশের ওপর কাজ করেন। অন্যদিকে বোরো ফসলের ক্ষেত্রে যেখানে জমি সাধারণত পাট্টা নেওয়া হয়,

ভূমিহীন এবং কম জমির মালিক (০.৫০ একরের নীচে) পরিবারবর্গ সমগ্র আবাদি জমির অর্ধেকের উপর কাজ করেন (সারণি ঃ ২)। ৬২টি ভূমিহীন পরিবার যা সমগ্র ভূমিহীন পরিবারবর্গের ৪২.২ শতাংশ এবং ৪৭টি ছোট জোতদার (০.৫০ একরের নীচে), সমগ্র ছোট জোতদারের সংখ্যার ৪৭ শতাংশ, জমি ইজারার বাজারে প্রবেশ করে বোরো আবাদ করে (সারণি ঃ ১ এবং ৩)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমি ইজারা নেওয়া হয়েছে মাঝারি এবং বড় জমিদারদের থেকে। নতুন প্রযুক্তির বেশি বাজারদর সত্ত্বেও বোরোচাষ প্রধানত ভূমিহীন কৃষক আর কম জমির মালিকদের হাতে। সুতরাং যদিও বোরোচাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবার পিছু জমি আমন আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় জমির চেয়ে কম, বোরোচাষের ক্ষেত্রেই আমরা ভূমিহীন পরিবারদের অংশগ্রহণের জন্য এবং ছোট জোতদারদের দখলি জমির প্রসারণের জন্যে ব্যবহারোপোযোগী জমির সমবণ্টন দেখতে পাই।

সারণি ঃ ২ জমির স্বত্ব অনুযায়ী পরিদর্শিত পরিবারবর্গের মধ্যে ধান আবাদি জমির বণ্টন (১৯৯৪)

জমির স্বত্ব (একর)	নিজের জমি	ইজারা নেওয়া জমি		সমগ্র
		খাজনা	শস্যভাগ	
আমন				
০	০	৫.০৬	২.৬৫	৭.৭১ (৩.৮%)
০.০১ - ০.৫০	২৫.২১	১.৩৮	০	২৬.৫৯ (১৩.২%)
০.৫১ - ১.০০	২৭.৮৫	১.০৪	০	২৮.৮৯ (১৪.৩%)
১.০১ - ২.৫০	৪০.২৪	০	০	৪০.২৪ (২০.০%)
২.৫১ - ৫.০০	৪১.৪০	০	০	৪১.৪০ (২০.৬%)
৫.০১ ১০.০০	১৩.৮০	০	০	১৩.৮০ (৬.৯%)
১০.০১ -	৪২.৮০	০	০	৪২.৮০ (২১.২%)
সমগ্র	১৯১.৩০	৭.৪৮	২.৬৫	২০১.৪৩ (১০০%)
(%)	(৯৫.০)	(৩.৭)	(১.৩)	
বোরো				
০	০	২৪.৯৪	১৩.০৭	৩৮.০১ (২৪.২%)
০.০১ - ০.৫০	১৯.৬৩	১৪.৯৬	৮.৮০	৪৩.৩৯ (২৭.৬%)
০.৫১ - ১.০০	১৭.৭০	৫.২৯	১.৭০	২৪.৬৯ (১৫.৭%)
১.০১ - ২.৫০	১৯.২৫	২.৯৯	০	২২.২৪ (১৪.১%)
২.৫১ - ৫.০০	১৬.৭৯	০	০	১৬.৭৯ (১০.৭%)
৫.০১ -১০.০০	৪.৬০	০	০	৪.৬০ (২.৯%)
১০.০১ -	৭.৬৩	০	০	৭.৬৩ (৪.৮%)
সমগ্র	৮৫.৬০	৪৮.১৮	২৩.৫৭	১৫৭.৩৫ (১০০%)
(%)	(৫৪.৪)	(৩০.৬)	(১৫.০)	

'ন' গ্রামে বোরোচাষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গরিব চাষিরা জমিতে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে এবং ব্যবহারোপোযোগী জমির দখল শুধুমাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ক্ষুদ্র জোতদার আর ভূমিহীন পরিবাররা কী করে জমিতে চাষের অধিকার পাচ্ছে আর বোরো ধানের চাষ করতে পারছে যার জন্যে দরকার নতুন

প্রযুক্তি? এটা বলা যেতে পারত যে গরিব চাষিরা সহজেই বোরোচাষ করতে পারছে জমির ইজারা নিয়ে কারণ জমির মালিকরা তাঁদের সঙ্গে চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ ভাগ করে দিতেন। জমিদার আর বর্গাদারদের মধ্যে খরচের ভাগাভাগির ব্যবস্থা দেখা গেছে পশ্চিমবাংলায় (রুদ্র ১৯৭৫বি; রুদ্র এবং বর্ধন ১৯৮৩ ঃ ৩৬ - ৪৩)। কিন্তু সম্প্রতি একটি গবেষণা প্রমাণ করেছে যে খরচের ভাগাভাগি বোরোচাষের ক্ষেত্রে সাধারণত হয় না (খাসনবিশ ১৯৯৪ ঃ এ ১৯৪)। 'ন' গ্রামে বোরোচাষি আর জমিদারদের মধ্যে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচের ভাগাভাগির কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি।

এরপরের পর্বে নতুন প্রযুক্তির অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিচার করে দেখব ভূমি এবং বোরোচাষের জন্যে নতুন প্রযুক্তি কী ধরনের পরিস্থিতিতে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র জোতদারদের হাতে এসেছিল।

সারণি ঃ ৩ জমির স্বত্ব ও জমির প্রকারভেদ অনুযায়ী ধানচাষে নিযুক্ত পরিবারের বিতরণ (১৯৯৪)

জমির স্বত্ব (একর)	নিজের জমি	খাজনা	শস্যভাগ	নিজের জমি +খাজনা	নিজেব জমি +শস্যভাগ	নিজের +খাজনা +শস্যভাগ	খাজনা +শস্যভাগ	সমগ্র
আমন								
০	০	৯	২	০	০	০	০	১১ (৬ ১%)
০.০১ - ০.৫০	৮৯	১	০	৩	০	০	০	৯৩ (৫১ ৪%)
০.৫১ ১ ০০	৩৪	০	০	২	০	০	০	৩৬ (১৯ ৯%)
১.০১ - ২ ৫০	২২	০	০	০	০	০	০	২২ (১২ ২%)
২.৫১ - ৫ ০০	১৪	০	০	০	০	০	০	১৪ (৭.৭%)
৫.০১ ১০ ০০	২	০	০	০	০	০	০	২ (১.১%)
১০ ০১ -	৩	০	০	০	০	০	০	৩ (১ ৭%)
মোট	১৬৪	১০	২	৫	০	০	০	১৮১ (১০০%)
বোরো								
০	০	৩৮	২২	০	০	০	২	১১ (৬.১%)
০.০১ - ০.৫০	৩৬	৭	৬	২২	১১	১	০	৮৩ (৩৯.৭%)
০.৫১ - ১.০০	২৩	১	০	৫	৪	০	০	৩৩ (১৫.৮%)
১.০১ - ২.৫০	১৪	১	০	২	০	০	০	১৭ (৮.১%)
২.৫১ - ৫.০০	১২	০	০	০	০	০	০	১২ (৫.৮%)
৫.০১ -১০.০০	১	০	০	০	০	০	০	১ (০.৫%)
১০.০১ -	৩১	০	০	০	০	০	০	১ (০.৫%)
মোট	৮৭	৪৭	২৮	২৯	১৫	১	২	২০ (১০০%)

৫. প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি

৫.১ বোরোচাষের জন্য প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি

এটা সবাই জানে যে, অন্য শস্য যেমন গমচাষের অপেক্ষায় ধানচাষের জন্য বেশি কৃষকের দরকার। সুতরাং কৃষিশ্রমিকের নিযুক্তি ধানচাষের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি। ভারতবর্ষে এটা দেখা যায় যে যেসব রাজ্যে প্রথাগতভাবে ধানচাষ করা হয় সেখানে কৃষিজীবীদের

নিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় (ভাল্লা ১৯৮৭ ঃ ৫৪৩ - ৫৪৪)। ধানচাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে এই ঘটনাটি যুক্ত হওয়া সম্ভব। সাধারণত বলা হয় যে এশিয়ায় জলনির্ভর ধানের চাষের (technological improvement) বিভাজিত। জমির উৎপাদনশীলতা শ্রমিক-নির্ভর। উৎপাদনশীলতা বেড়েছে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে, দখলি জমির প্রসারণের জন্যে নয় (ব্রে ১৯৮৩)। সমসাময়িক পশ্চিমবাংলায় এবং 'ন' গ্রামে যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব একটা বাড়েনি। আর নতুন প্রযুক্তির উপাদান যেমন উৎপাদনবৃদ্ধিকারী বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং জল বিভাজিত এবং বিচার-নিরপেক্ষ (divisible and scale-neutral)। এই অর্থে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তনের এইসব বৈশিষ্ট্য গরীব এবং ছোট কৃষিজীবীদের বাদ দেয় না।[১০] অবশ্য জমিসেচের জন্যে যদি ব্যক্তিগত টিউবওয়েলের ব্যবহার করা হলে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হতো।

পশ্চিমবাংলার দুটি গ্রামে জমি ইজারার জরিপ থেকে দেখা যায় যে, একটি গ্রামে যেখানে সরকারি খালদ্বারা জমি সেচ করা হতো, ছোট কৃষকরা বড় জমিদারদের থেকে জমি ইজারা নিতেন। এর বিপরীতে অন্য গ্রামটিতে যেখানে জমি সেচের জন্যে ব্যক্তিগত টিউবওয়েল ব্যবহার করা হতো, বিত্তবান কৃষকরা, যাঁরা টিউবওয়েলের মালিক, তাঁরা ক্ষুদ্র কৃষকদের থেকে জমি ইজারা নিতেন (ঘোষ ১৯৮১)।

যদিও পশ্চিমবাংলায় ব্যক্তিগত টিউবওয়েলের সংখ্যা বেড়েছে, টিউবওয়েলের মলিকানা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। টিউবওয়েলের মালিকরা কখনো কখনো তাঁদের সম্পদ যতদূর সম্ভব বাড়ানোর জন্যে টিউবওয়েলের আশেপাশের সব জমি ইজারা নেন। তার ফলে ধনী কৃষকদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।[১১]

অন্যদিকে গ্রামবাসীরা আরো সহজে সরকারি খালের জল ব্যবহার করতে পারে যদি খাল সংশ্রয়ের বিস্তার হয়। 'ন' গ্রামের কৃষকরা সাধারণত খাল থেকে জল নেয় ডিজেলের সাহায্যে।[১২] ডিজেল পাম্পের মালিকের সংখ্যা সীমিত। তাই বেশিরভাগ কৃষকেরা পাম্প ভাড়া করে। তাসত্ত্বেও গরিব কৃষকরা পাম্প জোগাড় করতে পারে কারণ ডিজেল কিংবা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন সমেত টিউবওয়েল বসানোর চেয়ে পাম্প কেনা কম খরচের। 'ন' গ্রামে ১৯৯৪ সালে ৩২ জন গ্রামবাসী ব্যক্তিগতভাবে অথবা যৌথভাবে পাম্পের মালিকানা ভোগ করতেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ক্ষুদ্র জোতদার এবং দুজন ভূমিহীন কৃষক। পাম্প ভাড়ার খরচ সম্ভবত ব্যক্তিগত টিউবওয়েলের ব্যবহারের মাশুলের চেয়ে কম।[১৩] এছাড়া যেহেতু পাম্পকে সরানো যায় তাই পরিস্থিতি অনুকূল হলে, কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনমত এগুলিকে যে কোনো জায়গায় বসাতে পারেন। সুতরাং যেহেতু বহুসংখ্যক কৃষকরা পাম্প ব্যবহার করতে পারেন, পাম্প মালিক ধনী কৃষকদের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা কম। এছাড়া যদি কৃষকরা পাম্প ভাড়া করতে নাও পারেন, তাঁরা বালতির সাহায্যে জল নিতে পারেন, যদিও এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় এবং শ্রমের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তির দিক থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি যে গরীব কৃষকরা খালের জল আরো সহজে ব্যবহার করতে পারেন এবং সরকারি খাল দ্বারা সেচ ব্যবহারের জমি কেন্দ্রীভূত হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫.২ গরিব কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি

প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি ছাড়াও ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র জোতদার পরিবারের জমি ইজারা নেওয়ার একটা বড় কারণ গরিব কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। কৃষিশ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ফলে এবং কৃষিকার্য ছাড়া অন্য চাকুরির সম্ভাবনার বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ১৯৮০-র শুরু থেকে পশ্চিমবাংলায় কৃষিশ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৪] সমীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রামবাসীদের বিবরণ অনুযায়ী 'ন' গ্রামে ১৯৭০-এর মাঝামাঝি পুরুষ কৃষিজীবীদের দিন-মজুরি ছিল চার টাকা যার সমমূল্য ১.৫-২.০ কিলোগ্রাম চাল। কিন্তু ১৯৯৫-তে এই মজুরি হয় ৩২ টাকা, ৪.৫ কিলোগ্রাম চালের সমমূল্য।[১৫]

উৎপাদনবৃদ্ধিকারী বীজের প্রবর্তন আর দুবার ফলনকারী ধান কৃষির সময়সূচিকে এত সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে যে আরো সংহত এবং সময়োপযোগী শ্রমের ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটেছে। শ্রমের বাজারও আরো ঠাসা হয়েছে। যার ফলে কৃষিশ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৯৯৪-তে শুধু ৫৪টি পরিবার পানের চাষ করত, পানের চাষের বিস্তার কৃষিতে কর্মপ্রাপ্তির—চাকুরি অথবা স্বনিয়োজন—সুযোগ বাড়াতে সাহায্য করেছে।

এছাড়াও কৃষি ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রে কর্মের সম্ভাবনা বৃদ্ধি শ্রমের বাজারকে আরো দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। সারণি ঃ ৪-এ ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এর মধ্যে গ্রামীণ কর্মীদের কর্মবণ্টনের পরিবর্তনশীল ধারা দেখানো হয়েছে। এই সারণি থেকে দেখা যায় যে যেমন একদিকে সমগ্র প্রধান কর্মীদের মধ্যে কৃষক এবং কৃষিমজুরদের শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলায় অন্যান্য কর্মীদের শতকরা হারের বৃদ্ধি ঘটেছে। এই প্রবণতা 'খ' জিপিতে খুব বলিষ্ঠ আর এটা শুধুমাত্র পরিবর্তন নয়। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মীদের সংখ্যার বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে কর্মীদের শতকরা হারের বৃদ্ধি ঘটেছে বিশেষ করে 'খ' জিপিতে।

যা আমাদের বেশী আগ্রহান্বিত করে, সমগ্র মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মহিলা কৃষিজীবী ও কৃষিমজুরের শতকরা হার মহিলা কর্মীদের মধ্যেও বৃদ্ধি পেয়েছে 'খ' জিপি অঞ্চলে। পুরুষ কর্মীদের কৃষি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে কর্মপ্রাপ্তির বৃদ্ধির ফলে এবং দোফসলা (double cropping) জমির বিস্তারের ফলে কৃষিতে মহিলাকর্মীদের প্রয়োজন বেড়ে গেছে।

'ন' গ্রামে ৪৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ (২৮০) কৃষি ব্যতীত অন্য কর্মে নিযুক্ত ছিলেন ১৯৯৪-এ। তাঁদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ (২৩৪) ভূমিহীন এবং ছোট জোতদার পরিবার থেকে এসেছেন।

১৯৮০-র গোড়া থেকে খুব বেশি মাত্রায় বেড়ে গেছে রিক্সা চালকের সংখ্যা।[১৬] দেখা যায় ২২ শতাংশ পুরুষ অকৃষিজীবী কর্মীরা এই পেশা অবলম্বন করেছেন ১৯৯৪-এ। ১৯৮০-র দশকে রাস্তা তৈরি আর মেরামতির জন্যে রিক্সার প্রয়োজন বেড়ে গেছে। গ্রামবাসীদের বিবরণ অনুযায়ী আশির দশকের আগে রিক্সার সংখ্যা খুবই কম ছিল। কারণ বর্ষার সময়ে গ্রামের কাদামাখা কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালানো অসম্ভব ছিল। গ্রামে হাটবাজারের বিস্তারের ফলে ছোট দোকানদারদের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে হলদিয়া নামক নতুন একটি শিল্পাঞ্চলের বিকাশও কারখানায় শ্রমিক ও মিস্ত্রির সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

সারণি ঃ ৪ প্রধান গ্রামীণ কর্মীদের বন্টনের (distribution) পরিবর্তনশীল ধারা মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুর জেলার 'খ' জিপি অঞ্চল।

		কৃষক	কৃষি মজুর	অন্যান্য	সমগ জনসংখ্যার অনুপাতে সমগ্র কর্মী
			মেদিনীপুর জেলা		
১৯৮১	পুরুষ	৫০.০%	২৮.৮%	২১.২%	৪৮.৮%
	মহিলা	২১.০%	৬১.২%	১৭.৮%	১০.৫%
	সমগ্র	৪৬.৪%	৩২.৮%	২০.৮%	৩০.১%
১৯৯১	পুরুষ	৪৮.৯%	২২.৯%	২৮.২%	৫২.৪%
	মহিলা	২৭.৩%	৪৮.৪%	২৪.৩%	১৮.৫%
	সমগ্র	৪৫.৫%	২৬.৯%	২৭.৬%	৩৫.৯%
			খ জিপি		
১৯৮১	পুরুষ	৩২.২%	৩৭.২%	৩০.৬%	৪৭.৫%
	মহিলা	২০.২%	১১.৫%	৬৮.৩%	২.৬%
	সমগ্র	৩১.৯%	৩৬.৪%	৩১.৭%	২৫.৭%
১৯৯১	পুরুষ	২৪.৭%	৩০.১%	৪৫.২%	৫২.৬%
	মহিলা	২৮.২%	৩০.৭%	৪১.২%	২২.৪%
	সমগ্র	২৪.৯%	৩০.১%	৪৫.০%	৩৮.০%

মূল ঃ *ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক, মেদিনীপুর,* ১৯৮১ এবং ১৯৯১।
[দ্রষ্টব্য ঃ কর্মী অর্থে মূল কর্মী এবং প্রান্তীয় কর্মী]

কৃষিতে বহুসংখ্যক শ্রমিকের নিয়োগ এবং কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধির ফলে শ্রমের বাজার আরো মজবুত হয়। এর ফলে গরিব লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় আর্থিক অবস্থার উন্নতি বাস্তবে কতদুর হয়েছে। 'ন' গ্রামের শ্রমের বাজারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক।

যদিও কৃষিমজুরদের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়েছে, তবুও শুধু এই মজুরির সাহায্যে জীবননির্বাহ করা এই সব পরিবারের পক্ষে কঠিন। আমনচাষে যত শ্রম লাগে বোরো-চাষে তার দেড়গুণ অথবা দ্বিগুণ বেশি শ্রম লাগে। কিন্তু 'ন' গ্রামে গড় হিসাবে ভাড়া করা মজুরের সংখ্যা আমনচাষের (একর প্রতি ২০.৭ মজুর-দিন) তুলনায় বোরোচাষে (একর প্রতি ২৭.৪ মজুর-দিন) এমন কিছু খুব বেশী নয়। এর কারণ বোরোচাষের সময় জমি ইজারা নেওয়ার ফলে ব্যবহারের জমির গড়পড়তা পরিমাণ কম হয়ে যায়।[১৭]

কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশায় কর্মের সম্ভাবনা বৃদ্ধির ফলে একই ক্ষেত্রে কর্মরত গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এর প্রধান কারণ জীবিকার নির্বাচন সুচিন্তিত নয়। তার ফলে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে আয়ের স্থিরতার অভাব দেখা দিয়েছে। রিক্সাচালকরা অভিযোগ করেন যে রিক্সাচালকদের সংখ্যা খুব বেশি। পরিদর্শনের সময় লেখক দেখেছেন যে কিছু দোকান গ্রামে খোলা হয়েছে আবার উঠে গেছে। সুতরাং যদিও কর্মের সুযোগ বেড়ে গেছে গরিব লোকেদের আয় সুস্থিত নয়। সেইজন্যেই কৃষি এবং কৃষি ব্যতীত অন্য কার্যে চাকুরির সুযোগ বাড়া সত্ত্বেও বোরোচাষের জন্য জমির চাহিদা কমে যায়নি। বড় এবং মাঝারি জোতদাররা বোরোচাষের জন্য জমি ইজারা দিয়ে

একটি সুস্থিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এটা না হলে তাঁদের বেশ বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে বোরোচাষ করতে হত, যার জন্যে প্রয়োজন হত প্রচুর অর্থ বিনিয়োগের এবং বহু শ্রমিকের। কৃষির শ্রমের বাজারে উপস্থিত পরিস্থিতিতে, যখন কৃষিশ্রমিকদের বেতন বেড়ে গেছে এটা খুবই বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া।

৫.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন

এটা বলা যেতে পারে যে বামফ্রন্ট গভর্নমেন্টের কর্মসূচি, যা গরিবদের সাহায্য করেছে তার ফলে গরিব লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। জমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনর্জীবিতকরণ বা সঞ্জীবন বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচির একটি প্রধান অঙ্গ। ১৯৭৮ থেকে পঞ্চায়েতের নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হচ্ছে। আঞ্চলিক রাজনীতিতে ধনী গ্রামবাসীদের বা প্রভাবশালী গ্রামবাসীদের আধিপত্য অনেক কমে গেছে। গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও গরিবদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। গ্রামের লোকেদের আঞ্চলিক রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়েছে এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের সচেতনতা বেড়েছে। পঞ্চায়েতের সাহায্যে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ার ফলে তাঁদের চুক্তি করার ক্ষমতা বেড়েছে।[১৮]

'ন' গ্রামে যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে গরিবদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে পঞ্চায়েত এমন একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন যেখানে গরিবরা তাঁদের অধিকার খোলাখুলিভাবে দাবি করতে পারেন (মোরি ১৯৯৭)।

কৃষকসভা নামক কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নিয়ন্ত্রণে একটি কৃষক সমিতির নেতৃত্বে কৃষিমজুরির ব্যাপারে যৌথ দর কষাকষি চলেছে এবং হরতালও সংগঠিত হয়েছে। মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনব্যবস্থায় কৃষিমজুরদের সংঘবদ্ধ কার্য অথবা এরকম কার্যকর সম্ভাবনা বড় জোতদারদের ওপর চাপ এনেছে যাতে তাঁরা কৃষিমজুরদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারেন। কৃষিমজুরদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে শুধু উপরে আলোচিত অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া রাজনৈতিক কারণকেও প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

গরিবদের অনুকূল রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি বোরোচাষে শস্যভাগ অথবা খাজনা চুক্তির ব্যাপারে আইন মেনে চলায় সাহায্য করছে। ১৯৭২-এর আইন সংশোধনের পরও প্রথাগত আধাআধি শস্যভাগ 'ন' গ্রামে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন বোরোচাষের বর্গাদারি ব্যবস্থায় আইন নির্ধারিত শস্যের ভাগ হচ্ছে। ১৯৯৪-এ শুধু কয়েকটি দৃষ্টান্তই পাওয়া গেছে যেখানে শস্যভাগে আইন নির্ধারিত পরিমাণ মেনে চলা হয়নি। ১৯৯৪-এর খাজনা চুক্তির ঘটনায় আমরা দেখেছি যে ভাড়া আইন নির্ধারিত মানদণ্ড থেকে চ্যুত হয়নি। ১৯৯৪-এ খাজনা সাধারণত বিঘা (০.৪৩ একর) প্রতি ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা ছিলো। এক বিঘা জমি থেকে যত ধান ও খড় উৎপাদিত হতে পারে তার মূল্যের ২২ থেকে ২৯ শতাংশ ভাগের সঙ্গে উপরিউক্ত টাকার অঙ্কটি সমান।[১৯]

সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বোরোচাষের জন্য জমি ইজারা নেওয়া — শস্যভাগ অথবা খাজনাচুক্তি যেভাবেই হোক — প্রথাগত বর্গাদারি ব্যবস্থার চেয়ে বেশি লাভজনক যদি ইজারাদার ঠিকমত চাষ করে। এটা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে শস্যভাগের ব্যাপারে আইন তাঁদের পক্ষে হওয়াতে গরিব চাষি জমি ইজারা নিতে উৎসাহিত বোধ করেছে।

সারণি ঃ ৫ বোরোচাষের আয় এবং খরচ (১৯৯৪)
(টাকা/বিঘা)

পাম্প ভাড়া[১]	ভূমি কর্ষণের মেশিন ভাড়া[২]	সার / কীটনাশক ঔষধ	জমির খাজনা	ভাড়া করা শ্রমিক[৩]	মোট খরচ	পুরা আয়[৪]	অবশিষ্ট আয়[৫]
৪০০	১২০	৭০০	৮০০	২৮০	২৩০০	৩১৩০	৮৩০

তথ্য উৎস ঃ গ্রাম নিরীক্ষা

দ্রষ্টব্য ঃ (১) পাম্প ভাড়া ২০ টাকা ঘণ্টা।
(২) ভূমি কর্ষণের মেশিন ভাড়া ঘণ্টায় ৬০ টাকা।
(৩) ক্ষেতমজুরের মজুরি, দিন প্রতি ২৮ টাকা।
(৪) পুরা আয় ধানের মূল্যের হিসাব অনুযায়ী (৬০ কেজি প্রতি ২৩০ টাকা) এবং খড়।
(৫) অবশিষ্ট আয় = পুরা আয় - মোট খরচ

আমরা প্রযুক্তিগত, আর্থিক এবং রাজনৈতিক কারণ পরীক্ষা করে দেখেছি যা 'ন' গ্রামের গরিবদের বোরোচাষের জন্যে জমিতে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এবার আমরা আরো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখব কি পরিস্থিতিতে বোরোচাষ হত ইজারা নেওয়া জমির উপর। তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমরা নির্ভর করব ভূমিহীন পরিবার অথবা যাঁরা খুব কম জমির মালিক এমন পরিবারের ওপর।

৬. বোরোচাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

৬.১ বোরোচাষের আয় আর খরচ

১৯৯৪-তে ইজারা নেওয়া গড়পড়তা পরিমাণ খুব বেশি ছিল না ঃ ০.৬১ একর ভূমিহীন পরিবারের ক্ষেত্রে এবং ০.৫৪ একর ছোট জোতদারদের ক্ষেত্রে। সারণি ঃ ৫ দেখাচ্ছে ইজারা নেওয়া জমিতে বোরোচাষের বিঘা প্রতি খরচের এবং মোট আয়ের পরিমান। খরচের একটা মোটা অংশ যায় সার, কীটনাশক ওষুধ এবং জমি ইজারায়। অনেক গরিব চাষি সার এবং কীটনাশক গ্রামের দোকান থেকে ধারে পান।[২০] অন্যদিকে খাজনা সাধারণত অগ্রিম দেওয়া হয়ে থাকে। সেইজন্য গরিব পরিবার, যাঁদের খুব কম নগদ আয়, সাধারণত শষ্যভাগের চুক্তি পছন্দ করেন যাতে অগ্রিম খাজনা দিতে হয় না।

সারণি ঃ ৬-এ দেখা যাচ্ছে বোরোচাষের প্রক্রিয়া এবং কৃষি ছাড়া অন্য আয় অনুযায়ী পরিবারের বণ্টন। একদিকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষি ব্যতীত অন্য আয় কমার সঙ্গে সঙ্গে শস্যভাগের চুক্তি বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে কৃষি ছাড়া অন্য কার্যের আয় বাড়ার সঙ্গে খাজনার চুক্তির অংশ বাড়ছে। এটা বলা যায় যে, শস্যভাগ চুক্তির ফলে গরিব চাষিদের

পক্ষে জমি ইজারার বাজারে ঢোকা সহজ হয়েছে; যেসব পরিবারের কৃষি ব্যতীত অন্য আয় কম তাঁরাই বোরোচাষের জন্যে জমি ইজারা নিতে বেশি উৎসুক (সারণি ঃ ৬)।

সারণি ঃ ৬ চাষের জমির মালিকানা এবং কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কার্যের আয় অনুযায়ী ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র জোতদার বোরোচাষি পরিবারের বিতরণ

কৃষি ছাড়া অন্যান্য কর্মের আয় (মাসিক আয়)	ইজারা			চাষ না করা	নিজের জমি	সমগ্র
	খাজনা	শস্যভাগ	দুই প্রকার			
		ভূমিহীন পরিবার				
০ -৪০০	১০	১৬	১	২৬		৫৩
৪০১ -৮০০	১৯	৫	১	৪১		৬৬
৮০১ -	৯	১	০	১৭		২৭
সমগ্র	৩৮	২২	২	৮৪		১৪৬
		ক্ষুদ্র জোতদার পরিবার				
০ -৪০০	১৩	১৩	০	৬	২১	৫৩
৪০১ -৮০০	১২	৬	১	৯	১৮	৪৬
৮০১ -	১০	২	০	৯	২০	৪১
সমগ্র	৩৫	২১	১	২৪	৫৯	১৪০

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা

খরচের মধ্যে ভাড়া করা মজুরের পারিশ্রমিকে পার্থক্য দেখা যায় এক কৃষক থেকে আর এক কৃষকের মধ্যে। বোরোচাষে বেশি শ্রমিকের দরকার হয়, কিন্তু আগে যেমন বলা হয়েছে, বোরোচাষের সময় বেশি সংখ্যক মজুর ভাড়া করা হয় না। এই সূত্রে মনে করা যেতে পারে যে বোরোচাষের জন্যে জমি ইজারা নেওয়ার ফলে পরিবারের সদস্যদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যখন কৃষিমজুরদের বেতন বেড়ে যায়, তখন কৃষিকর্মীরা স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সদস্যদের শ্রমের ক্ষমতা যতদূর সম্ভব ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সারণি ঃ ৭ দেখাচ্ছে যে বোরোচাষের জন্যে পরিবারের সদস্যদের শ্রম যে খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তা বলা যায় না। ১৯৯৭-তে 'ন' গ্রামে যদিও দিনমজুরের সংখ্যা কৃষিকর্মরত সমগ্র শ্রমিকশক্তির অনুপাতে মাত্র ৩৫ শতাংশ, গ্রামের কিছু পরিবার বেশী মাত্রায় নির্ভর করছে ভাড়া করা দিন মজুরের ওপর (সারণি ঃ ৭)।

সারণি ঃ ৭ সমগ্র শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে ভাড়া করা মজুরের সংখ্যা অনুযায়ী বোরোচাষি পরিবারের বন্টন (১৯৯৭)

ভাড়া করা মজুরের সংখ্যার অনুপাত	০%	১-২০%	২১-৪০%	৪১-৬০%	৬১-৮০%	৮১-৯৯%	১০০%	সমগ্র
পরিবার সংখ্যা	৮	১৬	১৩	১০	৯	৩	২	৬১
শতকরা	(১৩.১)	(২৬.২)	(২১.৩)	(১৬.৪)	(১৪.৮)	(৪.৯)	(৩.৩)	(১০০)

উৎস ঃ গ্রাম নিরীক্ষা।

টিকা ঃ ভাড়া করা মজুরের অনুপাত হিসাব করা হয়েছে চারা লাগানো এবং ফসল কাটার সময়ে ভাড়া করা মজুরের সংখ্যার অনুপাত থেকে।

এটা বলা যেতে পারেনা যে ইজারা নেওয়া জমিতে বোরোচাষ খুব বেশি লাভজনক

(সারণি ঃ ৬)। কিন্তু যেহেতু গরিব লোকেদের আয়ের কোন স্থিরতা নেই, বোরোচাষের আয় তাঁদের কাছে আকর্ষণীয়। তাছাড়া গরিবদের পক্ষে খাদ্য সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং খুব কম সংখ্যক জমির ইজারাদারই চাষ করা বোরো ধান বিক্রি করেন।

৬.২ বোরোচাষের উৎপাদনশীলতা

ইজারা নেওয়া জমিতে যে বোরোচাষের উৎপাদনশীলতা কম নয় তা দেখা যাচ্ছে সারণি ঃ ৮ এবং সারণি ঃ ৯-এ বিভিন্ন পরিবারের উৎপাদনের পরিমাণ থেকে। এই সারণিগুলি থেকে অবশ্য ইজারা নেওয়া জমি আর মালিকানা স্বত্বের জমির উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য খুব ভাল করে বোঝা যায় না। কারণ যাঁরা জমি ইজারা নিয়েছেন তাঁদের চাষের জমির মধ্যে কিছু নিজস্ব জমিও রয়ে গেছে। তবে এই তথ্য থেকে আমরা একটা পার্থক্যের প্রবণতা দেখতে পাই দুই প্রকারের জমির উৎপাদনশীলতার মধ্যে। এটা বলা যেতে পারে যে, ইজারা নেওয়া জমির উৎপাদনশীলতা মালিকানার জমির চেয়ে বেশি (সারণি ঃ ৮)। ১৯৭০-এর দশকের সঙ্গে আমরা এখানে পার্থক্য দেখতে পাই কারণ ১৯৭০-এর দশকে মালিকের নিজস্ব জমির উৎপাদন বেশি ছিল বর্গাদার চাষ করা জমির চেয়ে (চট্টোপাধ্যায় ১৯৮২ ঃ ২৯)।

অবশ্য ছোট জোতদার পরিবার ভূমিহীন পরিবারের চেয়ে ইজারা নেওয়া জমিতে উৎপাদন বেশী করে (সারণি ঃ ৮)। তাছাড়া কৃষিকার্য ব্যতীত অন্য কর্মের আয় বাড়ার সঙ্গে ফসল উৎপাদনের হারও বেড়ে যাচ্ছে জমি ইজারা নেওয়া পরিবারদের জন্যে (সারণি ঃ ৯)।

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যেসব পরিবার জমি ইজারা নিয়েছেন তাঁরা সেই জমি খুব উৎসাহ সহকারে চাষ করেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভূমিহীন পরিবার অথবা যাঁদের কৃষি ব্যতীত অন্য কার্যের আয় কম তাঁরা জোতদার পরিবার অথবা কৃষি ছাড়া অন্য কার্যের থেকে যাঁদের আয় বেশি, তাঁদের চেয়ে বেশি ভাল চাষ করেন।[১১]

৬.৩ ইজারাদারদের ঋণ

বোরোচাষের ফলে ইজারাদার এবং জমির মালিকের সম্পর্কের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনেক কমে গেছে। পুরনো প্রথা অনুযায়ী বর্গাদার আর জোতদারের সম্পর্ক ছিল অধীনতা ও নির্ভরতার।

১৯৭০-এর গবেষণাকার্য থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে গরীব বর্গাদাররা প্রধানত জোতদারদের থেকে ঋণ নিতেন, যদিও জোতদাররাই একমাত্র মহাজন ছিলেন না এবং সব সময় খুব উঁচু হারে সুদও নিতেন না (রুদ্র ১৯৭৫এ; খাসনবিস ও চক্রবর্তী ১৯৮২; রুদ্র ও বর্ধন ১৯৮৩ ঃ ৪৫)। মনে হয় যেসব জায়গায় কৃষির যথেষ্ট বিকাশ হয়নি, সেই-সব জায়গায় ১৯৮০-র দশকেও জমি ইজারার চুক্তি এবং ঋণ ব্যবস্থার মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযুক্তি দেখা যায় (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৬ ঃ ২৪-৪৪; ঘোষ ১৯৯৬)। তবে কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থা হ্রাস পাবে আশা করা যায়।

১৯৯৪-এ ৯৫টি ইজারাদার পরিবারের (ভূমিহীন কিংবা খুবই ক্ষুদ্র জোতদার যাঁদের জমি ০.৫০ একরের নীচে) থেকে সংগ্রহ করা ঋণ সম্বন্ধীয় তথ্য থেকে দেখা যায় যে কেবলমাত্র ৬টি ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের জমির মালিকের থেকে (উৎপাদনের জন্য ঋণ অথবা ব্যবহার বা উপভোগের জন্য ঋণ) ধার নিয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় প্রধানত ইজারাদাররা নিজেদের আত্মীয়স্বজন কিংবা তাঁদের জমির মালিক ছাড়া অন্য গ্রামবাসীদের নিকট ধার নিয়েছেন। ৩৯টি এইরকম ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯৯৭ সালে বোরোচাষের সময় উৎপাদনের ঋণের ক্ষেত্রে আমরা একই ছবি দেখতে পাই। সারণি ঃ ১০-এ দেখা যাচ্ছে যে ৬১ জন ইজারাদারের (যাঁরা ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র জোতদার পরিবার থেকে এসেছেন) মধ্যে শুধু দুজন ইজারাদার ধার নিয়েছেন নিজেদের জমির মালিকের কাছে। অন্যদিকে ২৪টি পরিবার যে সংখ্যাটি মোট নমুনার পরিবারের অর্ধেক, কোনো ধারই নেননি বোরোচাষের জন্য। এবং ২১টি পরিবার, যা মোট নমুনার পরিবারের এক তৃতীয়াংশ, ধার নিয়েছেন নিজেদের আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য গ্রামবাসীদের থেকে। জমি ইজারার চুক্তি এবং ঋণের মধ্যে পারস্পরিক সংযুক্তির ও ইজারাদার এবং জমি মালিকের সম্পর্কের এই বৈশিষ্ট্যের যে-ধারণা লোকের মধ্যে আসছে তা ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে সংগৃহীত তথ্য।

সারণি ঃ ৮ চাষের জমির মালিকানা অনুযায়ী বোরোচাষের উৎপাদনশীলতার তফাৎ (১৯৯৪)

ফসল উৎপাদনের হার (কিলোগ্রাম / একর)	ভূমিহীন ইজারাদারদের পরিবার	ক্ষুদ্র জোতদার	
		ইজারাদার পরিবার	যেসব পরিবার ইজারা নেননি
	১৪২২	১৫২৪	১৪০৮

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা।

সারণি ঃ ৯ কৃষি ব্যতীত অন্য আয় অনুযায়ী বোরো চাষের উৎপাদনশীলতার তফাৎ (১৯৯৪) (কিলোগ্রাম / একর)

কৃষি ব্যতীত অন্য আয় (টাকা / মাস)	- ৪০০	৪০১ - ৮০০	৮০১ -
ইজারাদার পরিবার	১৪৪৭	১৪৭৬	১৫১৭
যেসব পরিবার ইজারা নেননি	১৫০৯	১২৩৯	১৪৭৯

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা।

তবে এটাও দ্রষ্টব্য যে বোরোচাষের জন্য সাধারণত কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (যেমন ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং দাতব্য/পরহিতকর প্রতিষ্ঠান) থেকে ধার নেওয়া সাধারণত হয় না। ভূমিহীন পরিবার, বিশেষ করে যাদের কৃষি ছাড়া অন্যকোনো কার্য থেকে আয় কম তাঁদের পক্ষে কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ধার নেওয়া আরো শক্ত কারণ তাঁরা ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিরূপে কোনো সম্পত্তি জামিন রাখতে পারেন না। সুতরাং যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁরাই এইসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে ক্ষুদ্র জোতদার পরিবার যাদের কৃষি ব্যতীত অন্য আয়

সামান্য তাঁরা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কারণ তাঁরা তাদের জমি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ প্রদান করতে পারেন (সারণি ঃ ১০)।

সারণি ঃ ১০ ইজারাদারদের (৬১ টি পরিবার) বোরো উৎপাদনের ঋণের উৎস (১৯৯৭)

ঋণের উৎস কৃষি ব্যতীত অন্য আয় (টাকা / মাস)	জমির মালিক	আত্মীয় অথবা গ্রামবাসী	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ধার যারা নেননি	সমগ্র
(ভূমিহীন)					
০ - ৪০০	১	৬	০	৬	১৩
৪০১ - ৮০০	০	৮	২	৭	১৭
৮০১ -	০	৩	১	৩	৭
(ক্ষুদ্র জোতদার)					
০ - ৪০০	১	৪	৫	৩	১৩
৪০১ - ৮০০	০	২	০	৪	৬
৮০১ -	০	১	১	৫	৭
সমগ্র	২	২৪	৯	২৮	৬৩

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা।

টিকা ঃ মানুষের মোটসংখ্যা গৃহের মোটসংখ্যার থেকে বেশি। কারণ কিছু ক্ষেত্রে গৃহ দুটি ভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে।

সারণি ঃ ১১ ইজারাদাতা - ইজারাদারের সম্পর্কের স্থায়িত্ব (১৯৯৭)

আগের বছরের ইজারাদাতা	খাজনা				শস্যভাগ			
কৃষি ছাড়া অন্য আয় (টাকা / মাস)	ইজারাহীন	অন্য	একই দুবছর থেকে বেশি	মোট	ইজারাহীন	অন্য	একই দুবছর থেকে বেশি	মোট
ভূমিহীন								
০ - ৪০০	১	৩	৪ (৪)	৮	০	১	৩ (৩)	৪
৪০১ - ৮০০	৫	৬	৩ (২)	১৪	০	৩	০ (০)	৩
৮০১ -	১	২	৩ (৩)	৬	০	০	১ (০)	১
ক্ষুদ্র জোতদার								
০ - ৪০০	০	৫	২ (১)	৭	০	০	৬ (৫)	৬
৪০১ - ৮০০	১	৩	২ (১)	৬	০	০	০ (০)	০
৮০১ -	১	৪	১ (১)	৬	০	১	০ (০)	১
মোট	৯	২৩	১৫ (১২)	৪৭	০	৫	১০ (৮)	১৫

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা।

৬.৪ জমির মালিক - ইজারাদারদের সম্পর্কের স্থায়িত্ব

যেমন আগে বলা হয়েছে, ইজারাদাতা সাধারণত তাদের জমি কেবল একটি মাত্র ফসল চাষের ঋতুর জন্যে লীজ দেন, যা বোরোচাষ। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ লোককেই,

ইজারাদারকে, একসঙ্গে অনেকদিন জমির পাট্টা দেন না। তার কারণ, যদি জমি একই ইজারাদার দ্বারা চাষ করানো হয় অনেক বছর ধরে তাহলে ইজারাদার বর্গাদার হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং যদিও অনেক ক্ষেত্রে ইজারাদারদের নাম নথিভুক্ত করার কোনো ইচ্ছেই নেই, কিন্তু গরিবদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন একটি সরকারের শাসনকালে ইজারাদাররা নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন যদি এই সম্ভাবনাকেই ইজারাদাতারা ভয় পান। তবে এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও কিছু কিছু ইজারাদার বোরোচাষের জন্যে জমি অনেকদিন ধরে একই মালিকের কাছ থেকে ইজারা নিতে সক্ষম হয়েছেন।

সারণি ঃ ১১-তে দেখা যাচ্ছে ৬২টি ক্ষেত্রে ইজারাদাতা-ইজারাদার সম্পর্কের স্থায়িত্ব। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ১৯৯৭-এ। এর আগের বছর ইজারাদারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা (৬২ জনের মধ্যে ৩৭ জন) অন্য ইজারাদাতাদের থেকে জমি ইজারা নিয়েছিলেন অথবা জমি ইজারা নেননি। এই তথ্য এই ইঙ্গিতই দেয় যে ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা অর্থাৎ ইজারাদারদের সম্পর্কের মধ্যে নমনীয়তা আছে। কিন্তু যে ইজারাদাররা একই ইজারাদাতা থেকে জমি ইজারা নিয়েছেন গত বছর, তাঁদের মধ্যে ২০ জন আছেন যাঁরা একই ইজারাদাতাদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়েছেন একটানা দুবছর থেকে বেশি বছর ধরে।

গ্রামবাসীদের ভাষায় এই সম্পর্ক যে কয়েক বছর ধরে চলছে তার কারণ ইজারাদারদের ব্যবহার ভালো অথবা দুই পক্ষই একে অপরকে বিশ্বাস করেন। যদি ইজারাদার ও ইজারাদাতার সম্পর্ক ভাল হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাস থাকে তবে ইজারাদাতা বাধ্য হয়ে উদার হতে হবে এবং ইজারাদারদের চুক্তি করার ক্ষমতা বাড়ে। শস্যভাগের চুক্তিতে এই ধরনের সম্পর্ক বেশি প্রয়োজন কারণ যদি ইজারাদাররা ভাল করে চাষ না করেন ইজারাদাতাদের লাভ হয় না। সেইজন্যে ইজারাদার ও ইজারাদাতার মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক শস্যভাগের চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন আগে আলোচিত হয়েছে শস্যভাগের চুক্তি বেশি দেখা যায় সেইসব ইজারাদারদের মধ্যে যাঁদের কৃষি ব্যতীত অন্য আয় খুব কম। (সারণি ঃ ৬ ও সারণি ঃ ১১ দ্রষ্টব্য) এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই ইজারাদাতাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখতে পেরেছেন।[২২]

৬.৫ জমি ইজারার বাজারের পরিবর্তনের ধারা

সারণি ঃ ১২ অনুযায়ী ১১৯টি পরিবারের (যাদের নমুনাস্বরূপে নেওয়া হয়েছে) ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭-এর ইজারাদারদের সংখ্যায় যেসব পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে আমরা দেখছি যে ইজারাদারদের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু এটাও দ্রষ্টব্য যে খাজনার চুক্তি বেড়েছে এবং শস্যভাগের চুক্তি কমেছে। এই প্রবণতা বেশি ভাল করে দেখা যাচ্ছে কৃষি ব্যতীত অন্য আয় যাদের কম তাঁদের মধ্যে। মোট সংখ্যায় বৃদ্ধির কারণ সেইসব ইজারাদারদের সংখ্যায় বৃদ্ধি যাঁদের কৃষি ব্যতীত অন্য আয় মাসিক ৪০০ টাকার চেয়ে বেশি।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭-এর মধ্যে খাজনা চুক্তিতে জমির ভাড়ার হার বেড়েছে। ১৯৯৭-এ খাজনা জমির ভাড়া বেড়ে হয়েছে বিঘা প্রতি ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। অর্থাৎ বিঘা প্রতি যত পাওয়া যেতে পারে সেই মূল্যের ২৬ থেকে ৩৫ শতাংশ।[২৩] ভাড়া বৃদ্ধির কারণ

বোরোচাষের জমির চাহিদা বৃদ্ধি।

শস্যভাগের চুক্তি হ্রাসের ফলে এবং খাজনার জমির ভাড়া বৃদ্ধির ফলে, যেসব পরিবারের আয় কম তাঁদের পক্ষে বোরোচাষের জন্য জমি ইজারা নেওয়া আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

সারণি ঃ ১২ ১৯৯৪-এ এবং ১৯৯৭-এর মধ্যে জমি ইজারার রীতিতে পরিবর্তন

কৃষি ছাড়া অন্য আয় (টাকা / মাস)	খাজনা	শস্যভাগ	উভয়	ইজারাহীন	মোট
			১৯৯৪		
ভূমিহীন					
০-৪০০	৫	৭	০	৯	২১
৪০১ - ৮০০	১০	১	১	১৪	২৬
৮০১ -	৬	০	০	৮	১৪
ক্ষুদ্র জোতদার					
০ - ৪০০	৩	১০	০	১২	২৫
৪০১ - ৮০০	৫	২	০	১১	১৮
৮০১ -	৩	১	০	১১	১৫
মোট	৩২	২১	১	৬৫	১১৯
(%)	(২৬.৯)	(১৭.৬)	(০.৮)	(৫৪.৬)	(১০০)
			১৯৯৭		
ভূমিহীন					
০ - ৪০০	৮	৪	০	৯	২১
৪০১ - ৮০০	১৪	৩	০	৯	২৬
৮০১ -	৬	১	০	৭	১৪
ক্ষুদ্র জোতদার					
০ - ৪০০	৬	৫	১	১৩	২৫
৪০১ - ৮০০	৬	০	০	১২	১৮
৮০১ -	৬	১	০	৮	১৫
মোট	৪৬	১৪	১	৫৮	১১৯
(%)	(৩৮.৭)	(১১.৮)	(০.৮)	(৪৮.৭)	(১০০)

উৎস ঃ লেখকের গ্রাম নিরীক্ষা।

৭. উপসংহার

বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে পশ্চিমবাংলায় গ্রামীণ বিকাশ সম্বন্ধীয় একটি সাম্প্রতিক গবেষণাকার্য দেখিয়েছে যে পশ্চিমবাংলা সফল হয়েছে উন্নতির ভাগ নিতে। এই গবেষণা থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে যদিও জমির পুনর্বণ্টনের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় (এই বণ্টনের সুবিধা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছেও মজুরি আয়ের একটি প্রধান উৎস রয়ে গেছে) এবং যদিও কৃষি মজুরদের বেতনের হার খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও জমির পুনর্বিভাগের প্রভাব আয়ের উপর বেশি পড়েছে বেতন বৃদ্ধির চেয়ে (সেনগুপ্ত

এবং গজদার ১৯৯৭)। 'ন' গ্রামে বামফ্রন্টের শাসনকালে যে জমির পুনর্বণ্টন হয়েছে তার আয়তন খুবই কম এবং বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাঁরা নাম নথিভুক্ত করার আগেই। কিন্তু ক্ষুদ্র জোতদার এবং ভূমিহীন পরিবাররা ইজারার সাহায্যে জমি ভোগ করার অধিকার পেয়েছেন।

'ন' গ্রামে এবং পশ্চিমবাংলার অন্য অনেক জায়গায় প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ফলে গরিব চাষিরা চাষ করার অধিকার পেয়েছেন। এটা বলা যেতে পারে যে 'ন' গ্রামে চাষিদের কৃষি থেকে উচ্ছেদ করা বন্ধ হয়েছে। বরঞ্চ জমি ইজারার ফলে তাঁদের কৃষিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার একটি প্রক্রিয়া চলছে। ভাগের পরিমান এবং জমির ভাড়া-চুক্তি খুব একটা পৃথক নয়। জমি ইজারার শর্ত এবং ঋণ নেওয়ার মধ্যে বিশেষ সংযুক্তি দেখা যায় না, এবং ইজারাদার পরিবারদের উৎপাদনশীলতা কম নয়। এটি সহজে অস্বীকার করা যাবে না যে গরিব চাষিদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির একটি প্রধান কারণ বোরোচাষের জন্যে জমি ইজারা নেওয়া। যেসব ইজারাদারদের সঙ্গে লেখক আলোচনা করেছেন তাঁরা সবাই মেনে নিয়েছেন যে বোরোচাষের প্রসারণের ফলে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, যদিও বেশিরভাগই মনে করেন যে শুধু অল্পই উন্নতি ঘটেছে। এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে কৃষি বিকাশের লাভ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার ইজারাদারদের পরিস্থিতি ভালো করে পরীক্ষা করলে খুব একটা আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া যায় না। কৃষির উন্নতি, কৃষি মজুরদের মজুরির হারের বৃদ্ধি এবং কৃষি ছাড়া অন্যান্য আয়ের সুবিধার জন্যে গ্রামীন অর্থনীতিতে বিকাশ ঘটেছে। এরফলে বোরোচাষের ক্ষেত্রে শস্যভাগের চুক্তি ধীরে ধীরে কমে আসছে, খাজনা চুক্তি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। কর্মের সুবিধা (কৃষি মজুরির ক্ষেত্রে এবং কৃষি ছাড়া অন্য কার্যে) অবশ্য এত বেশি নয় যে, গরীবদের আয়ের স্থিরতা আনতে পারে। এদিকে বোরোচাষের জন্যে জমির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। সীমিত পরিমান জমির জন্যে প্রতিযোগীতার কারণে খাজনা-চুক্তির জমির ভাড়ার হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণের সুবিধা খুবই সীমিত, বিশেষ করে ভূমিহীনদের মধ্যে। ভূমিহীন পরিবার অথবা যেসব পরিবারের কৃষি ছাড়া অন্য কোনো আয় কম তাঁদের ইজারা নেওয়া জমির উৎপাদনশীলতা কম সেইসব পরিবারের তুলনায় যাঁরা নিজেদের জমিতে চাষ করেন অথবা যাঁদের কৃষি ছাড়া অন্য আয় বেশি। তাছাড়া যেসব কৃষি মজুররা বোরোচাষের জন্যে ইজারা নেওয়া জমিতে ভাড়া করা মজুর নিয়োগ করেছেন তাঁরা মজুরির হার বৃদ্ধি খুব একটা পছন্দ করেন না।[২৪]

এইসব কারণের জন্যে গরিব গ্রামবাসীদের পক্ষে বোরোচাষের জন্যে জমি ইজারা নেওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই গবেষণা কার্য থেকে দেখা যায় যে কিছু কিছু জায়গায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চাষিদের পুনর্বার কৃষিতে বহাল করার একটি প্রক্রিয়া কাজ করছে। তবে এটাও বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অসঙ্গতি থাকা সম্ভব।

সূত্র নির্দেশ

১ ১৯৮০ - ৮১ সালে উচ্চফলনশীল আউশ এবং আমন ধান শতকরা ২২.৯ এবং ৩৫.৭ ভাগ জমিতে চাষ হয়। ১৯৯০-৯১ সালে এই হিসাব বেড়ে হয় শতকরা ৪৫.৫ এবং ৬৬.২ ভাগ। (সাহা এবং স্বামীনাথন ১৯৯৪ ঃ এ৬ দেখুন)।

২ ১৯৮০ সালের পূর্বে বাংলায় বোরোচাষের ক্ষেত্রে সেচ এবং উৎপাদনের এক সম্পর্ক বয়েস তাঁর লেখায় দেখিয়েছেন। বয়েস-এর মতে সেচ ব্যবস্থা উচ্চফলনশীল বীজ এবং কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার ত্বরাণীত করে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নেয় (১৯৮৭ ঃ ১৯৬-১৯৯)।

৩ এই অবস্থার বিবরণ বর্ধন-এর লেখায়ও পাওয়া যায়। 'সরকারি পরিসংখ্যান'-এর মাধ্যমে বর্ধন দেখিয়েছেন যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমির মালিকানা বৃদ্ধি পায় ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। সত্তর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাদুরী, রহমান এবং আর্ন (১৯৮৬) দেখাল যে মালিক ও কৃষক দুই মেরুতে বিভক্ত হলেও স্বল্প জমির মালিক তাঁদের সামান্য জমি ধরে রাখতে সক্ষম হয় কারণ কৃষি বহির্ভূত আয় অথবা 'দৈনিক ক্ষেতমজুরি'-র পারিশ্রমিক অথবা ভাগচাষে তাদের সাহায্য করে।

৪ উচ্চফলনশীল ধানের বীজের দীর্ঘকালীন প্রভাব তামিলনাড়ুর সমীক্ষায় দেখান হয়েছে। এর প্রভাব জমির মালিকানায় (নিজস্ব অথবা ভাগচাষ) খুব একটা পারেনি (হেজেল সম্পাদিত ১৯৯৩ দেখুন)। যদিও অকৃষিভিত্তিক আয়-এর সম্ভাবনা বেড়েছে ছোট জমির মালিক কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়েছে (হ্যারিস ১৯৯৩বি)।

৫ উদাহরণস্বরূপ, পাঞ্জাব-এ একটি সমীক্ষায় ভাল্লা ও চাধা দেখিয়েছেন যে 'কৃষি বিপ্লব' প্রভাবিত অঞ্চলে ছোট কৃষকরা কৃষির উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় এবং মাঝারি কৃষকদের অনুকরণ করছে (১৯৮৩ ঃ ৬৫)।

৬ অশোক রুদ্র-র মতে, যে সব উদ্যোগী কৃষক ছোট জমির মালিকদের থেকে জমি ভাগে নেয় তাদের গুরুত্ব ছোট করে দেখা ঠিক হবে না (১৯৯২ ঃ ৩১৮)।

৭ অনেক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে জমির মালিকরা ভাগচাষিদের সাহায্যে চাষ করার বিপক্ষে এবং অনেক ভাগচাষি এই কারণে উচ্ছেদ হয়। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রামে এই ঘটনা ঘটে (ফ্রাঙ্কেল ১৯৭১ ঃ ১৬৮-৬৯, গুপ্ত ১৯৭৭ ঃ ৫৮, বোস ১৯৮৪ ঃ ১১১, চট্টোপাধ্যায় ১৯৯২ ঃ ৬৫৫ দেখুন)।

৮ কোহলির সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৩০০ বর্গা নামভুক্ত ভাগচাষি উল্লেখ করে যে তাঁদের শতকরা ৮০ ভাগ জমির মালিক গ্রামের বসবাসকারী নন (১৯৮৭ : ১২৯-৩০)। এছাড়া মল্লিকের মতে যেসব ভাগচাষি জমির মালিকের অনাস্থা সত্ত্বেও নাম লেখান তাদের অবস্থান অর্থনৈতিকভাবে মধ্য কৃষকশ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে গবীর কৃষকরা জমির মালিকের প্রভাব অমান্য করতে সক্ষম হয় না এবং তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করাও অসম্পূর্ণ থেকে যায় (১৯৯৩ ঃ ৫০-৬১)।

৯ মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ভাগচাষ ব্যবস্থা নির্ধারিত খাজনা এবং মৌসুমিভিত্তিক ধানচাষ বা বোরোচাষ এবং নতুন উৎপাদন উপাদানের সাথে জড়িত (খাসনবীশ ১৯৯৪ ঃ এ১৯৩-এ১৯৪; সেনগুপ্ত চক্রবর্ত্তী ১৯৯৭)।

১০ জমির মালিকানার পরিমান এবং তাঁর সাথে উৎপাদনবৃদ্ধি উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা যায় না বলে দয়াল মনে করেন (দয়াল ১৯৮৩ ঃ ৯৫-৯৬)। সাহাও মনে করেন জমির মালিকানার স্বার্থে উৎপাদনের উপাদান ব্যবহার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ নয় (১৯৯৬ ঃ ৮৯)।

১১ ওয়েবস্টার বর্ধমান জেলায় সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন সেচ এলাকায় টিউবওয়েল মালিকরা জমি ভাগচাষ করে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। এর কারণ সেচ-এর জলের একাধিপত্য। এটা এক ধরনের চাতুরী বলা যায় (রোগালী, হ্যারিস, হোয়াইট এবং বোস ১৯৯৫ ঃ ১৮৬৫)। এই ধরনের উপায়ে

জমি হস্তাগত ছাড়াও বাংলাদেশে দেখা গিয়েছে টিউবওয়েল-এর মালিক সেচ এলাকাভুক্ত জমিতে জল বিক্রি করে থাকেন (উচিদা এবং এন্ডো ১৯৯২; রোগালী, হ্যারিস, হোয়াইট এবং বোস ১৯৯৫ ঃ ১৮৬৪; ফুজিতা এবং হোসেন ১৯৯৫; ফুজিতা ১৯৯৬)।

১২ ছোট সেচের নালা তৈরির দায়িত্ব পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। গরিবী দূর করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা থেকেই পঞ্চায়েত এই খরচ মেটায়। এই সেচ ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করার জন্য কোনো রকম সামাজিক সংগঠন দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে সেচের জলের মালিকানা অথবা ব্যবহার-এর জন্য কোনো রকম কর ধার্য করার ব্যবস্থাও নেই। এছাড়া সামাজিকগোষ্ঠীর সাহায্যে সামান্যভাবে সেচ জল বিতরণেরও কোনো প্রচলন বাংলার গ্রামে দেখা যায় না (ভ্যান সেন্দেল ১৯৯১ ঃ ২৯৬)।

১৩ ১৯৯৪ সালে পাম্প ব্যবহারের জন্য ঘন্টা প্রতি খাজনা ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা অবধি, তাই এক বিঘা জমি (০.৪৬ একর) চাষে প্রয়োজন হত ৪০০ টাকা। ১৯৯৪ সালে ৬০ কিলোগ্রাম বোরো ধানের মূল্য ছিল ২০০ টাকা থেকে ২৩০ টাকা গ্রামের বাজারে। আর এক বিঘা জমি থেকে ২০ মণ ধান (৭৪৬ কিলোগ্রাম) পাওয়া সম্ভব। এবং খরের মূল্য ২৭০ টাকা। তাই জলের জন্য খাজনা হল ধান ও খরের থেকে আয়ের শতকরা ১৩ থেকে ১৫ ভাগ। আর টিউবওয়েলের জলের মূল্য বাংলাদেশে এক সমীক্ষায় দেখা যায় মোট আয়ের শতকরা ৩৩ থেকে ৪০ ভাগ (ফুজিটা ১৯৯৬ ঃ ২২৯)।

১৪ সেনগুপ্ত এবং গজদার (১৯৯৭ ঃ ১৭৭)-এর মতে পশ্চিমবাংলায় ক্ষেত মজুরি বৃদ্ধির হার ১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে শতকরা ৫.৭ ভাগ হয়, আর সারা দেশে তা-হল ৪.৮ ভাগ।

১৫ শতকরা বার্ষিক ধানের গড় পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করা যাক। এটা ছিল ২.৬২ টাকা, ২.২৩ টাকা, ১.৯৮ টাকা এবং ৬.৯৭ টাকা ১৯৭৪,১৯৭৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৯৬ সালে (পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক সমীক্ষায় ফি বছরের হিসাব পাওয়া যায়)।

১৬ রিক্সা বলতে এখানে সাইকেল রিক্সা বোঝানো হয়েছে। এটা ভ্যানরিক্সা বলে পরিচিত। রিক্সার পেছন দিকে দ্রব্যাদি বহনের জন্য থাকে কাঠের তক্তায় তৈরি বেশ কিছুটা জায়গা।

১৭ পান পাতা চাষের ক্ষেত্রে প্রতি বছর গড়ে একটি কৃষক পরিবারের ২৯.৪ ভাড়া করা শ্রমদিন মজুর লেগেছে।

১৮ পশ্চিমবাংলার গ্রাম্য সমাজে পঞ্চায়েত-এর প্রভাব প্রসঙ্গে দেখুন ওয়েষ্টগার্ড ১৯৮৬; কোহলি ১৯৮৭ঃ ১০৪-১১৭; লাইটেন ১৯৯২ ঃ ৮৮ - ১১৮; ওয়েবস্টার ১৯৯২; এচেভেরি জেন্ট ১৯৯২; মুখার্জী ও বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৩; লাইটেন ১৯৯৬; মোরি ১৯৯৭।

১৯ এক বিঘা জমি থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য প্রসঙ্গে নির্দেশিকা ১৩ দেখুন।

২০ এটা লক্ষ্যণীয় যে ৫৯ পরিবারের মধ্যে ৩৪ পরিবার গ্রামের দোকান থেকেই কীটনাশক, সার ইত্যাদি ধারে ক্রয় করে থাকে।

২১ যে সব জমির মালিক শুধু নিজেদের জমি চাষ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে অকৃষি আয় এবং কৃষি উৎপাদনের সম্পর্ক খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু যেসব পরিবার অকৃষিভিত্তিক আয় (৪০০ টাকার কম) এবং বোরোচাষে যুক্ত তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছেন (সারণি ঃ ৯)। এর কারণ নিজের ছোট জমিতে নিপুনতার সাথে বোরোচাষ। এই সব ছোট জমির মালিক বোরোচাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় লেগে থাকে। কিন্তু মধ্যশ্রেণীর কৃষক যাদের ৪০০ টাকার বেশি আয় অকৃষি ব্যবস্থা থেকে, কৃষি তাদের কাছে আয়ের মুল সূত্র নয়। তাই তারা কঠিন শ্রমের বিনিময়ে কাজ করবে না। কিন্তুএই ধরনের কৃষকরা যদি জমি ভাগে নিয়ে থাকে এবং বোরোচাষ করে তবে কঠিন শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করবে।

২২ এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভাগচাষ চুক্তি এক ধরনের নৈতিক অর্থব্যবস্থা যেখানে ধনী কৃষকের বদান্যতা গরিবদের বেঁচে থাকার মূলধন (স্কট ১৯৭৬)।

২৩ গ্রামের বাজারে ১৯৯৭ সালে ৬০ কিলো বোরো ধানের মূল্য ছিল ২৫০ টাকা থেকে ২৯০ টাকার মধ্যে। এবং এক বিঘা জমি থেকে প্রাপ্য খরের মূল্য ছিল ৩০০ টাকা।

২৪ প্রতি বছর দিন মজুরি বেড়ে চলেছে। কিন্তু দিন মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। কৃষক সভা এবং সি. পি. এম. এ-ব্যাপারে আন্দোলনে খুব বেশি উৎসাহী নয়। কারণ তারা মধ্যশ্রেণীর কৃষকদের সহায়তা হারাতে রাজি নয়।

সূত্র তালিকা

বন্দ্যোপাধ্যায়. এন, ১৯৭৫, "চেঞ্জিং ফর্মস অফ এগ্রিকালচারাল এন্টারপ্রাইস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি*, খণ্ড ১০, নম্বর ১৭, পৃ. ৭০০ - ৭০১, ১৯৮৫

— *ইভ্যালুয়েশান অফ ল্যাণ্ড রিফর্ম মেজার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ এ রিপোর্ট*, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা।

বর্ধন, প্রণব কে., ১৯৮৪, *ল্যাণ্ড লেবার অ্যাণ্ড রুরাল পভার্টি ঃ এসেজ ইন ডেভেলপমেন্ট ইকনমিকস*, দিল্লী, অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ভাল্লা, জি. এস. ও জি. কে. চাড্ডা, ১৯৮৩, *গ্রীন রেভলিউশান অ্যাণ্ড দ্য স্মল পেজেন্ট ঃ এ স্টাডি অফ ইনকাম ডিসট্রিবিউশান অ্যামং পাঞ্জাব কাল্টিভেটর্স*, নিউ দিল্লী, কনসেপ্ট পাবলিশিং কোম্পানী।

ভাল্লা, শীলা, ১৯৮৭, "ট্রেণ্ডজ ইন এমপ্লয়মেন্ট ইন ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার, ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড অ্যাসেট ডিসট্রি-বিউশান", *ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস*, খণ্ড ৪২, নম্বর ৪, পৃ. ৫৩৭ ৫৬০।

ভাদুড়ি, অমিত, হুসেন জিলুর রহমান অ্যাণ্ড অ্যান-লিসবেট আরন, ১৯৮৬, "পারসিসটেন্স অ্যাণ্ড পোলারাইজেশন ঃ এ স্টাডি ইন দ্য ডাইন্যামিকস অফ অ্যাগ্রেরিয়ান কনট্রাডিকশন", *দ্য জার্নাল অফ পেজেন্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ১৩, নম্বর ৩, পৃ. ৮২ - ৮৯।

ভৌমিক, এস. কে., ১৯৯৩, *টেনান্সি রিলেশনস অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেরিয়ান ডেভেলপমেন্ট ঃ এ স্টাডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, সেজ পাবলিকেশন।

বোস, প্রদীপ কুমার, ১৯৮৪, *ক্লাসেস ইন এ রুরাল সোসাইটি ঃ এ সোশিয়লজিক্যাল স্টাডি অফ সাম বেঙ্গল ভিলেজেস*, দিল্লী, অজন্তা পাবলিকেশনস।

বয়সে, জেমস কে., ১৯৮৭, *অ্যাগ্রেরিয়ান ইমপাস ইন বেঙ্গল ঃ এগ্রিকালচারাল গ্রোথ ইন বাংলাদেশ অ্যাণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৪৯-১৯৮০*, নিউ ইয়র্ক, অকস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ব্রে, ফ্রানসেস্কা, ১৯৮৩, "প্যাটার্নস অফ এভলিউশন ইন রাইস-গ্রোইং সোসাইটিজ", *দ্য জার্নাল অফ পেজেন্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ১১, নং ১, পৃ. ৩-৩৩।

বাইরেস, টি. জে., ১৯৮১, "দ্য নিউ টেকনোলজি, ক্লাস ফর্মেশান অ্যাণ্ড ক্লাস অ্যাকশন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কান্ট্রিসাইড", *দ্য জার্নাল অফ পেজেন্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ৮, নং ৪, পৃ. ৪০৫-৪৫৪।

চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দু, ১৯৮২, *মহলানবিশ সার্ভে রিভিজিটেড ঃ প্রসপেক্টাস অফ অ্যাগ্রেরিয়ান চেঞ্জ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*, ক্যালকাটা, ইন্দো ওভারসিজ পাবলিকেশনস।

— ১৯৯৬, *অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড পেজেন্ট মবিলাইজেশন*, ক্যালকাটা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী।

চট্টোপাধ্যায়, সুজিত নারায়ণ, ১৯৯২, "হিস্টোরিক্যাল কনটেকস্ট অফ পলিটিক্যাল চেঞ্জ ইন রুর‍্যাল ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ এ স্টাডি অফ সেভেন ভিলেজেস ইন বর্ধমান", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৭, নং ১৩, পৃ. ৬৪৭-৬৫৮।

কুপার, এড্রিয়েন, ১৯৮৮, *শেয়ারক্রপিং অ্যাণ্ড শেয়ারক্রপার্স স্ট্রাগলস ইন বেঙ্গল ঃ ১৯৩০ - ১৯৫০*, ক্যালকাটা, কে পি বাগচি অ্যাণ্ড কোম্পানী।

ডয়াল, এডিসন, ১৯৮৩, "রিজিওনাল রেসপন্স টু হাই ইল্ড ভ্যারাইটিজ অফ রাইস ইন ইণ্ডিয়া", *সিঙ্গাপোর জার্নাল অফ ট্রপিক্যাল জিওগ্রাফি*, খণ্ড ৪, নং ২, পৃ. ৮৭-৯৮।

এচেভেরি-জেন্ট, জন, ১৯৯২, "পাবলিক পার্টিসিপেশান অ্যাণ্ড পভার্টি অ্যালিভিয়েশন ঃ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ রিফর্ম কমিউনিস্টস ইন ইণ্ডিয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল", *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট*, খণ্ড ২০, নং ১০, পৃ. ১৪০১-১৪২২।

ফুজিতা কোয়িচি অ্যাণ্ড ফিরোজ হুসেন, ১৯৯৫, "রোল অফ দ্য গ্রাউণ্ড ওয়াটার মার্কেট ইন এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাণ্ড ইনকাম ডিসট্রিবিউশন : এ কেস স্টাডি ইন এ নর্থওয়েস্ট বাংলাদেশ ভিলেজ", *দ্য ডেভেলপিং ইকনমিজ*, খণ্ড ৩৩, নং ৪, পৃ. ৪৪২-৪৬৩।

ফুজিতা, কোয়িচি, ১৯৯৬, "বাঙ্গুরাদেশু : সেন-ক্যান-আইডো কাঙ্গাই নি ইয়রু নৌসন নো হেনবু", (বাংলাদেশ : রুরাল চেঞ্জ অ্যাজ দ্য রেজাল্টঅফ শ্যালো টিউবওয়েল ইরিগেশন), কেনজো হোরি এট আল (এডিটেড) আজিয়া নো কাঙ্গাই সেইডো (ইন জাপানিজ), টোকিও, শিনহিউওরুন, পৃ. ২১৫-২৪৯।

ঘোষ, জীবন কুমার, ১৯৯৬, "দ্য চেঞ্জিং অ্যাগ্রেরিয়ান সিন আণ্ডার দ্য ইমপ্যাক্ট অফ ল্যাণ্ড রিফর্মস প্রোগ্রাম : এ কেস স্টাডি অফ অপারেশন বর্গা প্রোগ্রাম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", রায়চৌধুরী, অজিতাভ অ্যাণ্ড দেবজানী সরকার (এডিটেড), পৃ. ৪৩ - ৫৭।

ঘোষ, এম. জি., ১৯৮১, "ইমপ্যাক্ট অফ দ্য নিউ টেকনলজি অন ল্যাণ্ড স্ট্রাকচার থ্রু চেঞ্জেস ইন দ্য লিজ মার্কেট : এ স্টাডি ইন এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট", *ইণ্ডিয়ান জার্নাল অফ এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস*, খণ্ড ৩৬, নং ৪, পৃ. ১৪৮ - ১৫৮।

গফ. কে., ১৯৮৯, *রুরাল চেঞ্জ ইন সাউথ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া নাইনটিন ফিফটিজ টু নাইনটিন এইটিজ*, নিউ দিল্লী, অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

গুপ্তা, জয়তি, ১৯৯৩, "ল্যাণ্ড, ডাউরি, লেবার : উইমেন ইন দ্য চেঞ্জিং ইকনমি অফ মিদনাপুর", *সোশাল সায়েন্টিষ্ট*, খণ্ড ২১, নং ৯ -১১, পৃ. ৭৪ - ৯০।

গুপ্ত, রঞ্জিত কুমার, ১৯৭৭, *অ্যাগ্রেরিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল : থ্রী ফিল্ড স্টাডিজ*, ক্যালকাটা, ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রোপলজি, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি।

হ্যারিশ, জন, ১৯৯২, "ডাজ দ্য ডিপ্রেসর স্টিল ওয়ার্ক? অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া : এ রিভিউ অফ এভিডেন্স অ্যাণ্ড আর্গুমেন্ট", *দ্য জার্নাল অফ পেজেন্ট স্টাডিজ*, খণ্ড ১৯, নং ২, পৃ. ১৮৯- ২২৭।

— ১৯৯৩এ, " হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন রুর‍্যাল ওয়েস্ট বেঙ্গল : অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্ম, গ্রোথ অ্যাণ্ড ডিসট্রিবিউশন", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৮, নং ২৪, পৃ. ১২৩৭-১২৪৭।

— ১৯৯৩বি, "দ্য গ্রীন রেভেলিউশন ইন নর্থ আরকট : ইকনমিক ট্রেণ্ডজ, হাউজহোল্ড মবিলিটি অ্যাণ্ড দ্য পলিটিকস অফ অ্যান 'অকওয়ার্ড ক্লাশ'," পিটার বি. আর. হেজেল অ্যান্ড সি. রামস্বামী (এডিটেড), পৃ. ৫৭-৮৪।

হেজেল, পিটার বি. আর. অ্যাণ্ড সি. রামস্বামী (এডিটেড), ১৯৯৩, *দ্য গ্রীন রেভলিউশন রিকনসিডার্ড : দ্য ইমপ্যাক্ট অফ হাই ইল্ডিং রাইস ভ্যারাইটিজ ইন সাউথ ইণ্ডিয়া*, দিল্লী, অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

হেজেল, পিটার বি. আর ও অন্যান্য ১৯৯৩, "ইকনমিক চেঞ্জেস অ্যামং ভিলেজ হাউসহোল্ডস", পিটার বি. আর. হেজেল অ্যাণ্ড সি. রামস্বামী (এডিটেড), পৃ. ২৯-৫৬।

খাসনবিশ, আর. অ্যাণ্ড জে. চক্রবর্তী, ১৯৮২, "টেনান্সি ক্রেডিট অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেরিয়ান ব্যাকওয়ার্ডনেস", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ১৭, নং ৫৩, পৃ. এ২১-এ৩২।

খাসনবিশ, রতন, ১৯৯৪, "টেনিওরাল কণ্ডিশনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : কন্টিনুইটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৯, নং ৫৩, পৃ. এ১৮৯-এ১৯৯।

কোহলি, অতুল, ১৯৮৭, *দ্য স্টেট অ্যাণ্ড পভার্টিজ ইন ইণ্ডিয়া : দ্য পলিটিকস অফ রিফর্ম*, কেমব্রিজ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

লাইটেন, জি. কে., ১৯৯২, *কন্টিনুইটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ ইন রুর‍্যাল ওয়েস্ট বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, সেজ পাবলিকেশন।

— ১৯৯৬, *ডেভেলপমেন্ট ডেভলিউশন অ্যাণ্ড ডেমক্রেসিঃ ভিলেজ ডিসকোর্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল*, নিউ দিল্লী, সেজ পাবলিকেশন।

মালিক, রস, ১৯৯৩, *ডেভেলপমেন্ট পলিসি অফ এ কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট : ওয়েস্ট বেঙ্গল সিন্স ১৯৭৭*, কেমব্রিজ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মোরি হিদেকি, ১৯৯৭, "রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যাণ্ড চেঞ্জিং রুর‍্যাল সোসাইটি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া ঃ এ কেস স্টাডি অফ এ গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়া আণ্ডার দ্য লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট", *আজিয়া কেইজাই* (ইন জাপানিজ), খণ্ড ৩৮, নং ৪, পৃ. ৩৯-৭১।

মুখার্জী, নির্মল অ্যাণ্ড ডি. বন্দ্যোপাধ্যায়, *নিউ হরাইজনস ফর ওয়েস্ট বেঙ্গলস পঞ্চায়েতস ঃ এ রিপোর্ট ফর দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল*, ক্যালকাটা ডিপার্টমেন্ট অফ পঞ্চায়েত, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল।

রায়চৌধুরী, অজিতাভ অ্যাণ্ড দেবযানী সরকার (এডিটেড), ১৯৯৬, *ইকনমি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ প্রবলেমস অ্যাণ্ড প্রসপেকটস*, ক্যালকাটা, অ্যালায়েড পাবলিশার্স লিমিটেড।

রোগালি, বি. বি. হ্যারিশ - হোয়াইট অ্যাণ্ড এস. বোস, ১৯৯৫, "সোনার বাংলা ? ঃ এগ্রিকালচারাল গ্রোথ অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেরিয়ান চেঞ্জ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড বাংলাদেশ", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ৩০, নং ২৯, পৃ. ১৮৬২ - ১৮৬৮।

রুদ্র, অশোক, ১৯৭৫এ, "লোনস অ্যাজ এ পার্ট অফ অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস ঃ সাম রেজাল্টস অফ এ প্রিলিমিনারি সার্ভে ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ১২ জুলাই, পৃ. ১০৪৯ - ১০৫৩।

— ১৯৭৫বি, "শেয়ার ক্রপিং অ্যারেঞ্জমেন্টস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ১০, নং ৩৯, পৃ. এ৫৮ - এ৬৩।

— ১৯৯২, *পলিটিক্যাল ইকনমি অফ ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার*, ক্যালকাটা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী।

রুদ্র, এ. অ্যাণ্ড পি. বর্ধন, ১৯৮৩, *অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ রেজাল্টস অফ টু সার্ভেস*, বম্বে, সোমাইয়া পাবলিকেশনস।

সাহা, এ. অ্যাণ্ড এম. স্বামীনাথন, ১৯৯৪, "এগ্রিকালচারাল গ্রোথ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্য নাইনটিন এইটিজ ঃ ডিসএগ্রেগেশন বাই ডিস্ট্রিক্টস অ্যাণ্ড ক্রপস", *ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, খণ্ড ২৯, নং ১৩, পৃ. এ২ - এ১১।

সাহা, অনামিত্রা, ১৯৯৬, "অ্যাডপশন অফ মডার্ন অ্যাগ্রিকালচারাল টেকনলজি ইন রাইস ক্যালটিভেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", রায়চৌধুরী, অজিতাভ অ্যাণ্ড দেবজানী সরকার (এডিটেড), পৃ. ৭৯ - ৯৭।

স্কট, জেমস সি., ১৯৭৬, "*দ্য মরাল ইকনমি অফ দ্য পেজেন্ট ঃ রিবেলিয়ন অ্যাণ্ড সাবসিসটেন্স ইন সাউথ-ইষ্ট এশিয়া*, নিউ হেভেন অ্যাণ্ড লণ্ডন ঃ ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস।

সেনগুপ্তা (চক্রবর্তী), শ্রাবণী, ১৯৯৬, "অ্যাগ্রেরিয়ান পলিসিজ অ্যাণ্ড প্যাটার্নস অফ রুর‍্যাল চেঞ্জ ইন সাউথ বেঙ্গল", রায়চৌধুরী, অজিতাভ অ্যান্ড দেবজানী সরকার (এডিটেড), পৃ. ৫৮ - ৭৮।

সেনগুপ্ত, সুনীল অ্যান্ড হরিশ গজদার, ১৯৯৭, "অ্যাগ্রেরিয়ান পলিটিকস অ্যাণ্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", জে. ড্রেজ অ্যাণ্ড এ. সেন (এডিটেড), *ইণ্ডিয়ান ডেভেলপমেন্ট ঃ সিলেক্টেড রিজিওনাল পার্সপেক্টিভ*, দিল্লী, অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ওয়েস্টারগার্ড, কার্স্টেন, *পিপলস পার্টিসিপেশন, লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাণ্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ঃ দ্য কেস স্টাডি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল*, কোপেনহেগেন, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ।

(আমি প্রথমেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমিনুল হক মহাশয়কে। তার সঙ্গে আমি আমার গবেষণার সঙ্গে জড়িত গ্রামের অন্যান্য সবাইকেই শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁদের সকলের প্রচুর সাহায্য ছাড়া আমি আমার এই গবেষণা করতে পারতাম না।)

অনুবাদ ঃ রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশিকা